বাইবেলের প্রেমকাহিনী

সুভাষ সমাজদার

সাহিত্য প্রকাশ
৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৫৯

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৮।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : অলোকশঙ্কর মৈত্র

মুদ্রাকর : প্রফুল্ল বক্সী : জয়দুর্গা প্রেস
৫৩, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

দিব্যেন্দু সিন্‌হা .

পরম প্রীতিভাজনেষু

কৈফিয়ৎ

বাইবেলের মত একটি অতি দুরূহ আর অত্যন্ত জটিল এবং প্রায় সহস্রাধিক বৎসরের সুবিপুল সময়সীমার ভেতরে বিস্তৃত একটি ধর্মগ্রন্থের প্রেমকাহিনী রচনার নেপথ্য ইতিহাসটুকু বলা প্রয়োজন। সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে কোন এক বহুল প্রচারিত জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকা থেকে ধারাবাহিক লেখার আমন্ত্রণ পেয়ে আমার মনে হয়েছিল, রামায়ণ মহাভারতে যেমন অজস্র প্রেমের উপাখ্যান আছে, তেমনি খ্রীষ্টীয় জগতের মহাগ্রন্থ বাইবেলে কি আছে প্রেমের কাহিনী?

নিছক কৌতূহলী হয়েই সেই থেকে বাইবেল নিয়ে নাড়াচাড়া করে জানতে পারলাম—বাইবেল কোন একটি গ্রন্থ নয়। আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক লেবীয়পুস্তক, গণনাপুস্তক, গীতসংহিতা বা বুক অফ সামস, রাজাবলি বা বুক অফ কিংস, মার্ক, মথি লুক লিখিত সুসমাচার ইত্যাদি চল্লিশটি গ্রন্থের বিবলিয়া বা সমষ্টিই হল—বাইবেল। আর তার রচয়িতাদের ভেতরে আছেন নিরক্ষর রাখাল বালক থেকে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী নৃপতি পর্যন্ত। আর যেমন অসামান্য মণীষার অধিকারী, তেমনি আছেন অতি নগণ্য এবং স্বল্প শিক্ষিত মানুষ। আর এই বিচিত্র ধর্মগ্রন্থসমষ্টির রচনাকাল নিয়ে বিশেষজ্ঞদের ভেতরে মতভেদ আছে! কেউ বলেন, ইহুদীদের প্রাচীনতম পুরুষ অ্যাব্রাহামের পরিভ্রমণের শুরু অর্থাৎ সেই ২১০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে খ্রীষ্টাব্দের জন্মকাল পর্যন্ত—এই দীর্ঘ সহস্রাধিক বৎসরের ভেতরে রচিত হয়েছে পুরাতন নিয়মের বাইবেল বা ওল্ড টেষ্টামেণ্ট। আবার এক বাইবেল বিশেষজ্ঞ এবং প্রাচীন ইতিহাস বিদ্যার পণ্ডিত জানিয়েছেন —পুরাতন পদ্ধতির বাইবেলের সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব এক হাজার বছরের সময়সীমার ভেতরে।

পুরাতন বাইবেলের মহানায়ক ডেভিড, অমিতশক্তির অধিকারী সামসন প্রভৃতির অবলুপ্ত কীর্তির নানা নির্দশন আবিষ্কার করে প্রত্নতাত্ত্বিকরাও জানিয়েছেন খ্রীষ্টপূর্ব ১৩০০ থেকে ৮৯১ খৃ. পূ, সময়কালের ভেতরে ঘটেছে বাইবেলের বিখ্যাত ঘটনাগুলি।

নিশ্চয়ই আরও বলা দরকার, খ্রীষ্টীয় বাইবেলের তিন-চতুর্থাংশই হল হীব্রু ধর্মশাস্ত্র, যা রচিত হয়েছিল হীব্রু, অ্যারামিয়াক বা সিরিয় এবং গ্রীক ভাষায় খ্রীষ্টের অভ্যুত্থানের প্রায় এক হাজার বছর আগে—তারই নাম পুরাতন

পদ্ধতির বাইবেল বা ওল্ড টেষ্টামেণ্ট। আর বাইবেলের এই আদিঅংশের বিষয়বস্তু হল—সদাপ্রভু, অনন্ত শক্তিমান জীহোভার (ইহুদীদের আদিদেবতা) ভক্ত, অনুরক্ত এবং তাঁর নির্বাচিত ইস্রায়েলীদের প্রতি তাঁর অপার করুণার বর্ণাঢ্য কাহিনী। আর তার ভেতরেই আছে সেই মিশর ও ব্যাবিলন থেকে বাস্তুহারা হয়ে মধ্যএশিয়ার উষর মরুভূমিতে আর উত্তুঙ্গ পর্বতাকীর্ণ দুর্গম প্রদেশের স্থান থেকে স্থানান্তরে সুদীর্ঘকাল যাযাবর জীবন কাটিয়ে যারা প্যালেস্তাইনের উর্বরা কনান প্রদেশের মাটিতে প্রথম বসতি করে কৃষিজীবি হয়ে উঠেছিল তাদেরই সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা ও আনন্দ-বেদনার কাহিনী আর তার ভেতরেই এক একটি ফুলের মত ফুটে রয়েছে তাদের অজস্র আর অগণন প্রেমের উপাখ্যান।

বলতে দ্বিধা নেই, প্রায় চার হাজার বছর আগে বিশেষ একটি ভূখণ্ডের একটি বিশেষ জাতির রীতিনীতি, উত্থান পতন এবং বিভিন্ন আদিবাসী উপজাতিদের সঙ্গে রক্তাক্ত সংঘর্ষ নিয়ে রচিত হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ক্লাসিকের মতই প্রতিটি কাহিনীর ভেতরেই মানবজীবনের চিরকালীন হর্ষ, আনন্দ ও বেদনার আকুলতা পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে।

পুরাতন পদ্ধতির বাইবেলের অগ্রগণ্য মহানায়ক সঙ্গীতজ্ঞ, অসামান্য রণকুশলী, প্রতাপশালী নৃপতি ডেভিড তার প্রাসাদশীর্ষ থেকে সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে অদূরে স্নানরতা এক তন্বী যুবতীর অনাবৃত যৌবনশ্রীর অসামান্য সৌন্দর্য দেখে শুধু যে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল তা নয়—বিশৃঙ্খল হয়ে গিয়েছিল তার চেতনা। কিন্তু বহু দেশকে যে পরাস্ত করেছে, সে দুরন্ত শক্তিমান প্রথম রিপুটিকে দমন করতে পারল না বলে তার সেই তীব্র মর্মদাহ, সেই বিধ্বংসী কামরিপুর কাছে তার সেই নিরুপায় আকুতি, সর্বনাশের অতল অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়ার জন্য সেই সুতীব্র যাতনায় আধুনিককালের যে কোন দেশের উপন্যাসের নায়কের অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত মানসিকতার আভাস পাওয়া যায়। আবার মিশরের ফারাও দ্বিতীয় রামেসিসের প্রধান সেনাধক্ষ্য পটিফারের রূপসী পত্নী ট্যামার কামনার জ্বালায় অস্থির হয়ে তরুণ, রূপবান ক্রীতদাস জোসেফের কক্ষে নিশীথ রাত্রে অভিসারে আসে, নির্লজ্জ প্রস্তাব করে আর বারে বারে প্রত্যাখ্যানের চরম অপমান নিয়ে ফিরে যায়। তার সেই মোহাচ্ছন্ন কালের মর্মযাতনা আবার দৈহিক কামনা বাসনায় মিথ্যা সুখ উপলব্ধি করে মহতকে, বিরাটকে পাওয়ার আকর্ষণে সেই উদার প্রশান্তির রাজ্যে উত্তরণে যে কোন কালের, যে কোন দেশের উপন্যাসের নায়িকারই প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে।

এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত আর অন্যান্য কাহিনীর উপমা দিয়ে ভারাক্রান্ত না করেও বলা যায়, কালোত্তর প্রেরণার শক্তিতে কবি বাল্মিকীর রামায়ণ এবং ব্যাসদেবের মহাভারতের মতই পুরাতন রীতির বাইবেলের প্রায় প্রতিটি উপাখ্যানই কালের ব্যবধানকে অগ্রাহ্য করে মহাপ্রাণ সূর্যের মতই যুগ যুগ ধরে আলোর প্রসন্নতা ছড়িয়ে দিচ্ছে দেশদেশান্তরের কবি, সাহিত্যিকদের সৃষ্টিতে।

এই তথ্যটিরই আভাস পরিস্ফুট হয়ে ওঠে Great Dramas and Poems from the Bible'-এর বিদগ্ধ সঙ্কলক ও সম্পাদক চালর্পস লয়েড জোন্সের এই উক্তিতে I have met only one that might have surprised—the authors of the old Testament, the comparitively modern sentimental aspect of romantic love ··

সুপ্রাচীন কালের আখ্যায়িকা হলেও চরিত্রগুলি বা কুশীলবদের প্রেম-বিরহ, আশানিরাশার দ্বন্দ্ব আধুনিকতার লক্ষণাক্রান্ত বলেই হয়তো মহাকবি দান্তের ডিভাইন কমেডি, মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট, গেটের ফাউস্ট ইত্যাদি আরও কয়েকটি কালজয়ী মহাকাব্য রচিত হয়েছে সেই পুরাতন পদ্ধতির বাইবেলের বিষয় বস্তুকেই কেন্দ্র করে।

আরও একটি প্রসঙ্গ নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য—খ্রীষ্টীয় বাইবেলের প্রাচীনতম নায়ক অ্যাব্রাহাম ব্যবিলন পরিত্যাগ করে মেসোপটেমিয়া, তুর্কী এবং মধ্য এশিয়ার আরও নানা দেশ পরিভ্রমণ করে জর্ডনের বহির্ভূভাগের বিস্তীর্ণ মরুভূমি পেরিয়ে যেই তার অনুগামীদের নিয়ে প্যালেস্তাইনের গ্যালিলি প্রদেশের কনানে বসতি শুরু করল (খ্রীষ্টপূর্ব ১২২৫ সালের কাছাকাছি) আর সেখানকার আদিবাসী কনানীয়দের কাছ থেকে শিখল 'মর্তের চিত্তবল সাধক ভক্ষ্য' গম ও যব চাষের কলাকৌশল, অমনি শুধু বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রামের কঠোরতার হ্রাস হল। আর তাদের ভেতরে জন্ম নিল ঈশ্বর সম্বন্ধীয় পরমার্থিক চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে প্রেম প্রণয়ের সেই রোমান্টিক ভাবালুতার। ঠিক সেই সময় থেকেই পুরাতন নিয়মের বাইবেলের পটক্ষেপণ হল।

অ্যাব্রাহামের পুত্র আইজ্যাক, আইজ্যাকের পুত্র জ্যাকব, আবার জ্যাকবের পুত্র জোসেফ পর্যন্ত বংশানুক্রমিক ধারা বজায় রেখে তাদের দুর্বার প্রেমের কাহিনী বর্ণনা করেছি। কিন্তু অ্যাব্রাহামের উত্তরসূরী আইজ্যাক-জ্যাকব জোসেফের পরেও মোজেস, অ্যারন, জোশুয়া, সামসন, স্যামুয়েল, সল, ডেভিড শলোমন, রাণী ইস্থার ইত্যাদি আরও পাঁচজন ইহুদী জননেতার ইতিবৃত্ত আছে ওল্ড টেস্টামেন্টে। এঁদেরই সর্বকনিষ্ঠ গণনায়ক,অসামান্য জনপ্রিয় বেথলেহামের

সেই ছুতারপুত্র জেজাস বা যীশু। পুরাতন নিয়মের বাইবেলের অন্যতম মহানায়ক হলেও তাঁর এবং গ্যালিলির সমুদ্রতীরের নিভৃত সেই গ্রাম ম্যাগডালার ধীবরকন্যা ম্যাগডালিনের কাহিনীর গুরুত্ব বিচার করে গ্রন্থের সর্বাগ্রে দিয়েছি। আরও দিয়েছি বাইবেলের খরযৌবনবতী নায়িকাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা ভেবে—তারা দুর্বার কামনার জ্বালায় পাপের পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে যায়, গভীর গ্লানির অপচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় তাদের মন। কিন্তু কিছু-কাল অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরই তারা উপলব্ধি করে—ক্লেদ পঙ্কিলতার ঊর্দ্ধে সেই অতীন্দ্রিয় জীবনের শাশ্বত মহিমা !

ম্যাগডালিনের ক্ষেত্রেও হয় নি তার ব্যতিক্রম।

ম্যাগডালিন। মেরী ম্যাগডালিন। মাছের আঁশটে গন্ধে ভরা নড়বড়ে কুড়ে-ঘরে অতি দরিদ্র এক ধীবর পরিবারে তার জন্ম হলেও অপার্থিব তার সৌন্দর্য। বিদগ্ধ সমালোচকরা তার সম্বন্ধে বলেছেন one of the tantalizing women of the Bible

ম্যাগডালিন গ্রাম থেকে রাজধানী জেরুজ্যালেমে গিয়ে হয়ে গিয়েছিল ধনী বিলাসী রোমীয় শাসনকর্তা পন্টিয়াস পাইলেত কমোডাস এবং তাদের অনুগ্রহপুষ্ট ফ্যারিসী পুরোহিতদের সুখ-সহচরী। রাত্রির পর রাত্রি তার বিচিত্র এক ভাবাবেশে বিভোর হয়ে অনিন্দ্য সুন্দর উদ্দাম নৃত্যে আকৃষ্ট হয়ে রোমীয়রা বিপুল সম্পদ তার পায়ে উজাড় করে দিত। কিন্তু অসামান্য সুন্দরী সেই নগরশোভনা বারোবিলাসিনী কেমন করে যীশুর কালজয়ী বাণীগুলির প্রতি আকৃষ্ট হল আর মানুষের প্রতি গভীর প্রেমে আত্মত্যাগের মহিমান্বিত সেই জীবনের আকর্ষণে কেমন করে উত্তরণ ঘটল—সেই কাহিনীতে প্রাচীন জেরুজ্যালেমের সুরম্য অট্টালিকা, বৃক্ষশোভিত রাজপথ রোমীয় শাসকদের মহার্ঘ পোশাক পরিচ্ছদ আর তাদের নানাবিধ বর্ণাঢ্য সমারোহের পরিবেশ রচনায় আমি Paul Ilton এর লেখা The secret of mary Magdalene. গ্রন্থটি থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছি।

আবার ৯৯৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে প্যালেস্তাইনের শক্তিমান নৃপতি ডেভিডের রাজধানী জেরুজ্যালেমের পুণর্গঠনের বর্ণনায় এবং প্যালেস্তাইনের সঙ্গে মিশর, ফিনিসীয়া টায়র ইত্যাদি প্রাচীনদিনের সমৃদ্ধ দেশগুলির সৌহার্দবন্ধন এবং ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক সম্বন্ধের ইতিবৃত্ত আমি প্রভূত সাহায্য পেয়েছি, Jerry landy র লেখা 'The house of David' গ্রন্থ থেকে।

পরিশেষে বিনীত ভাবে বলি, প্রতিটি কাহিনী খৃষ্টপূর্ব হাজার বছরের

পটভূমিতে, সম্পূর্ণ অজানা একটি দেশের মাটিতে সংঘটিত হয়েছে। প্রাচীন দিনের ইহুদীদের বিশ্বাস, সংস্কার, আচার বিচার, নানাবিধ বিচিত্র প্রথা ইত্যাদি আমার সামর্থ্য অনুযায়ী ইতিহাসানুগ করার চেষ্টা করেছি। তবুও যদি কিছু ত্রুটি থাকে এবং বিদগ্ধ পাঠক যদি আমাকে জানান তাহলে বারান্তরে সংশোধন করে নেব।

আরও বলা দরকার, বর্তমান গ্রন্থের প্রতিটি উপাখ্যানের মূল বক্তব্য অক্ষুন্ন রেখে যত দূরসম্ভব ইতিহাসভিত্তিক করতে যত্ন নিয়েছি। তবে বক্তব্য এবং চরিত্রকে স্পষ্টতর অভিব্যক্তি দান করার জন্যই কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন ঘটনা কল্পিত হয়েছে।

বাইবেলে আরও অজস্র প্রেমোপাখ্যান আছে—নিতান্তই কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সেসব গ্রন্থভুক্ত করতে পারলাম না। কিন্তু এই মহাগ্রন্থের প্রতি যদি কোন পাঠকের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা জাগে তাহলে আমার শ্রম সার্থক মনে করবো।

আজকের এই দুর্মূল্যের দিনে বিপুলায়তন এই গ্রন্থটি প্রকাশ করে আমার অনুজপ্রতিম প্রবীর মিত্র তার নিবিড় সাহিত্যপ্রীতি ও শিল্পমনের পরিচয় দিয়েছেন।

আমাদের প্রকাশিত লেখকের আর একখানি অসাধারণ বই

নগর সুন্দরী

জোসুয়া ও ম্যাগডালিন

জেরুজ্যালেম।

স্বপ্নের জেরুজ্যালেম! আর কতদূর—আর কতদূর! তাইবেরিয়াসের বাজার ছাড়িয়ে রুক্ষ পাথুরে চড়াই উৎরাই ডিঙ্গিয়ে আস্তে আস্তে চলেছে উটের দীর্ঘ কাফিলা। দূরের মরুভূমি থেকে হু-হু করে আগুনের হলকার মত বাতাসের ঝাপটা এসে পড়ছে তাদের নাকে মুখে চোখে।

চারিদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঝাঁপিযে নেমে আসছে। রাস্তার দুধারে কমলা আর জলপাইগাছের ফাঁক দিয়ে চাঁদ উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু এখনও আকাশ থেকে যেন আগুন ছড়াচ্ছে। বাতাসে উত্তাপের রেশ। এই গরমের জন্যেই তারা দিনের বেলা পথ চলতে পারে না। ঝাপড়া গাছগাছালির ভেতর দিয়ে তার উৎসুক চোখদুটো ছড়িয়ে দিল মিরিয়ম—

না। কিছু দেখা যায় না। শুধু ঘন থকথকে অতিকায় এক একটা দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে গাছপালার জঙ্গলে আচ্ছন্ন পাহাড়। মনটা ভারী হয়ে ওঠে ম্যাগডালার মেয়ে মিরিয়মের। গ্যালিলির এই পাহাড়গুলো ছাড়িয়ে আরও কতদূর—কতদূর গেলে পাওয়া যাবে সেই শহর ন্যাজারেথ, কে জানে? ন্যাজারেথের পর থেকে তারা দিনের আলোয় চলতে পারবে। আর দু'চোখ ভরে দেখবে—শুধু দেখবে প্রকৃতির অবারিত রূপ।

ওরা চলে। উটের গলায় বাঁধা ঘণ্টা বাজে ডিং-ডং-ডিং-ডং।

রাত বাড়ে। ঘুমে জড়িয়ে আসে মিরিয়মের চোখদুটো। তন্দ্রার ভেতরে কুয়াশায় ঢাকা অস্পষ্ট আর ঝাপসা কতগুলো ছবির মত ফুটে ওঠে কয়েকটি দৃশ্য: গ্যালিলির সমুদ্রের ধারে সেই ধূ-ধূ বালুচর, মাথার ওপরে বিপুলব্যাপ্ত আকাশ, নীচে সাগরের বিশাল জলরাশি। চারিদিকের সেই আদিম পৃথিবীর মতই নিঃসঙ্কোচ এবং নগ্ন হয়ে স্নান করছিল।

স্নান সেরে ধীর পায়ে সে উঠে এসেছিল। সকালের রোদ তরল সোনার মত গলে গলে পড়ছিল তার সম্পূর্ণ নিরাবণ দেহে। স্বর্গের লাজ

আলোর গোলকটা তার মাথার চারিদিকে দেবীমূর্তির জ্যোতিশিখার মত জ্বলজ্বল করছিল। আর তার মনে হয়েছিল, সমুদ্রের নীল জল, দিগন্তের সবুজ, আকাশের অফুরাণ আলো—এইসব—সব কিছু-ই যেন তিলে তিলে তিলোত্তমার মত গড়ে তুলেছে তার নগ্ন দেহের অপরূপ সৌন্দর্য সম্ভার। তার তন্বী দেহে ষোলবছরের উদ্দাম যৌবনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার নিজেরই অপলক দুটো চোখে মুগ্ধ তন্ময়তা নেমে এসেছিল। আর সমুদ্রের হু হু বাতাস যেন অস্ফুট মন্ত্রোচ্চারণের মত তার কানের কাছে বারে বারে বলছিল শুধু একটি —একটি কথা—তুমি সুন্দরী, ম্যাগডালার মিরিয়ম, তুমি ভীষণ সুন্দরী।

তার বুকের ভেতরে তীব্র খুশির কলধ্বনি বাজতে লাগল। সমুদ্রের কলোল্লাস, একটানা বাতাসের ঐক্যতান তার সুঠাম দুটো পায়ে ফুটিয়ে তুলেছিল নাচের ছন্দ। সে নাচছিল—বিজন সেই সমুদ্রতীরে উদার আকাশের নীচে সে বিভোর হয়ে নাচছিল। যেন কোন অপ্সরী তার অনাবরণ দেহের বিপুল ঐশ্বর্য দেখিয়ে বিমোহিত করতে চেষ্টা করছে ওই দূর আকাশে লুকিয়ে থাকা অদৃশ্য ঈশ্বরকে—

খুট্—বালিয়াড়ির আড়ালে একটা সন্দেহজনক শব্দ শুনতে পেয়ে যখন তার পোশাকটা পরার জন্য ছুটছিল তখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল একটা রাখাল ছেলে।

যা সরে যা—পালা, বলেই দুহাতে দেহের যৌবনচিহ্নগুলো ঢেকে হিংস্র বাঘিণীর মত চিৎকার করে উঠেছিল সে। কিন্তু ছেলেটি যায় নি। তার পাদুটো যেন বালিতে আটকে গিয়েছিল। কিন্তু সে আর তাকে তাড়িয়েও দেয় নি। ওর বিস্ফারিত দুটো চোখের বিস্মিত দৃষ্টি তার নগ্ন দেহের বিচিত্র সৌন্দর্যকে লোলুপ উল্লাসে যেন গ্রাস করছিল। সে কাঁপছিল। থর থর করে কাঁপছিল। যেন কম্প দিয়ে জ্বর আসছে ওর।

অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে কি দেখছে—ছেলেটা কেন কাঁপছে—কেন দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও গেল না—এসব ভাবতে গিয়ে সেইদিন তার প্রথম মনে হয়েছিল তার রূপের আছে অপরিসীম শক্তি!

আর মনে হয়েছিল, তার এই স্বর্গীয় সৌন্দর্য গ্যালিলির সমুদ্রের ধারে জেলেদের গ্রাম ম্যাগডালার কোন নোংরা আর আঁশটে গন্ধেভরা ঘরের অন্ধকারে তিলে তিলে শেষ হয়ে যাওয়ার জন্য নয়। সেইদিনই সে ঠিক করেছিল, আর গ্রামে নয়, যেমন করেই হোক যেতে হবে—যেতে হবে—জেরুজ্যালেমে—

আরও কত কথা তার মনে হল—তার পাশের বাড়ির ছেলে উরি তার-

বাল্যবন্ধুও তাকে বলেছিল জেরুজ্যালেমের কথা। উরি স্বপ্ন দেখে তাকে বিয়ে করে শহরে ঘর বাঁধবে। উরির গোলগাল বোকা-বোকা মুখখানা মনে পড়ে হাসি পায়। ঈশ্বরের দান তার এই অপার্থিব রূপ-যৌবন কোন একজনের জন্যে নয়···আলোঝলমল লোক গিসগিস মহানগরী জেরুজ্যালেম····সেখানকার লোকের মুখে মুখে তার রূপের প্রশংসা রাশি রাশি টাকা সোনা হীরা জহরৎ আরও কত আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের কত টুকরো টুকরো ছবিকে গভীর ঘুমের ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তলিয়ে দিল একটু একটু করে—

—হো—ই—ও—ও—উঁচু গলার হাঁকে ঘুম ভেঙে গেল মিরিয়মের। থমকে দাঁড়াল গোটা দলটা। পথের ধারে মাওকেটিয়ান পাহাড থেকে নেমে এল মধ্যবয়সী একটা লোক। তার সঙ্গে কুড়ি-বাইশ বছরের একটা মেয়ে। তার হৃষ্টপুষ্ট দেহে যৌবন জেগে আছে প্রখর হয়ে।

তোমরা এই মেয়েটিকে জেরুজ্যালেমে নিয়ে যেয়ে বিক্রি করে দিও বুঝলে।

ও খুব ভাল নাচতে পারে—গাইতে পারে—

ও তোমার কে হয়? দলেব নেতা সিমন প্রশ্ন করল।

দেহাতী লোকটা বিরক্ত হয়ে বলল, কে আবার—আমার তিন নম্বর বৌ। ঘরের কাজকর্ম কিছু জানে না। ও আপদ বিদেয় হওয়াই ভাল—

সিমন আপত্তি করল না। মেয়েটিকে মিরিয়মের পাশে বসতে বলল। কাফিলা আবার চলতে শুরু করল।

তোমার নাম কি? মিরিয়ম আলাপ জমায়।

আমার নাম বাগা, বলেই মিরিয়মের মুখের দিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কি দেখে। আর খুব আস্তে আস্তে যেন নিজের মনেই বলে, ইস্ কী সুন্দর—কী সুন্দর তুমি—তার মুগ্ধ চোখদুটোর দৃষ্টি মিরিয়মের মাথা থেকে পা-পর্যন্ত বুলিয়ে নিয়ে-ই আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে—ইস তোমার পা-দুটোও কি নিটোল—কী-সুন্দর—

কথায় কথায় ওদের ঘনিষ্ঠতা হতে দেরী হয় না। মিরিয়ম তার সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে ফেলে—বাগা খাস জেরুজ্যালেমের মেয়ে। ছোটবেলা থেকে নাচে গানে পটু। আফ্রোদিতির মন্দিরের নর্তকী। কিন্তু রক্তে জেগেছিল ঘরসংসারের বাসনা। তাই ওই দেহাতী পাহাড়ী লোকটার সঙ্গে পালিয়েছিল। কিন্তু বনের পাখির কী কখনও খাঁচার বন্ধন ভালো লাগে?

উটের পিঠে দুলে দুলে ওরা চলে। বাগা তার নিটোল দুটো হাত দিয়ে মিরিয়মকে জড়িয়ে ধরে। বাগার শরীরের উত্তাপে তার শীত শীত ভাবটা

কেটে যায়। মিরিয়মের মুখে, ঠোঁটে, গলায়, বুকে আলতোভাবে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ফিসফিস করে বলে, বাগা মনে হয় কোন পুরুষমানুষের হাতের ছোঁয়া পড়ে নি তোমার বুকে—

মিরিয়ম কথা বলে না। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, গ্যালিলির সমুদ্রের ধারে ধু ধু সেই বালুচরে নিজের নিরাবরণ দেহের ছবি। সেই রাখাল ছেলেটা। মধুর লোভে লোভে যেমন মৌমাছি আসে তেমনি করে আবার একদিন এসেছিল তার শক্ত কর্কশ হাত দিয়ে তার সুডৌল বুকটা স্পর্শ করতেই তাকে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু বিচিত্র এক শিহরণে সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। তারপরে উরিও একদিন তার বুকে—

তুমি চলো না জেরুজ্যালেমে মিরিয়ম, তোমাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে, বাগা তার কাছে গুন গুন করে, তোমার সারা গা সোনা দিয়ে মুড়ে দেবে। তোমাকে রোমীয়রা টাকার পাহাড়ে বসিয়ে রাখবে, বাগার কথাগুলোর ভেতরে আলোকোজ্জ্বল অনাগত ভবিষ্যতের ছবি ফুটে ওঠে।

মিরিয়ম কিছু বলে না। তার মনে পড়ে, মা-র কথা। সে ভূমিষ্ঠ হওয়াব আগে নাকি মা স্বপ্ন দেখেছিল, তাব মেয়ে হবে রাজরাণী, হবে বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক।

এই স্বপ্নের কথা শুনে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল তার বাবা-ডেভিড। রোদে-ঝড়ে-জলে সমুদ্রে মাছ ধরে তার দিন কাটে। অত কষ্ট করেও সংসারে নুন আনতে তেল ফুরোয়। তার ওপরে আবার রোমীয়রা বাজপাখির মত থেকে থেকে ঝাঁপিয়ে এসে খাজনা আদায়ের নাম করে সর্বস্ব লুটেপুটে নিয়ে যায়। হয় টাকা, না হয় দাও সোনাদানা—নিদেন পক্ষে কিছু না পাবো ঝুড়ি ভরে মাছ দাও। কিছু না পেলে-ই ঘরে আগুন দেবে। মেয়েদের ওপর অত্যাচার করবে!

অভাব অনটনের সঙ্গে দুহাতে লড়াই করতে করতে বাবার মনটা হয়ে গিয়েছিল রুক্ষ, কর্কশ। তাই মাকে না কি বলেছিল, ভাঙ্গা নড়বড়ে কুঁড়েঘরে খড়ের বিছানায় শুয়ে প্রসবের যন্ত্রণায় ছটফট করছো জেরা। আর রাজরাণী মেয়ের স্বপ্ন দেখছো—ভালো—ভালো—এই সময়ে এসব স্বপ্ন দেখলে তোমার কষ্ট কম হবে—

সেই নিশিরাতে দূর প্রবাসের পথে যেতে যেতে তার মনে পড়ল, বাবা, মা-র কথা, মনে পড়ল, তাদের হাঁ-করা অভাবের সংসারের কথা। সেখানে দু-বেলা দুটো পেটভরে খেতে পায় না। ছেঁড়া জামায় তার উদ্বেল যৌবনকে

আড়াল করতে পারে না। অথচ এমন রূপ তার। এতবড় মূলধন থাকতে শুকিয়ে মরবে কেন ?

না। তার টাকা চাই—অনেক—অনেক টাকা—অনেক গয়না—অনেক—অনেক ঐশ্বর্য। কতদূর—জেরুজ্যালেম আর কতদূর। অসহ্য—অসহ্য একটা অস্থিরতায় ছটফট করে তার বুকের ভেতরটা।

কী গো-সুন্দরী, তুমি চুপ করে কি এত ভাবছো বলো তো ? বাগার কথায় যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল মিরিয়ম।

তুমি জেরুজ্যালেমে, কোথায় উঠবে ?

আমার এক পিসীমার বাড়িতে, নিজের চিন্তার ভেতরে ডুব দিয়ে আস্তে আস্তে বলল মিরিয়ম, শুনেছি পিসেমশায় না কি রোমীয়দের কোন বড় পুরোহিতের প্রাসাদে ঝাড়পোছের কাজ করে—হঠাৎ থেমে গেল সে। স্থির দৃষ্টিতে কয়েকমুহূর্ত বাগার দিকে তাকিয়ে যেন অনেক—অনেক দূর থেকে বলল, বাগা—আমি—তোমার মত দেবদাসী হবো—নাচবো—প্রাণভরে শুধু নেচে যাবো, উত্তেজনায় হাঁফাতে লাগল মিরিয়ম। দূরে ঘন অন্ধকারে চোখদুটো ছড়িয়ে দিয়ে আবার বলতে শুরু করল, জানো বাগা—ঝড় জলের রাতে বাবা একদিন আর সমুদ্র থেকে ফিরে এল না। মা বুক চাপড়ে কাঁদছে, ছোট ছোট ভাইবোনগুলো কাঁদছে। আমিও দুহাতে বুক চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গেলাম সমুদ্রের ধারে। তখনো ঝড়ো বাতাসে সমুদ্র গজরাচ্ছে। আমার যে কি হলো বাগা—সেই সাঁ সাঁ বাতাস আর সাগরের বড় বড় ঢেউয়ের গোঁ গোঁ শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমি পাগলের মত নাচতে শুরু করলাম—নাচছি তো—নাচছি-ই, পা-দুটোর ওপরে আমার যেন কোন বশ নেই। ক্যাপা সমুদ্র, ক্যাপা বাতাস, মেঘে ঢাকা কালো আকাশ—সব যেন আমার কানে কানে ফিস ফিস করে বলছে—নাচো-নাচো-নেচে নেচে মনের ভার কমিয়ে নাও, হঠাৎ থেমে গেল মিরিয়ম। ক্লান্ত হয়ে বড় বড় নিশ্বাস ফেলতে লাগল। অবসন্ন হয়ে মাথাটা নীচু করে অস্ফুটস্বরে বলল, আমি নাচিয়ে হওয়ার জন্যই জন্মেছি—বাগা।

পুবের আকাশে ভোরের রেখা জাগল। দূরে জুডিয়া পাহাড়ের গায়ে ছবির মত আঁকা জেরুজ্যালেম শহর ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল। কাফিলার পরিচালক সিমন হেঁকে বলল, আমরা—এবার—জেরুজ্যালেম শহরে—ঢুকছি—

মিরিয়মের বুকের ভেতরে কে যেন হাতুড়ি পিটতে লাগল। আহ্লে

সত্যিই সে তার স্বপ্নের জেরুজ্যালেমে আসতে পারল! সেই পুণ্যনগরীর অপরূপ শোভার দিকে তাকিয়ে তার কালো ডাগর দুটো চোখ মুগ্ধ হয়ে গেল। নগরের মাঝখানে ঘন সন্নিবদ্ধ জলপাই আর দীর্ঘ সাইপ্রাস ও উইলোগোছের মিষ্টি নীলাভ ছায়ায় ঢাকা একটা পাহাড়। পাহাড়ের ঢালুতে ঘন সবুজ গাছগাছালির ভেতরে শ্বেতপদ্মের মত সাদা পাথরের এক একটা সুদৃশ্য সৌধ। প্রত্যেক অট্টালিকার সম্মুখের উদ্যানে নানা রঙের ফুলের সমারোহ। কোথাও সাদা জুঁইফুলের গুচ্ছ বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে, কোথাও ম্যাগনেটো গোলাপ কিম্বা ঘন বেগুনীরঙের রাশি রাশি করবী চারিদিক আলো করে ফুটে রয়েছে।—সবচেয়ে বিশাল যে প্রাসাদটা দেখছো, সিমন মিরিয়মকে তার পিসী নিভার বাড়িতে নিয়ে যেতে যেতে বলে—ওটাই হলো—শয়তান জেরুজ্যালেমের সেই রোমীয় শাসনকর্তা পন্তিয়াস দি পাইলেতের প্যালেস—একটু থেমে আবার বলে, আর এই যে মন্দিরটা দেখছো যার সোনার চূড়ো ঝকঝক করছে ওটাই হলো ওই হিদেনদের দেবতা জুপিটারের মন্দির।

ম্যাগডালার ধীবর পল্লীর মেয়ের বুকের ভেতরটা তীব্র যন্ত্রণায় যেন পুড়ে যাচ্ছে—যদি এখুনি যদি ওই প্রাসাদের ভেতরে ছুটে যেতে পারতো। ওই সোনার মন্দিরে আছে যে-দেবতা তাব সামনে যেয়ে যদি সে উদ্দাম হয়ে নাচতে পারতো—অসম্ভব আর অবাস্তব কতগুলো বাসনা যেন সহজ সরল সেই গেঁয়ো-মেয়েটিকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলতে লাগল।

কখন অভিজাত পল্লী ছাড়িয়ে এসেছে; কখন ঘিঞ্জি নোংরা গলির ভেতর দিয়ে সিমন তাকে নিয়ে গোয়ালাদের বস্তি ছাড়িয়ে, চামড়ার দুর্গন্ধে ভরা ঘোড়ার জিনের কারিগরদের মহল্লা পেরিয়ে পিসীমা, নিভার বাড়ির দিকে চলেছে—সেসব কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই ম্যাগডালার সেই অপরূপ রূপসী মেয়ে ম্যাগড্যালিনের (মিরিয়ম)!

খট-খট-খট তাদের ম্যাগডালার সেই ভাঙা নড়বড়ে কুঁড়ে ঘরটার মতই জীর্ণ একটা ঘরের সামনে গিয়ে খুব জোরে কড়া নাড়ল সিমন।

ও মা!—তুই এসে গেছিস, উচ্ছ্বসিত হয়ে ছুটে বাইরে এল নিভা। কিন্তু মিরিয়মের দিকে তাকিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেল। অস্ফুটস্বরে বলল, ইস্, কী সুন্দর হয়েছিস তুই—

তোমার বৌদি জেরা বলে দিয়েছে, সিমন বলল, ভালো কোন স্বজাতির (ইহুদী) ছেলে-টেলে দেখে সাদী দিয়ে দিতে, বলেই জোব্বার ভেতর থেকে বের করে জেরার একটা চিঠিও দিল। সাদী তো দিতেই হবে সিমন ভাই,

মিরিয়মকে বুকের ভেতরে জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে বলল নিভা ওই আগুনের মত রূপ নিয়ে এসেছে এই শহরে, রোমীয় শকুনেরা ওকে ছিঁড়ে খাবে। নিভার চোখে আশঙ্কার ছায়া কাঁপে থর থর করে।

কিন্তু মিরিয়ম—

ম্যাগডালার মেয়ে ম্যাগড্যালিন, যে পাঁকে পদ্মফুলের মত সেই গ্যালিলির সমুদ্রের ধারে দরিদ্র ধীবর পল্লীতে জন্ম নিয়েও বাইবেলের রমণীদের ভেতরে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়, রূপরম্যা ও লাস্যময়ী তরুণী হয়ে বিপুল খ্যাতি অর্জন করবে, হয়ে উঠবে খ্রীষ্টধর্মের সেই রক্তক্ষয়ী ঘটনাজটিল ইতিহাসের এক রোমাঞ্চকর নায়িকা,—তার জীবনের গতি কি কখনো বিয়ে-ঘর-বর সন্তান—সেই গতানুগতিক পথে নিয়ন্ত্রিত হয়—না হতে পারে?

পিসীমা নিভা মাঝবয়সী মহিলা। দীর্ঘকাল শহরে থেকেও তার চোখেমুখে শহুরে ছাপ পড়ে নি। আর পাঁচজন ইহুদীর মত কট্টর রোমীয়-বিদ্বেষী। সে চেয়েছিল, ভাইঝির বিয়ে দিতে। কিন্তু পিসেমশায় জামেশা ফ্যারিসীদের *প্রধান পুরোহিত সায়াফাসের প্রাসাদের তিন নম্বর পরিচারক, তার মনে হলো, যদি মিরিয়মকে একবার জুপিটারের মন্দিরের কি পন্তিয়াস পাইলেতের রাজপ্রাসাদের নর্তকী করে দিতে পারে, তাহলে নির্ঘাত বড়কর্তাদের নজরে পড়বে ওই অসামান্য রূপলাবণ্য আর তার ভাগ্যটাও ফিরে যাবে—

শোন—আমি মিরিয়মকে রাজপ্রাসাদের নৃত্যশিক্ষক ডিমিট্রিয়াসের কাছে—

না—না—তুমি আমার ভাইঝিকে রোমানদের বেশ্যা করতে চাও, ক্ষিপ্ত আক্রোশে বাঘিনীর মত চীৎকার করে উঠল নিভা। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে কেটে কেটে বলল, তুমি ওই বেশ্যার দালাল শয়তান গ্রীকটার কাছে ওকে নেবে না বলছি—কয়েক মুহূর্ত পর শান্ত হয়ে বলল, আমাদের গ্রামের উরি—ওর ছোটবেলার বন্ধু। 'এই সেদিনও ওর খোঁজে এসেছিল। তার সঙ্গে ওর—

না—পিসী, উরিকে সাদী করতে পারবো না—বিয়ে-টিয়ে আমাকে দিয়ে

---

* অত্যন্ত আচারনিষ্ঠ প্রাচীন ইহুদী ধর্মসম্প্রদায়ের লোক। ধর্মের গোঁড়ামী এবং অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন জনসাধারণের ওপরে তাদের ছিল বিপুল প্রভাব। তাই রোমীয় শাসকরা দেশের আভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কিছুটা দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতো।

হবে না, তীব্র একটা উত্তেজনায় নিভাকে জড়িয়ে ধরে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, আমি রোমীয়দের বড় মন্দিরের নর্তকী হবো। পিসী—আমার যে টাকা চাই—গয়না চাই—অনেক অনেক ঐশ্বর্য চাই পিসী।

মিরিয়মের সেই উত্তেজিত উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে নিভা ভয় পেয়ে গেল।

জামেশার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

মিরিয়মের অপূর্ব দেহসৌষ্ঠব রূপের জহুরী ডিমিট্রিয়াসের নজরে পড়তে দেরী হল না। মুগ্ধ-বিস্ময়ে ম্যাগডালার সেই রূপসীর দিকে তাকিয়ে তার পিসেমশায় জামেশাকে বলল, এ মেয়ে তো রাজরাণী হবে গো—ওর পা দুটো দেখেছ?

আর কিছু বলল না। কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করল।

মিরিয়মের সেই স্বর্ণলতার মত তনুদেহ আর মোমের মত মসৃন নিটোল দুটো পায়ে অসাধারণ নৃত্যপটিয়সীর ভবিষ্যৎ আভাস আছে।

সে তখুনি সিদ্ধান্ত করে ফেলল, ফ্যারিসীদের প্রধান পুরোহিত জায়াফাসের প্রাসাদে যে ধর্মোৎসব হবে সেইখানে রাজনর্তকীদের সঙ্গে উপস্থিত করবে প্রস্ফুটিত ফুলের মত সজীব এই সুযৌবনা অপ্সরীকে। চমকে উঠবে সায়াফাস, চমকে উঠবে জেরুজ্যালেমে রোমান সম্রাটের প্রতিনিধি পন্তিয়াস পাইলেত। কিন্তু তার আগে ওকে একটু তালিম দিয়ে নিতে হবে।

এইখানেই একদিন বাগা-কে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল মিরিয়ম। ডিমিট্রিয়াসের গৃহে নর্তকীদের দেখাশোনা করে আর নাচের সঙ্গে বাঁশী বাজায় এক বুড়ো ইহুদী সাব্বা। ক্রীতদাস হয়ে থাকার সময় কে জানে কোন অপরাধে তার একটা চোখ ধারালো ছুরি দিয়ে উপড়ে দিয়েছিল রোমীয়রা।

একদিন সাব্বা মিরিয়মের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল ম্যাগডালিন, তুমি রূপসী। রোমীয়দের অঢেল সম্পদ এসে তোমার পায়ের নীচে লুটিয়ে পড়বে। তোমার গরীব স্বজন পরিজনদের কিন্তু ভুলে যেও না মিরিয়ম—

না-না ভুলবো কেন সাব্বা-ভাই।

অনেক পরে জেনেছিল বিদ্রোহী ইহুদীদের দলের সঙ্গে সাব্বার যোগাযোগ ছিল।

আলোকোজ্জ্বল মহানগরী জেরুজ্যালেম। তার চারিদিকে সুরক্ষিত প্রাচীরের ওপরে সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত রয়েছে বর্ণাঢ্য পোশাকে সুসজ্জিত শত-

শত সশস্ত্র প্রহরী। দূরের শহর, জনপদ থেকে দলে দলে আসছে পুরোহিতরা। তাদের পরণে বকের পালকের মত সাদা ধবধবে পোষাক। তাদের পরেই মিছিল করে আসছে রোমীয় শাসনকর্তার প্রতিনিধিরা। তাদের গায়ে রক্তকরবীর মত টকটকে লাল ভেলভেটের পোষাক। কোমরে ঝকমক করছে সোনার বাঁট লাগানো দীর্ঘ তলোয়ার। তাদের অনুসরণ করে আসছে ক্রীতদাসদের দল। ওদের প্রত্যেকের মাথায় রূপোর বড় বড় থালায় তাল তাল সোনা হীরা-জহরৎ, আর সুস্বাদু খাদ্যসামগ্রী—দেশের মানুষের দণ্ডমুণ্ডের মালিক পুরোহিতদের উপঢৌকন।

এই রঙীন মিছিল চলেছে প্রধান পুরোহিত সায়াফাসের প্রাসাদে ধর্মোৎসবে। রাজপথের দুপাশে জলন্ত মশাল হাতে নিয়ে ছবির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে কাফ্রী ক্রীতদাসরা। ব্যাণ্ড বাজছে, বাজছে বিউগিল, বাজছে ঝাঁঝর আর সানাই। বিচিত্র সেই ঐক্যতানের সুমধুর মূর্ছনায় চারদিক কেমন আচ্ছন্ন আর বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

দূরে আলোর দীপালি জ্বলছে শ্বেতপাথরের তৈরী সায়াফাসের সুরম্য প্রাসাদের ভিতরে বিশাল সভাকক্ষে কাঞ্চনময় মঞ্চে বসে আছেন জেরুজ্যালেমের প্রধান শাসক পন্তিয়াস পাইলেতের প্রতিনিধি প্রধান সেনানায়ক কমোডাস। তার পাশেই পুরোহিতদের সর্বাধিনায়ক বৃদ্ধ অ্যানস্, তারপরেই সায়াফাস এবং অন্যান্য মন্দিরের পুরোহিত বর্গ। সায়াফাস ইঙ্গিত করতেই ঝংকার লাগল বীণার তারে তারে। আর সুগন্ধী ফুলের বলয়ে সাজানো নৃত্যস্থলীতে যেন মরালীর মত ভেসে ভেসে এল ঘর-যৌবনবতী রাজনর্তকীরা।

কিন্তু একী! চমকে ওঠে কমোডাসের চোখের দৃষ্টি। সায়াফাসের রক্তাভ কুটিল চোখে একটা প্রশ্ন ঘনিয়ে আসে নৃত্যপটিয়সীদের রুক্ষ রূঢ় সৌন্দর্যের মাঝখানে এ কোন রূপধন্যা নারী! ওর প্রতিমার মত সুডৌল মুখে কেমন শান্ত আর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মত কমনীয়তা!

প্রবল হয়ে ওঠে বীনার ঝংকার তীব্র উল্লাসে বেজে ওঠে জলতরঙ্গের মধুর সুর। নর্তকীরা তাদের যৌবনপুষ্ট দেহের লীলায়িত বিন্যাসে বিচিত্র মুদ্রা রচনা করে নাচতে থাকে।

কিন্তু দূর থেকে ডিমিট্রিয়াস যন্ত্রণায় জলে যায়। কিছু হচ্ছে না মিরিয়মের নাচ। ওর উদ্দাম পদক্ষেপে কেমন একটা বন্যতা ফুটে উঠেছে। এত করে তালিম দিয়েছে—

বন্ধ কর নাচ, হঠাৎ কমোডাস নিজের উরুতে একটা চাপড় মেরে চীৎকার

করে বলল ডিমিট্রিয়াসকে, তোমার আর সব নর্তকীদের বিদায় করে শুধু নতুন মেয়েটিকে নাচতে বলো—

সায়াফাসের ইঙ্গিতে মিরিয়মকে ভেতরে নিয়ে যেয়ে আর এক পোষাকে সাজিয়ে নিয়ে এল ডিমিট্রিয়াস। প্রায় নগ্নদেহের অধোভূবনে স্বচ্ছ আর হাল্কা কমলা রঙের একটা ঘাঘরা।

আবার বেজে উঠল অর্কেস্ট্রা। যেই নিজের যৌবন সম্ভারকে অবারিত করে দাঁড়ালো মিরিয়ম অমনি তার চেতনার ভেতরে মর্মরিত হয়ে উঠল সেই গ্যালিলির সমুদ্রের কলোল্লাস, নিঃসীম বালুচর আর ঈশ্বরের কাছে নৈবদ্যের মত নিবেদিত নিজের অনাবরণ দেহের অপরিসীম সৌন্দর্য। সঙ্গে সঙ্গে তার স্নায়ুতে স্নায়ুতে উত্তেজনার তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল। আর উদ্দাম গতিতে নাচতে লাগল মিরিয়ম।

উতরোল হয়ে উঠল বাজনা। মিরিয়ম নাচছে পাগলের মত। তার পা দুটোর ওপর কোন বশ নেই। তার রক্তে জেগেছে গ্যালিলির সমুদ্রের সেই আদিমতা। তীব্র বেগে নাচের তালে তালে তার রক্তিম চুলের ঢেউ আছড়ে পড়ছে উত্তুঙ্গ বুকের ওপরে। আবার পরমুহূর্তেই সেই ঢেউ সরে যাচ্ছে আর বিদ্যুতের রেখার মত ঝলসে উঠছে রঙীন কাঁচুলির আড়ালে দুটো বিচিত্র বিভ্রমের ছবি।

বাহবা—বাহবা—পৈশাচিক উল্লাসে চীৎকার করে উঠল প্রধান পুরোহিত সায়াফাস। প্রায় স্বচ্ছ পোষাকের আড়ালে অগ্নি শিখার মত জলন্ত সেই যৌবনের মূর্তি অভিজাত রোমীয় এবং ফ্যারিসীদের স্নায়ুকে বিকল করে দিল। তারা কেউ হীরের আংটি, কেউ বহুমূল্য নীলাভ পাথর বসানো মুক্তোর অঙ্গুরী, নানারকমের জড়োয়া গয়না, রক্ত প্রবালের মালা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগল মিরিয়মের দিকে।

কিন্তু বিচিত্র সেই নর্তকীর কোনদিকে খেয়াল নেই। কখনো স্বর্ণলতার মত দুটো বাহু তুলে, কখনো চক্রাকারে পাক খেয়ে খেয়ে সে উন্মার গতিতে নেচেই চলেছে।

এক সময় সেই উদ্দাম বেগ কমে এল। ঈশ্বরের কাছে ভক্ত যেমন আকুল হয়ে নিজেকে নিবেদন করে ঠিক তেমনি সায়াফাসের পায়ের ওপরে লুটিয়ে পড়ল মিরিয়ম। স্তব্ধ হয়ে গেল অর্কেস্ট্রা! কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতার ভেতরে তলিয়ে বসে রইল দর্শকরা, হাততালি দিতে পর্যন্ত ভুলে গেল।

বাগা ছুটে এসে ম্যাগডালিনের প্রায় অনাবরণ দেহ-টি পরমযত্নে রক্তবর্ণের রেশমের চাদর দিয়ে ঢেকে দিল। আর রোমীয়দের উপহার রাশি রাশি অলঙ্কার আর মনিমুক্তা দ্রুত হাতে একটি থলিতে ভরে নিল। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো মিরিয়ম। আলোকোজ্জ্বল সেই নৃত্যস্থলীতে তার বাজেন্দ্রাণীর মত শান্ত সমাহিত রূপের ঐশ্বর্য দেখে রোমীয় নোবেলদের অপলক চোখে মুগ্ধ তন্ময়তা থম থম করতে লাগল।

এইবার কমোডাসের সামনে এসে দাঁড়ালো সেই প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা। মধু খাওয়া মৌমাছির মত কয়েক মুহূর্ত ঝিম ধরে রেখে হঠাৎ অবরুদ্ধ আবেগে উত্তেজনায় চীৎকার করে উঠল সেই রোমীয় সেনানায়ক কমোডাস, তুমি কে—কে তুমি?

জলতরঙ্গের মত মিষ্টি শব্দ ছড়িয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল মিরিয়ম। হাসির রেশ টেনে বলল, আমি—ম্যাগডালার মেরী*।

সুন্দরী—তুমি—তুমি অসাধারণ সুন্দরী, যেন সুখস্বপ্নের ঘোরে বিড বিড় করে বলল কমোডাস। বলেই তার গলায় পরিয়ে দিল মহার্ঘ সোনার মালা।

এদিকে এস রূপসী, মধুঝরা কণ্ঠে ডাকল সায়াফাস। তার রক্তবর্ণ রেশমের মত নরম চুলে হাত বুলিয়ে তার কানে পরিয়ে দিল সুদৃশ্য একটি হীরের কর্ণপুর। মুহূর্তে হীনমন্যতার ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল প্রবীন পুরোহিত অ্যানসের মন। সে দ্রুত নিজের হাতের স্বর্ণকঙ্কন খুলে পরমযত্নে পরিয়ে দিল মিরিয়মের বাহুতে।

জেরুজ্যালেমের শাসক এবং অভিজাত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের প্রীতির উপহারে সালঙ্করা হয়ে সম্রাজ্ঞীর মত দৃপ্তভঙ্গীতে এল মহিলাদের কাছে। তাদের চোখে জলজল করছে ঈর্ষা। অসাধারণ সেই রূপরাশির সামনে তারা নিজেদের অত্যন্ত অসহায় আর দীনাতিদীন মনে করল। মেয়েদের ম্লান বিষন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে হাসি ঝিকমিক করতে লাগল মিরিয়মের চোখে—

গর্বের হাসি।

আলো ঝলমল সেই দরবার কক্ষ থেকে বেরিয়ে মিরিয়ম আর বাগা এল ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন উদ্যানে। জমাট অন্ধকার থেকে হঠাৎ একটা ছায়ামূর্তির মত ছুটে এসে মিরিয়মকে বুকের ভেতরে জড়িয়ে ধরল নিভা। অস্ফুটস্বরে

---

* ম্যাগডালিন এবং মিরিয়ম—নাম দুইটির অন্ত্যজ ইহুদীদের ছাপ আছে বলে ডিমিট্রিয়াস তার নাম বদলে দিয়েছিল।

বলল—মেরী মেরী—তুই—রাজরাণী হতে পারবি—তোর মা-র স্বপ্ন—তীব্র আবেগে তার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এল।

সায়াফাসের বিশাল সুরম্য প্রাসাদ সংলগ্ন সেই প্রাচীন উদ্যানে অন্ধকারে এক একটা অতিকায় প্রেতের মত গায়ে গা দিয়ে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইউক্যালিপট্যাস আর জলপাইগাছের সারি। দূরে সাঁ সাঁ বাতাসের আর্তনাদ আছড়ে পড়ছে সাইপ্রাসের ঝিরিঝিরি পাতায়।

সেই আদিম অন্ধকারে নিশব্দ পায়ে চলেছে তিনটি ছায়াদেহ। তিনটি রমণী—তাদের হাতে বহুমূল্য পশমের চাদরের পুঁটলী, তার ভেতরে জেরুজ্যালেমের অভিজাতদের অর্ঘ—রাশি রাশি স্বর্ণালঙ্কার, হীরে, প্রবাল, পুস্পরাগ, ইন্দ্রনীল ও মরকত মনি—অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্য অতএব—

যা হয়, হয়ে থাকে। তাই হল—

আঙুরগাছের ঝোপের ভেতর থেকে নেকড়ের মত অতর্কিতে তাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল তিন দুর্বৃত্ত

ওদিকে সেই রাত্রেই গুপ্তচর বিভাগের প্রধান কমোডাসের কানে কানে ফিসফিস করে বলল কতগুলো ভয়ঙ্কর কথা—

সে কী! কঠোর হয়ে উঠল রোমীয় সেনাপতির ভারী মাংসল মুখখানা। তার রক্তচোখে ধু ধু করে জ্বলতে লাগল বন্য হিংসা। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল কমোডাস, তুমি—কি বললে নাচের সময় যে বুড়ো কানা ইহুদীটা বাঁশী বাজাচ্ছিল—

হ্যাঁ—ওর নাম সাব্বা—বিদ্রোহী ইহুদীর দল অর্থাৎ জিয়ালটদের* সঙ্গে ওর গোপন যোগাযোগ আছে—

তুমি বলছো—ম্যাগডালার সেই সুন্দরী নর্তকীর—সঙ্গে সাব্বার খুব ভাবসাব আছে, উত্তেজনায় কমোডাসের চোখদুটো দুখণ্ড আগুনের মত ঝকমক করতে লাগল। হঠাৎ আহত বাঘের মত গর্জন করে বলল, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কি—যেমন করে পারো, যেখান থেকে হয় যে অবস্থায় থাক, নাচিয়ে মেয়েটিকে ধরে নিয়ে এস—এক রাত্রে সে যত উপহার পেয়েছে সেসব যদি জিয়ালটদের হাতে পড়ে?

---

* সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী ইহুদীদের সংস্থার কর্মী। ৩০—৪০ খৃষ্টপূর্বাব্দে প্রথমে গ্যালিলিতে পরে জুডিয়া বা জেরুজ্যালেমে এদের কর্মতৎপরতা প্রবল হয়ে ওঠে। পৌত্তলিক এবং অত্যাচারী রোমীয় শাসনের অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করার মহৎ ব্রতে উৎসর্গীকৃত এদের জীবন।

কমোডাস অস্থির পায়ে পায়চারী করতে শুরু করে। অসহ্য—অসহ্য একটা যন্ত্রণায় জ্বলে যায় তার বুকের ভেতরটা। তার মনের ভেতরে জ্বলজ্বল করে উঠল তন্বী সুঠাম এক রূপরম্যা নারী। তার চাঁপার কলির মত দীর্ঘ আঙ্গুলে সে নিজের হাতে রক্তপ্রবালের অঙ্গুরীয় পরিয়ে দিচ্ছে—

সেই রাত্রেই পুন্নগরীর দিকে দিকে সেই অসাধারণ রূপসী নর্তকীর খোঁজে সশস্ত্র প্রহরী পাঠিয়ে দিল কমোডাস।

সেই রাত্রে কেন যেন মিরিয়ম-কে নিয়ে নিজের বাড়িতে গেল না নিভা। গেহিনম উপত্যকায় ঘোড়ার জীনের কারিগরদের নোংরা বস্তীতে তার পরিচিত এক বৃদ্ধার কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল।

রাত্রি গভীর হলো।

গাঢ় ঘুমে তলিয়ে গেল বৃদ্ধা। খড়ের গাদার ভেতর থেকে দুইটি পুঁটলী বের করে নিয়ে এল বাগা। বারান্দার মেঝেতে একটি সুদৃশ্য চাদর পেতে মিরিয়ম ছড়িয়ে দিল রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা। সেই মুদ্রাগুলোর ওপরে সাজিয়ে রাখল রোমীয় নোবেলদের স্বর্ণালঙ্কার! তার পাশে সযত্নে রাখল মেয়েদের স্বর্ণাভরণ—ব্রেসলেট, নেকলেশ নানা বৈচিত্র্যময় ইয়ার-রিং।

শোন, পিসী, বিপুল সম্পদের অধিশ্বরী সম্রাজ্ঞীর মতই আদেশের সুরে বলল মিরিয়ম, পুরুষদের এই গয়নাগুলো তো আমার পক্ষে পরা সম্ভব নয়, একটু থেমে আবার বলল, তবে কমোডাস আর সায়াফাসের আংটি দুটো রাখবো, আর রাখবো মেয়েদের গয়নাগুলো—আবার হঠাৎ থেমে গেল সে। তার ঘন কালো চোখদুটো কেমন সুদূর আর স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে বলল বাদবাকী সোনা রুপোর অলঙ্কার যা আছে—সব বিক্রি করবো, সেই টাকা দিয়ে আমি একটা মস্তবড় বাড়ি কিনবো! তার চারিদিকে থাকবে বাগান—

বাড়ি! বলছিস কী তুই! নিভার চোখদুটো বিস্ময়ে ছটফট করে। নিভু নিভু গলায় বলে, তুই কি মাংসাশী নরপশুগুলোর অত্যাচার সহ্য করে এই শহরে থাকতে পারবি মা—

পারবো—পিসী—পারবো। চারিদিকের প্রগাঢ় স্তব্ধতার ভেতরে যেন ঝন ঝন করে বেজে উঠল মিরিয়মের কণ্ঠস্বর। কয়েক মুহূর্ত কি ভেবে যেন অনেক—অনেক দূর থেকে বলল, আমি—আমি যদি একবার এখানে স্থায়ী হয়ে বসতে পারি, হঠাৎ থেমে গেল। চর্বির তেলের কুপির ছায়া কাঁপা আলোয় তার

চোখদুটো বিদ্যুতের মত ঝকমক করে উঠল। নিজের তন্বী সুঠাম অবয়বের দিকে ইসারা করে বলল, সুগন্ধী জলপাই তেল আর গন্ধপুষ্পের নির্বাস মেখে মেখে এই দেহটাকে আরও রমণীয়—আরও আকর্ষণী করে তুলবো। সুডৌল বুকের দুটো উদ্ধত গ্রহের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, পুরুষের ভোগবাসনা-স্থল এই দুটো-কে আবদ্ধ করবো রূপোর চুমকি বসানো পীতবর্ণ রেশমের কাঁচুলীতে। আর কানে দুলবে মুক্তোর ঝুমকো। গলায় শোভা পাবে সোনার নেকলেশ। মাথার কেশগুচ্ছের কোনটায় জ্বলজ্বল করবে মরকত মণি, কোনটায় পুষ্পরাগ, কোনটায় রক্তপ্রবাল, বলতে বলতে তীব্র উত্তেজনার আবেগে যেন খেই হারিয়ে ফেলল মিরিয়ম। স্তব্ধ হয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল উঠোনের অন্ধকারের দিকে। সে যেন দেখতে পাচ্ছে, সেই জমাট অন্ধকারে তার অতুলনীয় রূপ আর উদগ্র যৌবনের পসরা নিয়ে একটা রঙীন মরিচীকা মূর্তির মত জ্বলজ্বল করছে তার দীর্ঘ ক্ষীণ তনু! দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে নিজেকে সংযত করল সে। শান্ত কণ্ঠে বলল, দেখবে সারা জেরুজ্যালেম আমার পায়ের নীচে লুটিয়ে পড়বে—একটু থেমে চারদিকের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে যেন হঠাৎ সচেতন হয়ে বলল যাও—যাও—পিসী দাঁড়িয়ে দেখছ কি—এর পরে দিনের আলো—

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই নিভা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। শহরের শেষপ্রান্তে স্বর্ণকার জোব্বার বাড়ি থেকে ফেরার সময় বাজারের ভেতর দিয়ে আসতেই নিভার কানে পড়ল—

আরে শুনেছো ম্যাগডালার সেই সুন্দরী নাচনেওয়ালী ছুঁড়িটার সঙ্গে নাকি জিয়ালটদের যোগাযোগ আছে বলে, এক বুড়ো ইহুদী মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলছে—শয়তান কমোডাসের সৈন্যরা সারা শহরে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে নর্তকীকে—

পিসীমার কাছে সব শুনে মিরিয়মের মুখে ভয়ের ছায়া পড়ল না। কমোডাসের উপহার সেই সোনার নেকলেশ পরে চলে এল রোমীয় সেনানায়কের প্রাসাদে।

কাঞ্চনময় মঞ্চে বসে আছেন রোমীয় শাসক পন্তিয়াস পাইলেতের সহকারী কমোডাস। তার সামনে মৃদুলগতি মরালীর মত এসে দাঁড়ালো রূপধন্যা সু-যৌবনা মিরিয়ম। কমোডাসের মনে হল, যেন সুদূর আর অপার্থিব এক রমণী মূর্তি। সমরনায়কের রক্তবর্ণ চোখের কঠোর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আস্তে আস্তে স্নিগ্ধ হয়ে এল। মৃদুকণ্ঠে বলল, কাল রাত্রে তুমি কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলে সুন্দরী।

বিগতরাত্রে গ্রীক নৃত্যশিক্ষক ডিমিট্রিয়াস, তার পিসেমশায় জামেশা এবং বংশীবাদক সাব্বা তার উপহার সেই বহুমূল্য রকমারী অলঙ্কারের লোভে তাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তারা পরস্পর যখন কথা কাটাকাটি থেকে রক্তাবক্তি শুরু করেছে তখন সায়াফাসের প্রাসাদেব প্রহরীরা তাদের রক্ষা করেছিল। তারপরে আর সব ঘটনা একে একে বলল মিরিয়ম। আর বলতে বলতে তার চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। ঘন কালো ডাগরদুটো চোখের কোনায় কোনায় অশ্রুবিন্দু দেখেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল কমোডাস। আর অতি দ্রুত মিরিয়মকে তার প্রশস্ত বিশাল জানুর ওপরে বসিয়ে নিয়ে বলল, তুমি বিচলিত হচ্ছো কেন সুন্দরী? একটু থেমে প্রখর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আবার বলল, আচ্ছা সাব্বা যে জিয়ালটদের দলের লোক আর তাদের সংস্থার জন্যই যে গহনা লুঠ করতে এসেছিল—এসব কি তুমি বুঝতে পেরেছিলে ?

রোমীয়দের অঢেল ঐশ্বর্য, সারা জেরুজ্যালেমের সম্পদ তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বে সুন্দরী, হঠাৎ সাব্বার কথাগুলো তার কানের কাছে বেজে উঠল। নিশ্চয়ই সাব্বার নিজের জন্য নয়, সে জানে সাব্বা লোভী নয়, তার দলের জন্যই সোনাদানা নিতে এসেছিল মনে হয়—এসব কথাই তার বোধরাজ্যের কুয়াশাব ভেতরে ছটফট করতে লাগল। কিন্তু মনের ভাব গোপন করে মুখে মোহমাখা হাসি ফুটিয়ে বলল মিরিয়ম, মহামান্য কমোডাস আমি সামান্য গেঁয়ো মেয়ে—তোমাদের এই শহুরে রাজনীতির কি বুঝি বলো? তারপরেই কমোডাসের কণ্ঠলগ্না হয়ে আবার বলল, জেনে রেখ—আমি—অত্যন্ত রাজভক্ত। আমি জানি—একমাত্র তোমাকে—

বেশ—বেশ—বলো সুন্দরী তোমার কি চাই?

আমার চাই তোমার মত এইরকম একটি বিরাট প্রাসাদ। তার সামনে থাকবে বাগান, যেন মধুর এক সুখস্বপ্নের ঘোরে বলতে লাগল মিরিয়ম, সেই বাগানে থাকবে নানা রঙের ফুল—

তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে মিরিয়ম—

বিজয়িনীর মত গর্বিত পদক্ষেপে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল ম্যাগডালার ধীবর কন্যা ম্যাগডালিন। মধুর এক প্রসন্নতায় আবিষ্ট হয়ে গেল তার চেতনা। রাজরাণী হওয়ার স্বপ্নটা তাহলে সত্যে রূপায়িত হতে চলেছে। কিন্তু—কোথায় তার রাজা? দিব্যকান্তি। গৌরবর্ণ। দীর্ঘ তনু। সুদূর স্বপ্নের মত নীলাভ দুটো চোখ। ভুবনমোহন রূপের জ্যোতি বিচ্ছুরিত করে

কি তিনি আসছেন তাকে নিয়ে যেতে। কবে—কবে আসবে সেই শুভলগ্ন? তার মনে হল—তার বুকের ভেতরে দাঁড়িয়ে যেন অনেক—অনেকদূর থেকে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে আশ্চর্য এক অগ্নিবর্ণ পুরুষ!

তিন মাস পর।

ধূপছায়ার মত সন্ধ্যা নামছে জেরুজ্যালেমে। মাউণ্ট অলিভে বিত্তশালী অভিজাত ব্যক্তিদের সুরম্য বাসগৃহের মাঝখানে ঝলমল করছে মিরিয়মের আলোকোজ্জ্বল বিশাল প্রাসাদ। প্রধান তোরণের সামনে সুদৃশ্য পাল্কী আর গোযানের ভীড়। প্রতি রজনীতে যেমন রোমীয় সেনানায়ক কমোডাস কি প্রধান ঋত্বিক সায়াফাস তেমনি এসেছে পণ্ডিত, দার্শনিক, কবি ইত্যাদি বুদ্ধিজীবিদের দল। দূরদূরান্ত থেকে এসেছে সুবেশ সুন্দর সুবর্ণ শ্রেষ্ঠীরা, এসেছে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা এসেছে ঐশ্বর্যশালী বণিকেরা এসেছে দূরদেশের বহুদর্শী মুসাফিররা। প্রাসাদ সংলগ্ন ঘন সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ উদ্যান জুড়ে বস্ত্রখচিত রঙীন চন্দ্রাতপ লম্বিত হয়ে রয়েছে। তার নীচে ইতস্তত এক একটি মেহগিনির তক্তাপোষে রক্তবর্ণ জাজিম বিছানো হয়েছে। তার ওপরে বসে কোথাও দার্শনিকদের দল গ্রীক দর্শনের আলোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে, আবার কোথাও বসেছে কবিতার আসর, কোথাও বা জুডিয়া বা জেরুজ্যালেমের রাজনীতি নিয়ে তর্কের ঝড় উঠেছে। কাফ্রী ক্রীতদাসরা নিঃশব্দে অতিথিদের সামনে নামিয়ে রাখছে রৌপ্যনির্মিত রেকাবীতে সুস্বাদু আহার্য সম্ভার—সুমিষ্ট রসালো খেজুর, আর নানাবিধ মিষ্টান্ন! হঠাৎ কোথায় থেকে ঝর ঝর করে ঝড়ে পড়ে সুগন্ধী গোলাপজলের বৃষ্টি। প্রাসাদের অধিশ্বরীর নির্দেশে প্রাঙ্গনের দুইদিকে অন্ধকার নেপথ্য থেকে পরিচারিকারা পিচকারী দিয়ে সুগন্ধী সেই জল ছিটিয়ে দেয়।

নানা আলোচনায় মুখর সেই বিদ্বজ্জনসমাবেশের অদূরে চিত্রকরের আঁকা ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে এক সুবেশা রমণী। বাগা। তার হাতে স্ফটিক পাত্রে টলমল করছে মদিরা। যখন কোন কবি তার চোখ দুটোকে স্বপ্নালু করে হয়তো স্বরচিত কবিতায় ইহুদীজাতির অতীত ঐতিহ্যের জয়গান করতে করতে আবেগে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন, কি কোন সম্ভ্রান্ত ফ্যারিসী এবং রোমীয় পণ্ডিতের ভেতরে ঈশ্বর নিরাকার না সাকার নিয়ে তুমুল বাক-বিতণ্ডার ঝড় চরমে উঠেছে—ঠিক তখুনি বাগা ছুটে এসে তাদের ব্রোঞ্জনির্মিত শূন্য পাত্রে ঢেলে দিচ্ছে জর্ডনের পার্বত্য উপত্যকার সুমিষ্ট দ্রাক্ষাগারের সুগন্ধী

উত্তেজক সুরা। মদিরার উগ্র ঝাঁঝালো গন্ধে তাদের আবেগ ও উত্তেজনা আরও বর্দ্ধিত হয়ে উঠছে—

সেই সুধীজনসমাবেশের অদূরে রত্নখচিত আসনে সম্রাজ্ঞীর মত বসে আছে ম্যাগডালিন। তার সুবর্ণলতার পদযুগলে শোভা পাচ্ছে স্বর্ণখচিত পাদুকা। আর কমলা রঙের মহার্ঘ মসলিনের রাজকীয় বস্ত্রাবরণে আবৃত তার দীর্ঘ তনুদেহ যেন অগ্নিশিখার মত জ্বলজ্বল করছে। তার সুডৌল মুখে ঝিকমিক করছে হাসি। তার রূপ আর যৌবনের গর্বের হাসি।

ঈশ্বরতত্ত্ব, দর্শন, রাজনীতি, সাহিত্য নিয়ে এখানে যারা তর্কযুদ্ধের ঝড় তুলেছে তাদের প্রত্যেকের ভেতরে লুকিয়ে আছে এক একটি নারীমাংসলোলুপ হিংস্র পশু। কিন্তু এদের কাউকে কখনো দেয় নি প্রশ্রয়। এমন কি কমোডাসেরও সম্ভোগবাসনাকে সে শান্ত সংযত করে দিয়েছে।

একদিন গভীর রাত্রে কামনান্মোত্ত মাতঙ্গের মত কমোডাস এসেছিল তার শয়নকক্ষে। বাকনিপুণ বহুদর্শী প্রেমিকের মত নায়িকার মনহরনের জন্য রঙীন কথার ফুলঝুরি না জেলে সমরকুশলী সেনাপতি অব্যর্থ লক্ষ্যে নিপুণ হাতে খুলে ফেলেছিল তার ঘাঘরা, খুলে ফেলেছিল অন্তর্বাস।

না—সে বাধা দেয় নি। কিন্তু যে মুহূর্তে সেই নিরাবরণ দেহলতাটিকে মত্ত উল্লাসে বেষ্টন করে তার লেলিহান লালসাকে চরিতার্থ করতে উদ্যোগী হয়েছিল অমনি সে দূরে সরে গিয়েছিল আর শ্বেতপাথরে বাঁধানো উঁচু আসনে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, মহামান্য 'কমোডাস'—তোমাদের মন্দিরে ডায়না কি অ্যাফ্রোদিতির মূর্তি দেখেও কি তোমার মনে কামনার আগুন জ্বলে ওঠে? জেনে রেখ—প্রত্যেক নারীর ভেতরেই আছে মহাশক্তিরূপিণী দেবী—ঝাড়-বাতির আলোয় উজ্জ্বল প্রদীপ্ত তার সম্পূর্ণ নগ্নদেহের অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের দিকে ইঙ্গিত করে আবার অস্ফুট স্বরে বলেছিল, বিধাতার দান এই নারীদেহের রূপলাবণ্য শুধু ভোগ করার জন্য উন্মত্ত না হয়ে শ্রদ্ধা করতে শেখ কমোডাস—তোমার মঙ্গল হবে—

সেনানায়ক পাথুরে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল আর কামনার আগুন নিভে গিয়ে চোখে ফুটে উঠেছিল বিস্ময়।

কি দেখছ কমোডাস—আবার বলেছিল, এই সেদিন ক্লিওপেট্রার ওপর অত্যাচারের জন্য মিশর তোমাদের হাতছাড়া হয় নি—?

আর দাঁড়ায় নি কমোডাস। মাথা নীচু করে চলে গিয়েছিল আর কখনো নিশীথ অভিসারে আসে নি।

ওই যে বসে আছেন বিচক্ষণ জননেতা ফ্যারিসীদের প্রধান পুরোহিত, সেই ধার্মিক মহাশয়টিও এসেছিলেন। এসেছিলেন লোকলজ্জার ভয়ে ফকিরের ছদ্মবেশে। পিতার বয়সী প্রবীন মানুষটিকে দেখেই ঘৃণায় জলে উঠে বলেছিল— আপনি ফ্যারিসী হলেও ইহুদী। ইহুদীদের মন্দিরে সোনার পাপবরণ থাকে জানেন? আর আপনি প্রধান পুরোহিত হয়ে এসেছেন কুমারীর সতীত্বনাশ করে পুণ্য অর্জন করতে—

কি এত ভাবছো ম্যাগডালিন? কমোডাস রুক্ষ কণ্ঠে বলল, আমরা কি সারারাত পণ্ডিতদের কচকচি-ই শুনবো?

তোমার নাচ শুরু করবে কখন, সায়াফাস অধৈর্য হয়ে ওঠে। আপনারা তো জানেন, ভেতর থেকে সাড়া না পেলে আমি নাচতে পারি না,—গম্ভীর চিন্তার ভেতরে মগ্ন থেকেই মিরিয়ম বলল।

দূরে-বহুদূরে জুড়িয়া পাহাড়ের আড়ালে চাঁদ উঠল। পবিত্র নগরী জেরুজ্যালেম চাঁদের আলো মেখে স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইল। এইবার মিরিয়মের চেতনার ভেতরে মর্মরিত হয়ে উঠল নাচের ছন্দ। নিঃশব্দ পায়ে চলে গেল তার প্রসাধন কক্ষে। ফিরে এল যেন কোন সুদূর অজানা রূপকথার অপ্সরী হয়ে। বাগার মৃদঙ্গে নাচের বোল উঠল।

সিডনের শিল্পী ইলার (মাসখানেক আগে নিভা নিয়ে এসেছিল) বাঁশীতে জাগল করুণ সুরের মূর্চ্ছনা।

আরম্ভ হলো নাচ।

প্রথমে পেলব দুটো বাহুকে খুব মৃদু গতিতে আন্দোলিত করে নাচতে শুরু করল মিরিয়ম।

মৃদঙ্গের ধ্বনিতে, বাঁশীর সুরে বিষাদের সুর যেন ক্রমশ গভীর হয়ে উঠতে লাগল। সেই সুমধুর করুণ সুর, স্বপ্নের মত নীলাভ পোষাকের আড়ালে রূপসী নর্তকীর দীর্ঘ ক্ষীণতনু বিমোহিত দর্শকদের কেমন ব্যথাতুর আর স্বপ্নাচ্ছন্ন করে তুলল। সেই গভীর ব্যথার উজান ঠেলে আসা ঐকতানের তালে তাল মিরিয়মের দেহবল্লরী যেন উত্তাল বেদনার নদীর মত তরঙ্গায়িত হয়ে উঠতে লাগল। আর নৃত্যের প্রতিটি মুদ্রায় ফুঠে উঠল যেন কোন অদৃশ্য দেবতার কাছে আত্মনিবেদনের বিনম্র আকুতি। মুগ্ধ ও অভিভূত দর্শকদের মনে হলো—মনে হলো তারা যেন কোন সুদূর বিস্মৃতকালের অবলুপ্ত অতীতের করুণ সঙ্গীত শুনছে। আর তারাও যেন অতীত বর্তমান ছাড়িয়ে অনেক অনেক

স্মৃতি-বিস্মৃতিকে পিছনে ফেলে, লোকলোকান্ত পেরিয়ে চলেছে অজানা জগতে।

আবার হঠাৎ বাঁশীর সুরে মৃদঙ্গের ধ্বনিতে বেদনার সঙ্গীতের পরিবর্তে জেগে উঠল উল্লাসের ঝঙ্কার মুহূর্তে পাল্টে গেল মিরিয়ম গভীর বিষাদের সেই নীল প্রতিমা যেন থিরবিজুরী রেখার মত ঝকমক করে উঠল। টান দিয়ে খুলে ফেলল সেই স্বচ্ছ নীলাভ গাউনেব আবরণ। যেন তীক্ষ্ণ তীব্র বিদ্যুতের সাদা আলোর রেখা ঝলসে উঠল নৃত্যস্থলীতে। দর্শকদের মনে হল—একী মানবী? মুঠো মুঠো জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া নর্তকীর তন্বী দেহের অপার্থিব জ্যোতিতে যেন অন্ধ হয়ে গেল তাদের দৃষ্টি।

চোখদুটো বুজে উতরোল বাজনার তালে তালে উদ্দাম বেগে নাচছে মিরিয়ম। কখনো হামাগুঁড়ি দিয়ে বসে ঠিক নিবিড় অরণ্যে হিংস্র একটা বাঘিনীর মত যেন তার শিকারের দিকে এগিয়ে আসছে অব্যর্থ লক্ষ্যে; আবার পর মুহূর্তেই উঠে দাঁড়িয়ে চক্রাকারে পাক খেয়ে উন্মত্ত বেগে নেচে চলেছে তার। রক্তিমময় চুলের ঢেউ আছড়ে পড়ছে তার উত্তুঙ্গ বুকের ওপরে। আবার চোখের পলকে যেই সেই ঢেউ সরে যাচ্ছে অমনি দর্শকদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে তার বঙীণ বক্ষোবাসের আড়ালে আন্দোলিত সেই দুইটি দুরন্ত গ্রহ। তার অপ্রতুল অস্বচ্ছ বেশবাসের আড়ালে অনাবৃত আশ্চর্য যৌবনশ্রী, অতি দ্রুত আন্দোলিত সুপুষ্ট নিতম্বের ছায়াময় মরীচিকা শিল্পী, কবি, দার্শনিক রোমীয় নোবেল আর ফ্যারিসী ইহুদীদের স্নায়ুকে বিকল করে দিল, বিশৃঙ্খল হয়ে গেল তাদের চেতনা।

বিচিত্র সেই নর্তকীর কিন্তু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। বর্ষাসমাগমে ঘন কালো মেঘের গর্জনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেন এক মত্ত ময়ূরী অন্ধ আবেগে বিভোর হয়ে নেচেই চলেছে। লুপ্ত হয়ে গিয়েছে বাইরের পৃথিবীর সমাজ সংসার। এক বৃদ্ধ ফ্যারিসীর মনে হলো, এই রমণী যেন তাকে সেই লোকান্তপারের অশরীরি আত্মার সেই চিররহস্যময় জগতে নিয়ে চলেছে।

ম্যাগডালার এই মেয়েটির নাচ দেখলে, এক পুরোহিত বিড়বিড় করে যেন নিজের মনকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, মনে হয় যেন দূরাগত কোন প্রার্থনা সঙ্গীত শুনছি—

ডায়নার মন্দিরের দেবদাসী বলে মনে হয় ওকে। সম্ভ্রান্ত এক রোমীয় অস্ফুটস্বরে বলল, দেবীর কাছে আকুল হয়ে যেন আবেদন জানাচ্ছে—কিন্তু—

নৃত্যের ছন্দে হিল্লোলিত দেহবল্লরী প্রায় নগ্ন অবারিত সেই দেহের

অনির্বচনীয় রূপ, তার খরদ্যুতি ক্রমশ দর্শকদের চেতনাকে পীড়িত করে তুলছিল। অসাড় হয়ে আসছিল তাদের অনুভূতি। আর যেন মেরুদণ্ডের হাড়ে হাড়ে হু হু করে বয়ে চলেছিল হিমশীতল জলের স্রোত। হয়তো তার অতিথিরা আর সহ্য করতে পারবে না বলেই—

থামল মিরিয়ম। দূরে-বহুদূরে কাজল কালো দিগন্তে যেখানে মুখ থুবড়ে জবুথবু হয়ে পড়ে আছে বেথলেহাম গ্রাম, সেইদিকে তাকিয়ে মাথা নুইয়ে প্রণাম জানিয়ে থেমে গেল। নিশিপাওয়া মানুষের মত কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আর দূরে-বহুদূরে কুয়াশায় ঢাকা ঝাপসা পাহাড়ের দিকে চোখদুটো ছড়িয়ে দিয়ে বসে রইল সে।

না। হাততালি নয়, উচ্ছ্বসিত বাহবার উল্লসিত ধ্বনি নয়, প্রশংসার একটিও কথা নয়—নিথর স্তব্ধতা নেমে আসে আসরে। ইতিহাসেও আছে No applause, no clap after the dance of Mary Magdalene, one of the tantalizing Women of the Bible। বাইবেলের অসাধারণ আকর্ষণীয় রূপরম্যা, এই রমণীর নৃত্যের পর দর্শকরা এত অভিভূত হয়ে যেত যে কখনো হাততালি কি উল্লসিত হর্ষধ্বনি করতে পারতো না।

নাও। ম্যাগডালা সুন্দরী।

—অভিভূত আচ্ছন্নতার ঘোর কাটিয়ে জেরুজ্যালেমের শ্রেষ্ঠ নাগরিক কমোডাস নিতান্ত দীন একটি অনুগ্রহ প্রার্থীর মত সসঙ্কোচে এগিয়ে আসে। তার হাতে স্ফটিক পাত্রে রঙীন সুগন্ধী মদিরা। বলে এইটুক খেয়ে নাও মেরী—

আশ্চর্য।

সে যুগে নারীর প্রতি পুরুষের শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শনের ইঙ্গিত বহন করতো তাকে সুরা দিয়ে আপ্যায়নে। তা জেনেও সমবেত সবাইকে বিস্ময়ে স্তব্ধ করে দিয়ে প্রত্যাখান করল তাকে। উদাস চোখদুটো দূরে শেষ রাত্রির আকাশে অস্তমাণ চাঁদের দিকে ভাসিয়ে দিয়ে যেমন নিজের স্বপ্নের ভেতরে মগ্ন হয়েছিল তেমনিই বসে রইল।

পূবের আকাশে ভোরের রেখা জাগো কর্মিল পাহাড়ের আড়ালে মুঠো মুঠো আবির ছিটিয়ে দিয়ে সূর্য উঠল। সম্ভ্রান্ত অভিজাত রোমীয় এবং ফ্যারিসী অতিথিদের শেষ লিটার বা পালকি-টি প্রাঙ্গন শূন্য করে চলে গেল।

নিভা অতিথিদের উপহার স্বর্ণালঙ্কার আর অজস্র স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি দুইটি ঝুড়ি নিয়ে নিঃশব্দ পদক্ষেপে প্রবেশ করল প্রাসাদের একটি প্রকোষ্ঠে।

মহাজ্ঞানী নৃপতি সোলমনের রত্নাগারের প্রহরী, সেই রক্তচক্ষু ড্রাগনের মতই সে-ও এই কক্ষটিকে নিশিদিন সতর্ক প্রহরী আগলে রাখে।

আলো বাতাসশূন্য গবাক্ষহীন সেই জমাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন ঘরে কিসের যেন অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি ঝকমক করছে। শ্বেতপাথরের মেঝেতে ছড়ানো রয়েছে অজস্র অগণন স্বর্ণমুদ্রা আর সেই মুদ্রার পুরু আস্তরণের এক পাশে থরেথরে সাজানো রয়েছে বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কার—মিরিয়মের বিলাসী বিত্তশালী অতিথিদের প্রীতির উপহার!

নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর।

প্রাসাদের সেই রত্নাগারের সংলগ্ন একটি সুরম্য কক্ষে ব্রোঞ্জের ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো একটি সুবৃহৎ মুকুরের সম্মুখে ঈষৎ উচ্চ রৌপ্যখচিত আসনে সম্রাজ্ঞীর মত সমাসীন হয়ে ছিল জেরুজ্যালেমের নগরশোভনা সুন্দরী মিরিয়ম। সে স্থিরদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে তার প্রিয়সখী বাগার দ্রুত ও নিপুণ হাতে প্রসাধন সামগ্রীর প্রস্তুতিপর্ব। সেই কক্ষের মেহগিনি কাঠের থাকে রঙীন চিত্র-বিচিত্র এক একটা মৃৎপাত্রের কোনটায় আছে জুডিয়ার, কোনটায় মেসোপটেমিয়ার আবার কোনটায় দামাস্কাসের জলপাই তৈল বা অলিভ অয়েল। তার এক একটা নামিয়ে নীলবর্ণ রেশমবস্ত্রে আবৃত আবরণ (ঢাকনা) খুলে-ই মিশিয়ে দিচ্ছে অগুরু কাষ্ঠ (সুবাসিত চন্দন) চূর্ণ এবং সুগন্ধীপুষ্পের নির্যাস। উগ্র সুগন্ধে সেই প্রসাধন কক্ষের বাতাস আমোদিত হয়ে উঠল। ক্ষুদ্রাকৃতি স্বর্ণখচিত পাত্রে সুগন্ধী অলিভ অয়েল খানিকটা নিয়ে এল বাগা।

এই তো গাধার দুধে স্নান করে এলাম বাগা—এখন আবার—

কিন্তু তার কথা শেষ হওয়ার আগেই বাগা তার পেলব হাতের মসৃণ করতলে কোমল দুটো পায়ের করতলে এবং অগ্নিবর্ণ দেহগাত্রে সেই জলপাই তৈল পরমযত্নে মাখিয়ে দিতে শুরু করল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, তোমাকে সাজাতে বসলেই কি মনে হয় জানো?

কি?

মনে হয়, যেন দেবী অ্যাফ্রোদিতির সোনার অঙ্গে তেল মাখিয়ে বিকৃত করছি—

না, না ওসব বলিস্ না বাগা সভয়ে যেন আর্তনাদ করে উঠল মিরিয়ম। সুবৃহৎ সেই মুকুরে প্রতিবিম্বিত নিজের নিরাবরণ দেহের অপরিসীম সৌন্দর্যের দিকে চোখদুটো নিবদ্ধ রেখে বলল, আমি—আমি রক্তমাংসের মানুষ বাগা-একটু

থেমে কয়েকমুহূর্ত কি ভেবে হঠাৎ উদভ্রান্তের মত বলল, দে-দে বাগা আমাকে আরও ভাল করে আরও যত্ন করে সাজিয়ে দে। হেনার রং দিয়ে রঞ্জিত করে দে আমার হাতের করতল, লাক্ষাসার দিয়ে আমার অপর্যাপ্ত লাল চুলগুলোকে আরও উজ্জ্বল আরও মসৃণ, করে তোল।

হঠাৎ থেমে গেল সে। তীব্র আবেগকে কিছুটা সংযত করে বাগার কানে কানে বলল কতগুলো কথা। আর বলতে বলতে তার প্রতিমার মত সুডৌল মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল।

তাই না কি? খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল বাগা।

দূরে-বহুদূরে দিগন্ত রেখায় আঁকা বেথলেহামের দিকে চোখদুটো ছড়িয়ে কেমন স্বপ্নাচ্ছন্নের মত ছাড়া ছাড়া গলায় বলল, হ্যাঁ রে—আমার মন বলছে—সোনার বরণ রাজপুত্র আসছে—খুব শীগগীরই আসছে আমাকে বরণ করতে ভোঁ—ও—ও—ও—ও—ও—

অসময়ে মিরিয়মের অট্টালিকার প্রধান তোরণের সম্মুখে শিঙা বেজে উঠল। সেই তীক্ষ্ণ দূরাগত শব্দ মধ্য দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে মাউণ্ট অলিভ ছাড়িয়ে চলে গেল গেহিনন উপত্যকার দিকে।

বঙ্কিম হয়ে উঠল মিরিয়মের ভ্রূযুগল। অসময়ে কোন অতিথি এল। কিন্তু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, সম্ভ্রান্ত রোমীয় এবং পদস্থ পুরোহিতরা এই শব্দের সংকেত-ই তাদের উপস্থিতি ঘোষনা করে।

সায়াফাসের সহকারী এক পুরোহিত এসেছেন, মুবিয়া পরিচারক মিরিয়মকে অভিবাদন করে বলল, তিনি আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

তাঁকে এখানে নিয়ে এস নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল মিরিয়ম।

গর্বিত পদক্ষেপে এলেন নবীন পুরোহিত। পরনে তার মর্যাদার পরিচায়ক রক্তাভ গাঢ় বেগুণী রঙের ভেলভেটের দীর্ঘ জোব্বা।

চিনতে পারছো মিরিয়ম, উল্লসিত কণ্ঠে বলল উরি, সায়াফাস আমাকে জুপিটারের মন্দিরে পার্চমেণ্টকীপার নিযুক্ত করেছেন, বলতে বলতে মিরিয়মের কাছে এসে ঘন হয়ে দাঁড়ালো। বহুকালের পুরানো অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত বলল, মিরিয়ম গ্যালিলির সমুদ্রের বালুচরে দাঁড়িয়ে আমাকে চুমু খেয়েছিলে, সেই চুম্বন-ই তোমার আমার চিরকালের বন্ধন হয়ে রয়েছে—

কোন কথা বলল না মিরিয়ম।

কয়েক মুহূর্ত পরে উরির সেই হাসি হাসি গোল মুখখানার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন অনেক-অনেক দূর থেকে বলল সেসব ছোটবেলার কথা উরি,

একটু থেমে আবার অস্ফুটস্বরে বলল, আমি এখন অনেক বদলে গিয়েছি।

তুমি কি আমাকে তোমার যোগ্য মনে করো না মিরিয়ম বলতে বলতেই তার স্বর্ণলতার মত দীর্ঘ তন্বী দেহটাকে যেই জড়িয়ে ধরতে চাইল, অমনি দূরে সরে গেল মিরিয়ম।

আমার সঙ্গে তোমার জীবনকে জড়াতে চেষ্টা করো না উরি, সম্রাজ্ঞীর আদেশের মত শোনালো মিরিয়মের কণ্ঠস্বর।

কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে বাল্যসঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে চলে গেল উরি। অপমানে আর লজ্জায় তার বুকের ভেতরটা চিন চিন করে জ্বলে যেতে লাগল।

জুডিয়ার বিভিন্ন শহরের রোমীয় নোবেল এবং ফ্যারিসীদের কাছ থেকে নাচের আমন্ত্রন আসে। তাদের প্রত্যেককে প্রত্যাখান করে মিরিয়ম। জানিয়ে দেয়, সে শুধু তার গৃহের অতিথিদের-ই নৃত্য প্রদর্শন করে থাকে—কিন্তু—

একদিন ভেঙ্গে গেল তার নিয়ম। জেরুজ্যালেমের পুরোহিতদের অগ্রনায়ক অ্যানন্সের কাছ থেকে এল সনির্বন্ধ অনুরোধ। তিনি আরও জানিয়ে দিলেন আসরে উপস্থিত থাকবে শুধু সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চপদস্থ ইহুদী কর্মচারীরা। দর্শকদের ভেতরে শুধু নিয়মরক্ষার জন্যই উপস্থিত থাকবে একমাত্র রোমীয় কমোডাস।

তার স্বজাতীয়দের সামনে সে তার নৃত্যকলা প্রদর্শন করতে পারবে! তার বুকের কলধ্বনি বাজতে লাগল।

নৃত্যস্থলীর শ্বেতপাথরের মসৃন মেঝেতে এসে যখন ধীর পায়ে দাঁড়ালো, তখন ধার্মিক ইহুদীদের ধর্মবিশ্বাসের আলোয় উজ্জল চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার মনে হল, জীবনে এই প্রথম এবং হয়তো শেষ নারীমাংসলোলুপ পুরুষ দর্শকদের সম্মুখে নয়, একটি শুদ্ধ ভক্তি ও জলন্ত বিশ্বাসের প্রতীকের সামনে সে নৃত্য করতে এসেছে। মুহূর্তে একটা মহৎ, উদার ও পবিত্র অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল মিরিয়মের সমস্ত চেতনা আর তীব্র একটা আবেগে তার অন্তরটা যেন বিরাট আদিত্যবর্ণ এক অখণ্ড জ্যোতির্ময় সত্বার কাছে লুটিয়ে পড়তে চাইল। তার বুকের ভেতরে কান্নার সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠল। ইলার বাঁশীর সুরে আর বাগার মৃদঙ্গের ধ্বনিতে জেগে উঠল গভীর বেদনার করুণ মূর্চ্ছনা চোখদুটো বন্ধ করে পূজারিণীর মত বিনম্র ভঙ্গীতে নাচতে শুরু করল

মিরিয়ম। দেখতে দেখতে গ্যালিলির সমুদ্রের কলরোল জেগে উঠল তার পদক্ষেপে। সেই সাগরের অন্তহীন জলরাশি, বিপুলব্যপ্ত নীল আকাশ, ধু ধু বালুচর সব মিলিয়ে সেই অনন্ত মহিমার কাছে নিবেদনের এক সকরুণ ব্যাকুলতা পরিস্ফুট হয়ে উঠল তার নৃত্যের মুদ্রায়। তার বুকের ভেতরে যেন বেদনার সমুদ্র উথাল-পাথাল হয়ে উঠল। আর পারল না মিরিয়ম—

ঝড়ো একটা বাতাসের মত তীর বেগে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল মঞ্চ থেকে। আব বাতাসে বিলীয়মান হয়ে গেল তার চাপা কান্নার শব্দ।

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল দর্শকরা।

বদ্ধ একটা উন্মাদিনীর মত মিরিয়ম ছুটে এল বাগানে। আর ফুলে ফুলে ছেয়ে থাকা একটা ডালিমগাছের নীচে বসে দুহাতে মুখ ঢেকে অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ল।

বাগা এল।

তীব্র ব্যথায় মুচড়ে উঠল তার বুকের ভেতরটা। পাগলের মত চুমুতে চুমুতে আচ্ছন্ন করে মিরিয়মের গণ্ডদেশ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিল অশ্রুর চিহ্ন! পরম আদরে তাকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে এল পালকিতে।

নিশীথ রাত্রির নিজন পথে যেতে যেতে কেমন ঝাপসা গলায় বলল মিরিয়ম, জানিস বাগা, আজ নাচতে গিয়ে কী যে হয়ে গেল—আবার নিজের ভেতরে মগ্ন হয়ে গেল সে। আবার যেন নিজের-ই কোন গোপন কলঙ্কের কথা বলছে তেমনি চাপা গলায় ফিসফিস ক'রে বলল, কী আশ্চর্য আর অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে আমার সারা শরীর কেমন অবশ হয়ে এল। মনে হল—

থেমে গেল মিরিয়ম। নিঃশব্দ পথে পালকির বাহক নুবিয়া ক্রীতদাসদের পায়ের শব্দ বাজতে লাগল।

কি মনে হলো?

মনে হলো, অনেক-অনেক দূর থেকে কে যেন আমাকে কি বলছে। একটু থামল মিরিয়ম। আবার লিটারের কারুকার্য খচিত দেওয়ালের দিকে উদ্‌ভ্রান্ত আর অপলক চোখে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে বলল, কি বলছ বুঝলাম না। কিন্তু কী মিষ্টি—কী মধুর সেই কণ্ঠস্বর। কয়েকমুহূর্ত থেমে আবার কান্নায় ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, এমন কণ্ঠস্বর—আমি জীবনে কখনো শুনি নি বাগা—

ওদিকে আলোকজ্জল নৃত্যস্থলীতে পড়ে রইল দর্শকদের প্রীতির উপহার-থরে থরে সাজানো মহার্ঘ স্বর্ণাভরণ থেকে শুরু করে রক্তপ্রবালের কণ্ঠহার, নীলপ্রস্তর খচিত অঙ্গুরীয়। আরও কত কি!

আশ্চর্য। বিচিত্র সেই নর্তকী কিন্তু আর এল না। এল না তার অর্ঘ নিতে।

অ্যানন্স। ম্যাগডালার দরিদ্রধীবরকন্যা—কিন্তু কেমন মহৎ আর শুদ্ধাত্মা হয়ে উঠেছে—

বৃদ্ধ এক ফ্যারিসী। মেরীর নাচ দেখলে মনে হয় যেন জীহোভাকে আকুল হয়ে প্রণতি জানাচ্ছে—

কিন্তু সায়াফাসের কুটিল চোখে সন্দেহের ছায়া পড়ে। তার সহকারী উরির মনে হয়, মিরিয়মকে জড়িয়ে আছে কোন দুর্জ্ঞেয় রহস্য।

মিরিয়মের অপরিসীম মূল্যবান উপহার-কে নিদারুণ অবহেলায় অগ্রাহ্য করে চলে যাওয়া, তুষারের মত সাদা ধবধবে পরিচ্ছদ আর সদাসর্বদা একটা আচ্ছন্ন তন্ময় ভাব সায়াফাসের মনের ভেতরে ফুটিয়ে তুলল অনেক-অনেকদিন আগে দেখা একটি দৃশ্য—

গ্যালিলির গ্রামে গ্রামে ধর্মপোদেশ দিয়ে দিয়ে ঘুরছে এক বিচিত্র ইহুদী তরুণ। কেমন স্বপ্নাচ্ছন্ন বড় বড় নীল চোখ। তারও পরনে শুভ্র মেঘের মত উত্তরীয়।

সে কি বলছে জানে না। কখনো শোনেনি তার কথা, কিন্তু দেখেছে, গরীব-দুঃখী মানুষ তার চারিদিকে ভীড় করে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছে তার কথা। আর—

সরকার থেকে নিযুক্ত করা হয়েছে যে রাব্বিকে (ইহুদী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, গ্রামের মানুষকে ধর্মকথা শোনানোর জন্য নিযুক্ত বেতনভুক কর্মচারী) সে মাছি তাড়াচ্ছে। একথা ঠিক গ্যালিলি অঞ্চলে যতগুলো ভণ্ড, বাক্‌সর্বস্ব সাধুসন্ত আছে তার ভেতরে এই ন্যাজারথের ছোকরা জোসুয়ার-ই ভক্ত বা অনুগামীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তার মনের অন্ধকারে হঠাৎ বিদ্যুতচমকের ঝিলিক দিয়ে উঠল একটি অশুভ চিন্তা—ন্যাজারথের সেই স্বপ্নবিলাসী যুবকের সঙ্গে ম্যাগডালার এই ধীবররমণী, জেরুজ্যালেমের মক্ষিরাণীর কোন গোপন যোগাযোগ নেই তো? ডিমিট্রিয়াসের প্রাসাদের সেই বংশীবাদক একচক্ষু সাব্বা জিয়ালটদের গুপ্তচর। শুনেছে সাব্বার সঙ্গেও এই নর্তকীর খুব ভাবসাব ছিল। সাব্বা, এই নর্তকী আর সেই গ্যালিলির নবীন সন্ন্যাসী···তার অসংখ্য দরিদ্র ইহুদী অনুগামী · রোমীয়শাসনের বিরুদ্ধে ইহুদী জনসাধারণের মনে পুঞ্জীভূত আক্রোশ·· না আর ভাবতে পারছে না সে! অজস্র বিষধর সরীসৃপের মত সন্দেহ মনের অন্ধকারে কিলবিল করতে লাগল।

শোন উরি, নিজের ভেতরে ডুব দিয়েই বলল, সায়াফাস, তুমি আগামীকাল

ভোরেই গ্যালিলিতে যাবে—জোয়ার গতিবিধি লক্ষ্য করবে আর প্রতিদিন আমাকে খবর পাঠাবে—

খুশির আভাসে উজ্জল হয়ে উঠল উরির গোল মুখখানা। এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পেয়ে আত্মপ্রসাদে ভরে উঠল তার মন।

একেবারে বদলে গিয়েছে মিরিয়ম।

অ্যানন্সের প্রাসাদে সেই ঘটনার পর থেকে তার ভেতরে কোথায় যেন একটা বিরাট পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। নিশিদিন তন্ময় হয়ে কি ভাবে। আর রত্নাগারে যেয়ে কেন যেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অপর্যাপ্ত সম্পদের দিকে তাকিয়ে তার মনে পড়ে যায়, দূরে-বহুদূরে সেই গ্যালিলির সমুদ্রের ধারে মাছের আঁশটে গন্ধে ভরা কুঁড়েঘর, মা-ভাইবোনদের রোগা রোগা শুকনো মুখ। ম্যাগডালার ধীবর পল্লীর অনাহারে অর্দ্ধাহারে জীর্ণ মানুষগুলোর করুণ চেহারা—

রোমীয়দের অঢেল সম্পদ তোমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বে। দেখ স্বজন পরিজনদের ভুলে যেও না মিরিয়ম, অনেক-অনেকদূর থেকে যেন বাতাসের সওয়ার হয়ে ভেসে এল সাব্বাব কথাগুলো হুহু করে উঠল তার বুকের ভেতরটা। মনে মনে বলে—কোথায়-কোথায়—তুমি সাব্বা—এস-এস নিয়ে যাও। আমার এত আছে যে বারে বারে তুমি নিয়েও শেষ করতে পারবে না—

খুব সন্তর্পণে আর গোপনে নিভার চোখের আড়ালে প্রতিদিন কিছু স্বর্ণমুদ্রা আর স্বর্ণাভরণ এক একটা ঝুড়িতে ভর্তি করে গুপ্তকুঠুরীতে রেখে দেয় মিরিয়ম। আর রাশি রাশি মণি মুক্তা, হীরা জহরৎ বিক্রি করে মেসোপটেমিয়া থেকে নিয়ে আনে প্রাচ্যদেশীয় অতি মহার্ঘ সুগন্ধী, গাঙ্গেয় জটামাংসী, দামাস্কাস থেকে নিয়ে আসে জলপাই তৈল্য। প্রতি রজনীতে বাগা সুগন্ধী পুষ্পনির্যাস আর কস্তুরিকা মিশ্রিত জলপাই তৈল্যের প্রলেপে প্রিয়সখীর দেহ-বল্লরী স্বর্ণের মত অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি বিচ্ছুরিত করে তোলে ঘনপক্ষ ভ্রুজোড়ায় আয়তচুটো চোখে কাজল পরিয়ে দেয়।

আর বেশী সময় পাবি না বাগা। নিজের মনের ভেতরে ডুব দিয়ে কেমন উৎসুক স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে দূরে তাকিয়ে প্রায় নিঃশব্দ গলায় সে আসছে রে—আমি—আমি বুকের ভেতরে পায়ের ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি—

তুই কি করছিস বল তো মিরিয়ম, নিভা সতর্ক করে বলে যে ভাবে খোলামকুচির মত সোনার গয়নাগুলো বিক্রি করে প্রসাধনের জিনিস কিনছিস, —তোর ভাণ্ডার যে উজাড়—

ঝাক-ঝাক পিসী পরম আদরে নিভাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আর ওসবে কি হবে—তোমার মিরিয়ম যে শীগগীরই রাজরাণী হচ্ছে গো, বলতে বলতেই তার চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। মুখে হাসির নিঃশব্দ ঝরণা। হাসিতে চোখের জলে অন্ধ হয়ে এল তার দৃষ্টি—

জেরুজ্যালেমের জনাকীর্ণ পথে চলেছে একটি রৌপ্যখচিত সুদৃশ্য পালকি। পালকির দ্বারপথে শোভা পাচ্ছে পীতবর্ণ রেশমের আবরণ। মাউণ্ট অলিভ থেকে নেমে গোয়ালাদের বস্তী ছাড়িয়ে, ঘোড়ার জীনের কারখানা পেরিয়ে যেই লিটার বাজারে এসে পড়ল অমনি চারদিক থেকে রব উঠল—

ওই যে রোমীয়দের সেই বেশ্যা-টার পালকি যাচ্ছে—

ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দে লিটার —

ছিঃ ছিঃ ওর মুখ দেখলেও পাপ হয়—ইহুদীর মেয়ে ম্যাগডালা থেকে এসে ওই শয়তান কমোডাস আর সায়াফাসের রক্ষিতা হয়েছে—

লিটারের ভেতরে অন্ধকারে দীপশিখার মত কেঁপে উঠল মিরিয়ম। সে বেশ্যা। তার মুখ দেখলেও পাপ হয়—কেন কি পাপ করেছে সে ?

ঠক্ ঠক্ করে লিটারের গায়ে বড় বড় পাথরের টুকরো পড়তে লাগল।

এই খবরদার কেউ পালকিতে ঢিল মারবে না। রোমীয়দের বেশ্যা নয় ও, একটা ভারিক্কী বাজখাই গলার আওয়াজে ক্রুদ্ধ জনতা নিরস্ত হল।

মিরিয়ম চিনতে পারল, সেই যার সঙ্গে প্রথম এই শহরে এসেছিল, সেই তাদের গ্রামের বহুদর্শী ব্যবসায়ী এবং ভ্রমণকারী সিমনের কণ্ঠস্বর। মনে মনে গভীর কৃতজ্ঞতা জানালো সিমনকে। কিন্তু—

মারমুখী ক্ষিপ্ত জনতাকে আসতে দেখেই মিরিয়মের ভুবিয়া বেহারারা লিটার ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তাই বাধ্য হয়ে সিমন চাচার সঙ্গে বাড়ি ফিরছিল মিরিয়ম।

একটা পয়সা দেবেন রাণীমা, ঠিক বাজার ছাড়িয়ে চৌরাস্তার মোড়ে আসতেই এক বুড়ো অন্ধ ভিখারীর সঙ্গী একটি বালক মিরিয়মের কাছে হাত পেতে দাঁড়ালো।

রাণীমা! কথাটা যেন মিরিয়মের চেতনার ভেতরে মধুর একটা আবেশ ছড়িয়ে দিল। স্বর্ণখচিত পেটিকা থেকে একটি স্বর্ণমুদ্রা বালকটির হাতে দিয়ে অন্ধের মুখের দিকে তাকাতেই শিউরে উঠল, মুখ থেকে অস্ফুটস্বরে বেরিয়ে গেল —সাব্বা-ভাই না ?

চুপ! সাপের মত হিস হিস শব্দ করে উঠল লোকটা। আর ভালো চোখ দুটির ওপরে ব্যাণ্ডেজটা টেনে নামিয়ে দিয়ে ছেলেটির হাত ধরে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে চলে গেল।

সিমনের সঙ্গে নিরাপদে ভিলায় ফিরে এসেই মিরিয়ম সাব্বার চেহারার বিবরণ দিয়ে নিভাকে বলল, পিসী যাও তাকে এক্ষুনি ডেকে নিয়ে আসবে—

কিছুক্ষণ পরেই সাব্বা এল। রাজপ্রাসাদের মতই বিশাল অট্টালিকা আর ঘরে ঘরে রাজকীয় ঐশ্বর্যের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কেন আমাকে ডেকে আনলে—তুমি বেইমান—রোমীয় আর ফ্যারিসী শয়তানদের অঢেল সম্পদ পেয়ে তুমি তোমার গরীব ইহুদী ভাইবোনদের—

না-না সাব্বাভাই, তীব্র আবেগে ভেঙে পড়ে বলল মিরিয়ম, আমি যে আমার ভাইবোনদের ভুলিনি তা তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি, বলতে বলতে টেনে নিয়ে এল তার কোষাগারে। নিজের গোপন সঞ্চয় থেকে দুটি ঝুড়ি তার হাতে দিল। ঝুড়ি খুলতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল সাব্বার। রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা আর স্বর্ণাভরণ—

যাও যাও সাব্বাভাই, আমার গরীব দুঃখী ভাইবোনদের বিলিয়ে দাও। দাও জিয়ালটদের তাদের অনেক প্রয়োজন আছে, অনেক-অনেক দূর থেকে ছাড়া ছাড়া গলায় বলল, শুনেছি—রোমীয় আর ফ্যারিসীদের বিরুদ্ধে তারা—

চুপ—মিরিয়ম—চুপ—দেওয়ালের কান আছে, চাপা গলায় ফিস ফিস করে বলল সাব্বা। মিরিয়মের রেশমের মত নরম লালচুলে ভরা মাথায় হাত দিয়ে সাব্বা বলল, জীহোভা তোমার মঙ্গল করবেন—

তোমার যখন খুশি আসবে সাব্বাভাই বলল মিরিয়ম।

আর একটিও কথা না বলে সাব্বা দুটো বাস্কেট নিয়ে ঝড়ের বেগে চলে গেল।

তারপর থেকে নির্জন দুপুরে প্রায়ই আসে সাব্বা। আর জুডিয়ার রাজনীতির নানা খবর বলে, ন্যাজারথের জোসুয়াকে যিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন সেই জন দি ব্যাপটিস্টকে বিনা কারণে রোমীয়রা ফাঁসি দিয়েছে, জনসাধারণের মনে চাপা অসন্তোষ। তারা (জিয়ালটরা) সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে—

মিরিয়মের স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে তারা অস্ত্রশস্ত্র কিনছে···ইত্যাদি।

বলাবাহুল্য যখুনি আসে তখনি সাব্বা নিয়ে যায় বাস্কেট বোঝাই করে স্বর্ণমুদ্রা।

মিরিয়মের প্রাসাদে সম্ভ্রান্ত অতিথি হিসেবে পরিব্রাজক ও বণিক সিমন প্রায়ই আসে। সেখানেও কথায় কথায় গ্যালিলির সেই তরুণ ধর্মপ্রচারকের প্রসঙ্গ ওঠে।

সিমন। গ্যালিলি আর শমরিয়ার গরীব দুঃখী মানুষগুলো কিন্তু দলে দলে জোসুয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ করছে—

কমোডাস আপনাদের ইহুদীদের পীরপয়গম্বর তো পথে-ঘাটে গড়াগড়ি খায় আমি জেনেছি—আপনাদের ওই জোসুয়া না কি ফোসুয়া একটি শূন্যগর্ভ বাচাল—

সায়াফাস জোব্বার ভেতর থেকে উরির লেখা মেষচর্ম বা পার্চমেণ্টে লেখা চিঠি বের করে—শুনুন, জুপিটারের মন্দিরের পুঁথির রক্ষণাবেক্ষণকারী বা পার্চমেণ্টকিপার উরিকে পাঠিয়েছিলেন খবরা খবর করতে। উরি কি লিখেছে শুনুন—"লোকটিকে সন্দেহের কোন কারণ নেই! সে প্রচার করছে, মৃত্যুর পরপরবর্তী এক অবাস্তব জীবনের কথা। পরকাল পাপপুন্য—এসব কথা বলছে বলেই গরীবদুঃখী মূর্খ মানুষেরা ভীড় করে তার কথা শুনছে।

ও-হো-উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল কমোডাস। যে যুবতী কাফ্রী ক্রীতদাসী পাশে দাঁড়িয়ে বড় পাখা দিয়ে বাতাস করছিল, তার জানুদেশে আঁচড়ে দিয়ে চীৎকার করে বলল, গ্যালিলির এই রাব্বিকে সরকার থেকে পুরস্কার দেওয়া উচিত দেখছি, একটু থেমে বলল, পরকাল আর পাপপুণ্যের আফিং খাইয়ে সাধারণ মানুষদের বুঁদ করে রাখলে আমাদের কত সুবিধা—

শুদ্ধ নিশীথরাত্রে অজস্র নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে মিরিয়মের মনে হয় ন্যাজারথের জোসুয়া কি জানে—মৃত্যুর পরপরবর্তী জীবনের রহস্য কেমন দেখতে জোসুয়া? সে-ই কি তার স্বপ্নের সেই রাজপুত্র।

আবার একদিন রাত্রির তৃতীয় প্রহরে দূরে বেথলেহামের দিকে তাকিয়ে নাচ শেষ করল মিরিয়ম। বিনম্রভঙ্গীতে কে জানে, কার উদ্দেশ্যে প্রণতি জানিয়ে ধীর পায়ে এসে তার রত্নখচিত আসনে বসল।

একদিন মানুষের মুক্তির ইঙ্গিত আসবে ওই বেথলেহাম থেকে, সিমন বলল।

এসব কথা শাস্ত্রে লেখা নেই, এক ফ্যারিসী গজ গজ করে।

আমি রোমান, আমরা জানি মাটিতে পা ঠুকে বলল কমোডাস, মানুষকে সুখ শান্তি ঐশ্বর্য এবং মুক্তি বা স্বাধীনতা দিতে পারে একমাত্র রণনিপুণ সশস্ত্র সৈনিক—

স্বাধীনতা আর আত্মার মুক্তি এক কথা নয় সিমন বলল, মাননীয়

কমোডাস, যাদের আত্মা শুদ্ধ এবং মুক্ত, তারাই সৎ লোক। তাদের আত্মাতেই ভগবান থাকেন —

ঠিক বলেছেন সিমনচাচা, মিরিয়মের চোখদুটো দপ করে জ্বলে উঠল, আমি যখন নাচতে থাকি তখন আমি আমার চেতনার ভেতরে, আত্মার ভেতরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করি—

কমোডাস কথা বলল না।

ভারী মাংসল মুখে কুটিল হাসি উঠল। মিরিয়মের বহুমূল্য বর্ণাঢ্য পোষাক, রত্নখচিত কারু শোভায় মনোহার আসন, তার দুইদিকে স্বর্ণনির্মিত ধূপধারে গন্ধধূপের সুবাসিত ধোঁয়ায় আমোদিত বাতাস তার পেলব সুডৌল হাতে পায়ে গলায় স্বর্ণাভরণ সব সব কিছুর দিকে তার ধূর্ত চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, ম্যাগডালা সুন্দরী তুমি যেতোমার ওই লোভনীয় দেহের লচক দেখিয়ে এত অঢেল কামিয়েছো সেটাও যদি তোমার আত্মার ঈশ্বরের নির্দেশে হয় তাহলে বুঝতে তোমার ঈশ্বর বেশ পাক্কা বেনিয়া—বলেই হো হো করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল কমোডাস। হাসির দমকে তার কুঞ্চিত কেশগুচ্ছে নিবদ্ধ রবি, রক্তপ্রবাল, হীরা, নীলবর্ণ প্রস্তর ইত্যাদি আভরণ দোদুল্যমাণ হয়ে ঝিনিঠিনি বেজে যেতে লাগল।

ঘৃণার ধিক্কার জ্বলতে লাগল সিমনের চোখে।

গভীর অনুশোচনায় পাথরের মত ভারি হয়ে উঠল মিরিয়মের মন।

কেন নাচি আর নাচের সময় আমার ভেতরটা যে কি ভাবে ওলোট পালট হয়ে যায় আর নৃত্যের ছন্দে ছন্দে প্রতিটি পদক্ষেপে আমি যে বিশাল, মহৎ আর জ্যোতির্ময় এক সত্বার অস্তিত্ব অনুভব করি—সে-টা কেমন করে আপনাদের বোঝাবো—এসব কথা বলতে চেয়েছিল মিরিয়ম। কিন্তু পারল না। মনের অনেক অনেক নীচে গহন লোকের গূঢ় কথা তো বলে বোঝানো যায় না। তাই চুপ করে থাকল। আর তীক্ষ্ণ ও তীব্র যন্ত্রনায় তার প্রতিমার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানা এঁকে বেঁকে কুমড়ে কুমড়ে উঠতে লাগল।

সেদিন একটা কথাও বলল না সায়াফাস। মিরিয়মের চোখে এক আসন্ন সর্বনাশের ইঙ্গিত দেখতে পেল।

মাসের পর মাস কেটে যায়।

গ্যালিলির পথে প্রান্তরে, দরিদ্র ধীবর পল্লীতে যেখানে যখন যায় ন্যাজারথের জোসুয়া, তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করে উরি। যেমন দেবদূতের মত দেখতে

তেমনি সুন্দর আর মিষ্টি তার কথাবার্তা। কিন্তু বড় অদ্ভুত আর আশ্চর্য তার বাণী—

"যারা দীন, অর্থাৎ গরীব তারাই ধন্য! কারণ স্বর্গরাজ্যে তাদের" প্রতিটি কথা, প্রতিটি শব্দ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবে, খোঁজে-কোথাও কোথাও রাজদ্রোহের গন্ধ আছে কিনা। ওপরের বাণী সম্বন্ধে তার মনে হয়, গরীব ও মূর্খ মানুষদের স্বর্গরাজ্যের লোভ দেখিয়ে নিজের দলে টানার ধান্ধা করছে—

কিন্তু স্বর্গের লোভেই হোক আর যে কোন কারণে-ই হোক, দরিদ্র, ব্রাত্য মানুষ কিন্তু দলে দলে এসে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করছে। দিনে দিনে বেড়েই চলেছে তার অনুগামীর সংখ্যা।—এসব বৃত্তান্ত বিশদ করে লিখে শেষে মন্তব্য করে—এখন পর্যন্ত জোসুয়া রাজদ্রোহকর কিছু বলছে না—মেষচর্মের ওপরে বা পার্চমেন্টের ওপরে এই তথ্য লিখে বার্তাবাহক অর্থাৎ রাণারকে পাঠিয়ে দিল জেরুজ্যালেমে।

কিন্তু যেদিন জোসুয়া জেলে, ছুতার, কামার, মুচি প্রভৃতি দরিদ্র ও ব্রাত্য মানুষদের ছেড়ে সরকারী খাজনা আদায়কারী অথবা ট্যাকস কালেক্টরদের জড়ো করে বাণী দিতে শুরু করল, অমনি উরির বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল—সর্বনাশ—নিশ্চয়ই রোমীয় সরকারের জন্য খাজনা আদায় করতে নিষেধ করছে সেইদিন-ই আর রাণার না পাঠিয়ে নিজেই ছুটল জেরুজ্যালেমে।

জেরুজ্যালেম! যে কোন একটা সূত্রেই সেখানে যেতে মন চায়। সেই সুদূর বাল্যকাল থেকে যে মুখচ্ছবি তার বুকের ভেতরে ক্ষত সৃষ্টি করেছে—দেখবে তার কত গর্ব? কেন তাকে অবহেলা করছে।

সায়াফাসকে সব বৃত্তান্ত বলেই রওনা হল মিরিয়মের বাড়ির দিকে। কেন—কেন সেদিন পুরোহিতদের সর্বাধিনায়ক অ্যানেসের প্রাসাদে নৃত্য করতে করতে হঠাৎ উদ্গত অশ্রু গোপন করতেই অন্ধকার বাগানে চলে গিয়েছিল। কিসের দুঃখ মিরিয়মের? রোমীয় আর ফ্যারিসীদের অমন দামী দামী উপহারগুলো পর্যন্ত নিতে এল না! নিশ্চয়ই—ওই ভবঘুরে বুড়োটা সিমন মাথাটা বিগড়ে দিচ্ছে। কে জানে, হয়তো ওর কানে কানে মন্ত্র দিচ্ছে। ন্যাজারথের অর্দ্ধোন্মাদ যুবকটির সেই প্রলাপ উদ্ধৃত করে—তোমরা যারা ক্ষুধার্ত, তারা ধন্য, কারণ তোমার তৃপ্ত হবে-ই; কিম্বা যারা এখন রোদন করছ, তোমরা ধন্য, কারণ তোমরা হাস্য করিবে—কী আশ্চর্য, এখন যারা খিদের জ্বালায় কান্নাকাটি করছে, তারা পেটভরে খেয়ে পরিতৃপ্তির হাসি হাসবে। খাবার-টা আসবে কোথা থেকে শুনি? একেবারে নির্জলা ধোঁকাবাজী।

সারা দেশের আকাশে বাতাসে বিষ ছড়াচ্ছে ওই পাগলটা। না, যেমন করে হোক ওই বদ্ধ উন্মাদের প্রভাব থেকে, সিমনের চক্রান্ত থেকে, উদ্ধার করতে হবে তার মিরিয়মকে !

যদি জোসুয়ার কোন কথায় দেশদ্রোহীতার আভাস প্রমাণ করতে পারো —তাহলে তোমার অনেক উন্নতি হবে—হয়তো আমার পদটাই একদিন পাবে সায়াফাসের কথাগুলো কানে বাজতে লাগল। সে জুডিয়ার ভাবী প্রধান পুরোহিত। আর মিরিয়ম কমোডাস-সায়াফাসের স্নেহধন্যা অভিজাত নর্তকী। তাদের রাজকীয় শুচিস্নিগ্ধ পরিমণ্ডলের ভেতরে সিমন কি সাধ্য। কোন বাজে উটকো লোককে ঘেসতে দেবে না—একটা বলিষ্ঠ সঙ্কল্প তার মনের ভেতরে স্তম্ভের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো। ভেতরে খবর পাঠিয়ে মিরিয়মের প্রাসাদের সেই প্রাঙ্গণে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগল উরি।

দুপুরের সাঁ সাঁ বাতাস তার কানের কাছে প্রেতিনীর কান্নার মত বেজে যেতে লাগল। রাজাপ্রাসাদের মত সুদৃশ্য বিশাল সেই গৃহ। তার মহার্ঘ আসবাবপত্রে সুসজ্জিত প্রতিটি প্রকোষ্ঠের দিকে তাকিযে তার মনে হল ধাপে ধাপে উঠতে উঠতে সায়াফাসের গদীতে বসতে পারলেই সে-ও এই রকম-ই সুরম্য বাসগৃহ পাবে। তখন সে আর মিরিয়ম দুজনে মিলে তাদের স্বজাতি পরিজন এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদের ম্যাগডালার সেই নড়বড়ে কুঁড়েঘরের অন্ধকার থেকে, অভাব অনটনের কবর থেকে সুস্থ-সুখী জীবনের আলোয় নিয়ে আসবে—

বাতাসে ভেসে এল উগ্র সুগন্ধ।

মিরিয়ম এল। রক্তবর্ণ রেশমের গাউনে আবৃত দীর্ঘ তনু। রক্তাভ আলোর শিখার দিকে নজর পড়তেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠল উরি। আর মাথা নীচু করে অভিবাদন করল। যেন সারা ইস্রায়েলের অধিশ্বরী কোন সম্রাজ্ঞীকে প্রণতি জানাচ্ছে অতি দীন আর নগন্য এক ধীবর।

তুমি তো খুব বেশি দিন জেরুজ্যালেম ছেড়ে ছিলে না, কৌতূহলী চোখে উরির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল মিরিয়ম আমার কাছে তোমার আবার কি এমন জরুরী দরকার পড়ল।'

মিরিয়ম, দেহের সমস্ত রক্ত যেন উরির মুখে এসে জমা হলো। নিশ্বাস বন্ধ করে বলতে লাগল তুমি শুনেছ বোধ হয় সায়াফাস আমাকে খুব পছন্দ করে দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কাজে আমি দেশের বহু জায়গায় ঘুরছি আর শীগগীরই

আমার আরও উন্নতি হবে, আর সেই পদমর্যাদা আশা করি ম্যাগডালার মেরীর অযোগ্য হবে না—

আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারবো না উরি। সায়াফাস এবং কমোডাসের জন্য তোমার যেমন কাজ আছে, তেমনি আমারও আছে অনেক-অনেক কাজ—একটু থেমে দূরে-বহুদূরে ঝাপসা স্তাড়া পাহাড়ের আড়ালে বেথলেহামের দিকে তাকিয়ে নিজের ভেতরে ডুব দিয়ে বলল, আমি তোমার মত নই উরি। তুমি মানসম্মান, পদমর্যাদা রোমীয় এবং ফ্যারিসী কর্তাদের কৃপাদৃষ্টি এসব নিয়ে বেশ মত্ত হয়ে থাকতে পারো—আমি—আমি তা পারি না উরি। আমার পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন—করুণ কথাগুলো ক্রমশঃ কঠিন হতে হতে শেষের দিকে অত্যন্ত কঠোর শোনালো উরির কানে।

মিরিয়মকে তার সিদ্ধান্ত থেকে এক চুল সরানো যাবে না জেনেও মরিয়া হয়ে বলল, ও হ্যাঁ—তোমার একটা খবর ছিল—

কি ?

তোমার মা জেরা তোমাকে শুভেচ্ছা আর আশীর্বাদ জানিয়েছে, একটু হেসে মিরিয়মকে প্রসন্ন করার জন্যই বলল, আমি ম্যাগডালায় গিয়েছিলাম কি না, তোমার মা-র সঙ্গে দেখা হল—

ও মা—তাই না কি ! মিরিয়মের চোখদুটো আগ্রহে প্রদীপের মত জ্বলে উঠল। উরির কাছে এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল, মা কি তোমার সঙ্গে কথা বলেছে—

নিশ্চয়ই ! চোখদুটো নামিয়ে বলল উরি, বলবেন আর কি সেই এক কথা মিরিয়ম যে কি করছে—কেন—তোমাকে বিয়ে করছে না।

কখনো না—দপ করে জ্বলে উঠল মিরিয়ম। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, আমার মা তোমাকে একথা বলতেই পারে না—কেন মিছে কথা বলছো উরি ?

মিছে কথা বলে ধরা পড়ে যাওয়া বাচ্চা ছেলের মত অবস্থা হল উরির। আশ্চর্য ! আবার প্রত্যাখানেও ক্রোধে জ্বলে উঠল না। হেসে বলল, আমি এখন যাই মিরিয়ম, আকাশের নক্ষত্রের মত সুদূর সেই বাল্যসখীর দিকে তাকিয়ে বন্ধু বিদায়ের হাসি হাসল। অস্ফুটস্বরে বলল, আমি আবার আসবো —না এসে পারবো না—

প্রাঙ্গনের শেষপ্রান্তে যখন চলে গিয়েছে উরি, হঠাৎ ছুটে এল মিরিয়ম।

তুমি তো গ্যালিলিতে গিয়েছিলে—জোসুয়াকে দেখেছো—কিশোরী মেয়ের মত কলকল করে বলল মিরিয়ম, কেমন দেখতে—কি রকম করে কথা বলে—

সর্বনাশ—তার কথা মুখেও এনো না মিরিয়ম। পরম আদরে মিরিয়মের নরম হাতটা নিজের হাতের ভেতরে নিয়ে বলল, লোকটা স্রেফ স্বপ্নবিলাসী। অবাস্তব আর অসম্ভব কতগুলো কথা বলে, হঠাৎ থেমে যায় সে। চারদিকে চোখ বুলিয়ে চাপা গলায় আবার বলে, জানো—সে-সব কথাবার্তার ভেতরে রোমীয় আর ফ্যারিসীদের বিরুদ্ধে মন্দির ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আভাসও পাওয়া যাচ্ছে একটু থামল উরি। মিরিয়মের সেই রক্ত-পদ্মের পাঁপড়ির মত ডান করতলটি আরও ঘন—আরও শক্ত করে ধরে বলল, শোনো মিরিয়ম, যে যাই বলুক—যে খুব শীগগীর-ই দেশের শত্রু, রোমীয়দের শত্রু বলে প্রমাণিত হবে, তার পথ অনুসরণ করে কি তার ভক্ত হয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনো না—শেষের দিকের কথাগুলোর ভেতরে ব্যাকুল মিনতি ফুটে উঠল।

অন্তত জোসুয়ার সূত্রেই মিরিয়ম অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, আরও হবে। হতেই হবে মনে করে আনন্দে ডগোমগো হয়ে চলে গেল উরি।

প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে রইল মিরিয়ম। তার মনে হলো উরি ভুল পথে চলেছে। গ্যালিলির সেই নবীন সন্ন্যাসীকে সে কখনো দেখে নি, শোনে নি তার বাণী। তবু কেন যেন তার মনে হয়—মনে হয়—যারা তার কথা শুনছে তারা সংসারের শোক দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়, সিমন চাচা যেমন বলে, আত্মার মুক্তি। হয়তো ঠিক তার নাচের সময় যেমন হয়—তেমনি হয়তো তাদের নিজেদের চেতনার ভেতরে সমস্ত সত্তার ভেতরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করতে চায়—

ইতিমধ্যে সারা জেরুজ্যালেম মুখর হয়ে উঠল মহামান্য এক বিদেশী অতিথির আগমনের শুভসংবাদে—

মিরো! মেসোপটেমিয়ার রাজকুমার মিরো আসছে!

রাজকুমারের এই পরিদর্শনের আড়ালে আছে এক প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য—

সিরিয়া, ইস্রায়েল থেকে শুরু করে প্রায় সমগ্র আরব ও ভূমধ্যসাগরের সন্নিহিত দেশগুলোতে চলছে রোমীয় শাসন। টাইগ্রীস আর ইউফ্রেতিস নদীর মধ্যবর্তী জনপদ মেসোপটেমিয়া আর কি করে তাদের জগজ্জয়ী প্রভাবের বাইরে থাকবে? মেসোপটেমিয়ার বৃদ্ধ নৃপতি বহুদর্শী। তার মনে হয়েছিল

যে কোন দিন অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে রোমীয়রা আর নিরীহ প্রজাদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে চলে যাবে। বাধা দিলেই সূত্রপাত হবে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের! তাই—

আগেই পুত্রকে পাঠিয়েছে রোমীয়দের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এই সৌহার্দ্য ভ্রমণে!

পবিত্র নগরী জেরুজ্যালেমের দিকে দিকে বাতাসে রাষ্ট্র হয়ে গেল আর একটি বোমাঞ্চকর খবর—জেরুজ্যালেমের রোমীয় প্রকিউরেটার বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা পন্তিযাস পাইলেত, কম্যাণ্ডাব কমোডাস এমন কি রোমের সম্রাট তাইবেরিয়াসের জন্যও চারটে বড় বড় পেটিকা ভর্তি করে এনেছে রাশি রাশি সোনা ও রূপোর তাল—মেসোপটেমিয়ার নৃপতিব উপঢৌকন।

মেসোপটেমিয়া সমৃদ্ধিশালী দেশ। প্রতাপপ্রতিপত্তি আছে রাজার। অতএব রোম থেকে পন্তিয়াস পাইলেতের কাছে গোপনে নির্দেশ আসে, বিদেশী অতিথির আদর আপ্যায়নেব যেন কোন ত্রুটি না হয়—

সাজ সাজ রব পড়ে গেল সারা শহরে। পন্তিয়াসের নির্দেশে রাজপুত্রের সম্মানে এক বিশাল বর্ণাঢ্য সভার আয়োজন হল। স্থান নির্দিষ্ট হল—জেরুজ্যালেমের অদূরে অ্যাম্ফিথিয়েটার। শত শত ক্রীতদাস অ্যাম্ফিথিয়েটার দিন রাত ঝাড়পোছ করে পরিষ্কাব ঝকঝকে করে তুলল। রোম থেকে এল কুস্তিগীর। দৌড়ের ঘোড়া এল মিশর থেকে। আর জর্ডন থেকে নিয়ে আসা হল উদগ্র যৌবনবতী নর্তকী।

*

ওদিকে গভীর রাতের অন্ধকারে মাউন্ট অলিভের জঙ্গলাকীর্ণ গুহায় জিয়ালটদের ডেরায় জ্বলে উঠল মশালের আলো। তাদের গোপন বৈঠকে ঠিক হল—রাজকুমারের অবস্থানের তৃতীয় দিনে মদ্যব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে একজন যাবে শিবিরে। সেই উত্তেজক সুরা খেয়ে মেসোপটেমিয়ার এবং রোমীয় সশস্ত্র প্রহরীরা যেই অচেতন হয়ে পড়বে—অমনি—উত্তরের পাহাড় থেকে ছদ্মবেশী অন্ধ সাব্বার সঙ্গী সেই বালক শিষ দিয়ে সঙ্কেত দেবে—আর তারপরেই—

গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পেয়ে জিয়ালটদের বিশিষ্ট কর্মী অ্যাকেরিয়ার একমাত্র সন্তান, সেই বারো বছরের ছেলেটির মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

রাজকুমার ফিরো আসছে।

মিরিয়মের প্রাসাদের সম্ভ্রান্ত অতিথিদের ভেতরেও গুঞ্জন ওঠে। তারা মেসোপটেমিয়ার প্রজানুরঞ্জন নৃপতির বিদ্যা ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ আর তার অপর্যাপ্ত সম্পদের আলোচনায় সরব হয়ে ওঠে—

শুনছো মিরিয়ম, মিরিয়মের কানে কানে বলে বাগা, কি বলছেন এরা! এই রাজকুমার আমার মনে হয়, তোমার মা যাকে স্বপ্ন দেখেছিলেন—ইনি সেই রাজপুত্র। ব্যথার ছায়া ফুটে ওঠে তার চোখে। ভার ভার গলায় বলে, তুমি এইবার সত্যি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে—

যা—কি যে বলিস বাগা—

না-না-আমিও শুনেছি। ইলা বলল, মিরোর শুধু যে প্রচুর ঐশ্বর্য আছে তা নয়—যেমন গভীর জ্ঞান বুদ্ধি তেমনি দেখতে নাকি একেবারে দেবদূতের মত। কালো কুচকুচে কোঁকড়ানো দাড়ি। আর তার প্রতিটি গুচ্ছে দুলছে পদ্মরাগমণি একটু থেমে আবার নিজের মনের ভেতরে ডুব দিয়ে বলল, ইনি তোমার সেই রাজপুত্র না হয়েই পারে না—

কোন কথা বলল না মিরিয়ম।

দূর দেশের তরুণ রূপবান রাজপুত্র তাকে বিপুল সমারোহে বিয়ে করে নিয়ে যাবে—এমন একটা ঘটনা-তে সে আর সকলের মত খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারছে না কেন—কেন তার মন আলোড়িত হয়ে উঠছে না! ধনে জনে সমৃদ্ধ একটি দেশের ভাবী সম্রাজ্ঞী—অনাগত আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কোন কিছুই তার চেতনার ভেতরে এতটুকু সাড়া জাগাতে পারছে না। তার মনের অন্ধকারে গহনলোকে দাঁড়িয়ে কে যেন বলছে, রাজকীয় সমারোহ, অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্য—এসব

পন্তিয়াস পাইলেতের রাণার এল। মিরিয়মকে রাজকুমারের সম্বর্দ্ধনা সভায় নৃত্যের জন্য আমন্ত্রণ জানালো। উল্লসিত হয়ে উঠল নিভা। বাগা আর ইলা দুই সখী সুগন্ধী প্রসাধনের প্রলেপে মিরিয়মের অপরিসীম রূপ-রাশিকে আরও অনির্বচনীয় করে তুলল। ইলা বলল, রাজকুমার দেখবে ঈশ্বর এই মাটির পৃথিবীর রমণীকে তাঁর রূপের ঐশ্বর্য কেমন উজাড় করে দিয়েছেন।

মিরো এল। সেদিন পবিত্র নগরীর আকাশে জমেছে থরে থরে কালো মেঘ। ইলা, আর বাগা পালকিতে করে মিরিয়মকে নিয়ে যাত্রা করল অ্যাম্ফিথিয়েটারের উদ্দেশ্যে। যেতে যেতে একটি কথা বলল না মিরিয়ম। বিষণ্ণ আর গম্ভীর হয়ে, কে জানে, কিসের চিন্তার ভেতরে মগ্ন হয়ে রইল।

সাঁ সাঁ করে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা আছড়ে পড়ল মিরিয়মের নাকে মুখে শির শির করে উঠল তার শরীরের ভেতরটা।

আলোকোজ্জ্বল অ্যাম্ফিথিয়েটারে সারা জেরুজ্যালেম যেন ভেঙে পড়েছে। সুসজ্জিত মঞ্চে সারি সারি বসে রয়েছেন সম্ভ্রান্ত মহামান্য রোমীয় নোবেলরা। তাদেব মাঝখানে সভা আলো করে বসে আছে সেই রাজকুমার মিরো। ঠিক তাব দুই দিকে দুই প্রবল প্রতাপশালী রোমীয় রাজপুরুষ—পন্তিয়াস পাইলেত আর কমোডাস। তাব ঠিক দুই সারি পবে যথেষ্ট ব্যবধান বজায় রেখে বসেছে পুরোহিতপ্রধান সায়াফাস, জুডিয়ার বিভিন্ন মন্দিরের আমন্ত্রিত পুরোহিতবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ফ্যারিসীরা।

বেজে উঠল বিউগিল, বেজে উঠল ড্রাম। শুরু হল বর্ণাঢ্য সামরিক পোশাকে সুসজ্জিত তিনশত সৈন্যের কুচকাওয়াজ। তার পরেই পন্তিয়াসের নির্দেশে ধীর পায়ে মঞ্চে এল মিরিয়ম! দুরু দুরু কেঁপে উঠল তার বুক। শহবের ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে এত বড় বিশাল জনসমাবেশে সে এই প্রথম নৃত্য প্রদর্শন কবতে এসেছে। হঠাৎ দেখল রাজপুত্রের বড বড় কালো দুটো চোখেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন তার দেহে সূঁচের মত বিঁধছে। কেমন আচ্ছন্নের মত তার উদ্ধত বক্ষোসম্ভারের নগ্ন সৌন্দর্যকে আড়াল করার জন্যই রক্তবর্ণ রেশমের কাঁচুলির ওপবে আংগিয়াটা একটু টেনে দিল। জেরুজ্যালেমের নগরশোভনা রূপসী নর্তকী সেই প্রথম পুরুষের দৃষ্টির সম্মুখে সঙ্কুচিত হয়ে গেল আর বিচিত্র এক লজ্জার শিহরণে কেমন অবশ হয়ে গেল তার চেতনা।

ইলাব বাঁশীতে জাগল সুরের মূর্চ্ছনা। বাগার মৃদঙ্গের ধ্বনিতে ফুটল নৃত্যের বোল।

নাচতে শুরু করল মিরিয়ম। কিন্তু কেমন যেন প্রাণহীন তার নাচ। গ্রীক নৃত্যশিক্ষক ডিমিট্রিয়াস যেমন শিখিয়েছিল তেমনি চোখ খুলে আর বাজনার তালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচতে চেষ্টা করল। কিন্তু এলোপাথাড়ি পড়তে লাগল পদক্ষেপ।

কি করছো—মিরিয়ম, চাপা গলায় ফিসফিস করে বলল বাগা, চোখ বন্ধ করে তোমার সেই নাচ—নাচো—তোমার সেই নাচ—

চোখ দুটো বুজল মিরিয়ম। তীব্র হয়ে উঠল বাঁশীর সুর আর মৃদঙ্গের ধ্বনিতে জাগল উদ্দামতা। মিরিয়মের দেহের শিরায় শিরায় যেন তরঙ্গায়িত

হয়ে গেল বিদ্যুৎপ্রবাহ। বিপুল বেগে চক্রাকারে পাক খেয়ে খেয়ে নাচতে শুরু করল সে তার রক্তে যেন জেগে উঠল গ্যালিলির সমুদ্রের সেই আদিমতা। সেই দিগন্তবিসারী বালুচর, সাগরের বিশাল জলরাশির ভেতরে ঈশ্বরের অপার মহিমার সেই পবিত্র আর মহৎ অনুভূতিতে আবিষ্ট হয়ে গেল বিচিত্র নর্তকীর মন। আর তার নিজের ওপরে কোন বশ রইল না। তার লীলায়িত পেশীপুঞ্জে মোমের মত মসৃন দুটো বাহুর বিক্ষেপে বিচিত্র এক একটা বিভ্রমের মুদ্রা এঁকে নৃত্য করে চলল সে। দেখে মনে হল যেন একটি সুখ-স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্নের মত হয়ে নাচছে সে। কিন্তু—

তার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত সেই বিচিত্র নৃত্যের স্বর্গীয় সুষমা উপলব্ধি করতে পারল না মেসোপটেমিয়ার রাজকুমার। সে দেখল, স্ফটিকের মত স্বচ্ছ 'শবনম' (শিশির) মসলিনের ঘাঘরার আড়ালে নৃত্যের ছন্দে আন্দোলিত দুইটি সুপুষ্ট জঙ্ঘার ছায়াভাস, দেখল বিশাল ও কঠিন শিলাতটের মত তার গুরুনিতম্বের হিল্লোল। তার রক্তের ভেতরে জ্বলে উঠল কামনার লেলিহান আগুন।

প্রবল করতালি আর সমবেত দর্শকদের উচ্ছ্বসিত হর্ষধ্বনির ভেতরে যেই নাচ শেষ হল অমনি মিরো তার কাছে যেতে ইঙ্গিত করল নর্তকীকে। মিরিয়ম কেমন আচ্ছন্নের মত তার সামনে এল। মিরো তার মাথার চুলে নিজের হাতে লাগিয়ে দিল একটি রুবি বা পদ্মরাগমণি। আবার হাততালির ঝড়ে ভেঙ্গে পড়ল প্রেক্ষাগৃহ।

তারপর যা অনিবার্য তাই হল।

পন্তিয়াসের রাণার এসে জানালো—রাজকুমার মিরোর ভুরসানা মঞ্জিলে গিয়ে একান্ত করে তাকে-ই নাচ দেখাতে হবে।

নিভার বুকের ভেতরটা গুর গুর করে উঠল। এইবার—এইবার তার মিরিয়ম রাণী হবে! বিষণ্ণতা থমথম করতে লাগল বাগা আর ইলার মুখে।

সেদিন সন্ধ্যা থেকেই টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। মিরিয়ম তিন সখীকে নিয়ে এল মোরিয়া পাহাড়ে রাজকুমারের শিবিরে।

তোমার সঙ্গিনীদের বাইরে অপেক্ষা করতে বলো সুন্দরী, বলল মিরো।

ওরা তিনজন বাইরে চলে গেল।

রত্নখচিত সেই ভুরসানা মঞ্জিলের নির্জন প্রকোষ্ঠে একটি প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল মিরিয়ম। রাজপুত্র ধীর পায়ে তার কাছে এল। আরেক

মুহূর্ত মিরিয়মের সেই তুষারের মত শুভ্র দীর্ঘতনুর অপরিসীম রূপসুধা যেন আকণ্ঠ পান করল। ফিস ফিস করে বলল, তুমি—তুমি আমার দেশে যাবে সুন্দরী—তাল তাল সোনা, মণিমুক্তা, বলতে বলতেই মরুসন্তানের রক্তে জেগে উঠল আদিমতা। টান দিয়ে সরিয়ে দিল প্রায় স্বচ্ছ দোপাট্টার আবরণ। উন্মাদের মত ফর ফর করে ছিঁড়ে ফেলল ভেলভেটের আংগিয়া। খুলে ফেলল কাঁচুলী। আর সম্পূর্ণ নিরাবরণ দুইটি দৃঢ় কঠিন, পরিপুষ্ট বর্তুলাকার স্তনের মাঝখানে শ্বেতশুভ্র মসৃণ উপত্যকায় মুখ চেপে ধরে পশুর মত উল্লাসে গর গর করতে লাগল। কিন্তু সমস্ত শক্তি দিয়ে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও যখন মিরো তার বুক নদী হয়ে মিশে যেতে চাইল ঠিক তখুনি—নিভে গেল হাজার ঝাড় বাতির আলো।

আ—উ—হঠাৎ তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় মর্মান্তিক আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল রাজকুমার মিরো। অন্ধকার নেপথ্য থেকে একটা বর্শা এসে বিঁধে গিয়েছে তার পিঠে! ফিনকি দিয়ে পড়া তাজা রক্তের দিকে তাকিয়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল মিরিয়ম। আর রক্তের নদীর ভেতরে পড়ে রইল রাজকুমারের প্রাণহীন দেহ।

মোরিয়া পাহাড়ের উত্তরের জঙ্গল থেকে তীক্ষ্ণ একটা শিষের শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে কতগুলো ছায়ামূর্তি এসে মিরোর সেই সোনার আর রূপোর তালে ভরা বড় বড় বাক্সগুলো নিয়ে অন্ধকারে উধাও হয়ে গেল। আর—

রাজকুমারের দেহরক্ষী এবং সশস্ত্র রোমীয় প্রহরীরা?

সেই দিন-ই বিকেলে এক বৃদ্ধ ইহুদী সুরা বিক্রেতা চামড়ার থলিতে করে জুডিয়ার উৎকৃষ্ট সুগন্ধী সিরাজী বিক্রি করতে এসেছিল। আর বিক্রিও করেছিল অতি সুলভে। সেই সুরার ভেতরে কি ছিল, কে জানে—তাই খেয়ে প্রহরীরা নেশার ঘোরে অচেতন হয়ে পড়ে ছিল সেই দুর্ঘটনার রাত্রে।

পবিত্র নগরীর আকাশে আবির ছিটিয়ে সূর্য উঠল।

মিরিয়ম চোখ মেলেই দেখল, সে তার প্রাসাদের কক্ষে সেই পীতবর্ণ রেশমের বস্ত্রাবরণে আবৃত নরম শয্যাতেই আছে। আর তার চারদিকে তিন রমণীর উৎকণ্ঠিত মুখ।

পিসী, জিয়ালটদের ওপরে প্রচণ্ড অত্যাচার করবেরোমীয়রা, আতঙ্কিত হয়ে উঠে বসল মিরিয়ম, বলল, তুমি আমার কোষাগার থেকে চারটি বাক্স বোঝাই করে সোনাদানা গয়না নিয়ে এখুনি চলে যাও—ওদের পরিবারদের দেবে—

চারজন সুবিয়াকে নিয়ে নিভা রওনা হবে, এমন সময়—

শোন—পিসী, তার কানে কানে ফিস ফিস করে বলল, দেখবে তো লক্ষ্য করে চৌরাস্তার মোড়ে সাব্বাকে ঘুরতে দেখা যায় কিনা—

নিভা যেই বেরিয়ে গেল, অমনি মিরিয়মের প্রাসাদের সম্মুখে কোন রাজপুরুষের উপস্থিতির আভাস জানিয়ে শিঙা বেজে উঠল। জুতো মসমসিয়ে এল কমোডাস। মিরিয়মের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, মিরিয়ম তুমি কাল রাত্রে মিরোর তাঁবুতে ছিলে—বলো—কে—খুন করেছে তাকে?

কোন কথা বলল না মিরিয়ম। তার মনের অন্ধকারে সাব্বা-ভাইয়ের এবড়ো খেবড়ো মুখখানা জ্বলজ্বল করে উঠল। তার স্বজাতি ইহুদী সাব্বা এবং অন্যান্য জিয়ালটরা রোমীয়দের বন্ধু ওই ধনী বিলাসী কামুক পশুটাকে খুন করেছে বলে গর্বে আর আনন্দে ভরে উঠল তার মন—

চুপ করে আছো কেন মিরিয়ম, তুমি জানো—রোমীয় সাম্রাজ্যের সম্মান প্রতিপত্তি সব-সব নষ্ট হতে চলেছে—উত্তেজনায় ভেঙে পড়ল সেনানায়ক।

উঠে দাঁড়ালো মিরিয়ম। কয়েক পা এগিয়ে এসে কমোডাসের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—আমি—আমিই খুন করেছি মাননীয় কমোডাস—

সারা জেরুস্যালেম জুড়ে ইহুদীদের ওপর শুরু হল মর্মান্তিক অত্যাচার। হত্যাকারীদের সন্ধানের নামে রোমীয় সৈন্যরা তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতে লাগল।

এসব কথা কানে এল মিরিয়মের। আর তীব্র একটা অস্বস্তির পীড়নে জ্বলে যেতে লাগল তার মাথার ভেতরটা। ধূর্ত কমোডাস তার কথা বিশ্বাস করে নি। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল সে তার স্বজাতিদের বাঁচাতে চেষ্টা করছে। হঠাৎ নিদারুণ একটা হীনমন্যতায় আর অনুশোচনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার মন—তারই শোনিত সম্পর্কের মানুষেরা প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে রোমীয়দের বিরুদ্ধে লড়াইতে নেমেছে আর সে ওই রোমীয় এবং তাদের অনুগ্রহপুষ্ট ফ্যারিসীদের সুখসহচরী হয়ে অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্যের পাহাড়ে বসে আছে—তাল তাল কাদার মত ঘৃণার ধিক্কার জমে উঠল মনে। আর অসহ্য একটা যন্ত্রণায় তার চোখ ফেটে জল এসে পড়ল।

"আজ সূর্যাস্তের ভেতরে যদি হত্যাকারীরা ধরা না পড়ে, পুণ্যনগরীর পথে পথে জানিয়ে দেওয়া হল পন্তিয়াস পাইলেতের রাজকীয় ঘোষণা" তাহলে

জেরুজ্যালেমের ইহুদীদের সব মন্দিরের যাবতীয় সম্পত্তি ক্রোক করা হবে আর বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ফ্যারিসীদের ফাঁসী দেওয়া হবে—

পুরোহিতপ্রধান এবং ফ্যারিসী নেতা সায়াফাসের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। কমোডাসও তাকে শাসিয়ে দিয়ে বলল, আপনি এবং পুরোহিতদের সর্বাধিনায়ক অ্যানন্সের ওপরে দেশের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার ভার দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম, একটু থেমে সায়াফাসের রেখাজটিল মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে চাপা গলায় আবার বলল, বুঝতেই তো পারছেন, হত্যাকারীরা জিয়ালটদের দলের লোক এবং তারা আপনার স্বজাতি। অতএব ধনেপ্রাণে যদি ধ্বংস হতে না চান—

সায়াফাসের মনের ভেতরে ভেসে উঠল, সাব্বার মুখখানা! নিশ্চয়ই মিরিয়ম জানে, জিয়ালটদের নেতা ওই কানা বুড়োটার গতিবিধি।

রোমীয়দের পদলেহনকারী পুরোহিত প্রধানকে দেখেই ঘৃণায় মুখ বিকৃত হয়ে উঠল মিরিয়মের। গভীর বিষাদের একটা শিলাস্তূপের মত সে সামনে এসে দাঁড়াল। একটি কথা বলল না। বাগা আর ইলা টুঁ শব্দ-টি পর্যন্ত করল না।

ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে উরিকে ডেকে পাঠালো। মন্দিরের বিশজন সশস্ত্র প্রহরী তার সঙ্গে দিয়ে তার কানে কানে ফিস ফিস করে বলল কতগুলো কথা!

উরির গোল মুখে হাসির আভাস ফুটে উঠল। দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। শুদ্ধ দ্বিপ্রহরের জনহীন পথে পথে কালান্তকের মত ঘুরতে লাগল সে।

না, কোথায় চৌরাস্তার মোড়ে তো কোন অন্ধ বৃদ্ধকে বালকের হাত ধরে ঘুরতে দেখা যাচ্ছে না। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ নজরে পড়ল গোয়ালাদের বস্তির সামনে ঘুর ঘুর করছে সেই ছেলেটি। সায়াফাসের অনুচর, যুবক পুরোহিতকে দেখেই পালাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সাদা পোশাক-পরা সৈন্যরা চারিদিক থেকে ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলল।

মন্দিরের চত্বরের নীচে ভূগর্ভের অন্ধকার কারাগারে বন্দী করে রাখা হল বারো বছরের সেই ছেলেটিকে। জিয়ালটদের বিশিষ্ট কর্মী জ্যাকেরিয়ার একমাত্র সন্তান!

সায়াফাসের মুখে সাপের জিভের মত চিক চিক করে উঠল ধূর্ত হাসি! কান টানলেই মাথা আসবে!

বিকেলে-ই জ্যাকেরিয়া এসে সায়াফাসের পায়ে উপুড় হয়ে পড়ল। বলল, আমার ছেলে কিছু করে নি—ওকে ছেড়ে দিন—

নিশ্চয়ই দেব, কিন্তু—

সায়াফাস বলল তার সর্ত !

বেজে উঠল বিউগিল, বেজে উঠল ড্রাম।

রোমীয় সৈন্যরা রাস্তায় বর্ণাঢ্য এক বিজয়-মিছিল করে জানিয়ে দিল মিরোর হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আর রাজকুমারের শিবির থেকে অপহৃত দুই সিন্দুক বোঝাই ধনরত্নও পাওয়া গিয়েছে—

কমোডাসের কোষাগারে জমা দেওয়া হল সোনার তাল ও স্বর্ণমুদ্রায় ভরা দুইটি সিন্দুক। কল্পনাও করতে পারল না কমোডাস—সেসব ইহুদীদের প্রধান মন্দিরের সঞ্চিত ঐশ্বর্য !

পশ্চিমের আকাশে সূর্য অস্ত গেল। প্রকাশ্য রাস্তায় ক্রুশের কাঁটায় বিদ্ধ করা হলো জ্যাকেরিয়াকে। অসহ্য বেদনা তিলে তিলে সহ্য করে জিয়ালট তথা জেরুজ্যালেমের সাধারণ দরিদ্র ইহুদীদের অব্যাহতি দিয়ে গেল রোমীয়দের নৃশংস অত্যাচার থেকে।

গভীর শোকের মত রাত্রি নামল পবিত্র নগরীতে।

সাধারণ দুর্বৃত্তের মত ক্রুশবিদ্ধ করা হলেও জনসাধারণ জানে, জ্যাকেরিয়া জিয়ালট। সে বিপ্লবী। বীরের মত শহীদের মৃত্যু বরণ করেছে। বন্ধ হয়ে গেল দোকান-পাট। আলো ঝলমলে পুণ্যনগরী অভিশপ্ত অন্ধকারে খাঁ খাঁ করতে লাগল।

নির্জন প্রকোষ্ঠে অস্থির পায়ে পায়চারী করছে মিরিয়ম। সাপের মত খল আর হিংস্র এই ফ্যারিসী ও রোমীয়দের পুঞ্জীভূত এই পাপের শহর থেকে যদি এই মুহূর্তে দূরে-বহুদূরে কোথাও চলে যেতে পারতো! তীব্র যন্ত্রণা-ই যেন কণা কণা জল হয়ে গড়িয়ে পড়ল তার দুই গাল বেয়ে।

হঠাৎ নিভা-কে ডেকে তার হাতে এক ঝুড়ি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মত বলল, পিসী যাও জ্যাকেরিয়ার ছেলে-কে খুঁজে বের করে এটা ওর হাতে দেবে—

নিভা চলে গেল। ভারী পাথরের মত ব্যথার ভার যেন একটু হাল্কা মনে হল মিরিয়মের। বাগা-কে বাইরে পাঠিয়েছিল। ফিরে এসে বলল, জিয়ালটরা শহর ছেড়ে চলে গিয়েছে—একটু থেমে বলল, শুনলাম, সাব্বা না কি সীমান্তের রোমীয় প্রহরীকে ঘুষ দিয়ে জুডিয়ার সীমানা ছাড়িয়ে চলে গিয়েছে গ্যালিলির দিকে—

গ্যালিলি! বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল মিরিয়মের।

সাব্বা-ভাই—তোমার কথা রাখতে পারলাম না—নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। গ্লানির অপচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল মন। দুঃস্বপ্নের ঘোরে যেন বিড় বিড় করে বলল, আমি এখনও রোমীয়দের বিলাসের সহচরী হয়ে-ই আছি—শয্যায় শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল সে। কেঁদে কেঁদে-ই বেদনার ভার লাঘব হতেই তন্দ্রা এল। তন্দ্রাচ্ছন্ন চেতনার ভেতরে যেন অস্পষ্ট কুয়াশার মত ফুটে উঠল, মেসোপটেমিয়ার রাজকুমারের ভারী মাংসল মুখখানা—কিন্তু সেই কামুক পশুর কুৎসিত মুখ, মা-ভাইবোনদের হাড় বের করা শুকনো সারি সারি মুখ মিলেমিশে একাকার হয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল একটি প্রদীপ্ত মুখাবয়ব। এলোমেলো সোনালী চুল। বড় বড় দুটো নীল চোখে স্নিগ্ধ প্রশান্ত দৃষ্টি তার।—রাজপুত্র!

মুক্তার মত দুফোঁটা অশ্রুর বিন্দু চিক চিক করতে লাগল তার গালে।

ঘুম ভেঙে গেল।

রাতের আকাশে জ্বলছে রাশি রাশি তারা। দূর অন্ধকার দিগন্তে বেথলেহামের দিকে চোখ দুটো ছড়িয়ে দিতেই তীব্র আবেগে কাঁপতে লাগল ঠোঁট দুটো! যেন নিঃশব্দে আকুল প্রার্থনা জানিয়ে বলল, হে ঈশ্বর বলে দাও আমি এখন কি করবো—তার মনে হল এই মুহূর্তে যদি তার চেয়ে অনেক—অনেক বড় আর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের একটি মানুষকে কাছে পেত, তাহলে তার সঙ্গে কথা বলে শান্তি পেতো—এসব ভাবতে ভাবতেই—

সিমন এল।

তাকে দেখে অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ল জেরুজ্যালেমের নগরশোভনা রূপসী নর্তকী। কান্নায় জড়ানো অস্পষ্ট গলায় বলল, আমাকে-আমাকে দেশে নিয়ে চলুন—সিমন চাচা—ওই রোমীয় আর ফ্যারিসীদের আনন্দের জন্য আমি আর নাচবো না—নাচতে পারবো না—একটু থেমে আবার নিজের মনেই অস্ফুটস্বরে বলল, ওরা এক একজন দেশের জন্য জাতির জন্য প্রাণ দিচ্ছে—

কোন কথা বলল না সিমন। কেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মিরিয়মের দিকে।

আমার কি স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু থাকতে পারে না সিমন চাচা, জলভরা দুটো চোখের তীক্ষ্ণ তীরের মত দৃষ্টিতে সিমনকে বিদ্ধ করে কেমন উদ্‌ভ্রান্ত আর উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, সোনা দানা, গয়না—বিলাসীতা আর ঐশ্বর্যে আমার দরকার নেই—আমি—আমি ম্যাগডালার জেলে—ডেভিডের মেয়ে—সিমন চাচা—

তার কান্না থরো থরো মূর্তির দিকে তাকিয়ে সিমনের চোখদুটো জলে ভরে এল। পরমস্নেহে তাকে বুকে টেনে নিয়ে বলল, আমি কাল গ্যালিলিতে যাচ্ছি—আর সে-কথা বলতেই—

আমি—আমি তোমার সঙ্গে দেশে ফিরে যাবো সিমন চাচা, কান্না-টান্না কোথায় উড়ে গিয়েছে। মত্ত উল্লাসে চঞ্চলা কিশোরীর মত ডগোমগো হয়ে ছুটে গেল নিভার কাছে। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, পিসী—আমি কাল-ই গ্যালিলিতে চলে যাচ্ছি, একটু থেমে আবার বলল, মা—আমার মা-র জন্ম নিয়ে যাবো স্বর্ণমুদ্রা, সোনার অলঙ্কার—এমন করে মা-কে সাজিয়ে দেব—যা কখনো কেউ কল্পনাও করে নি—

গুটি গুটি এসে দাঁড়াল বাগা আর ইলা।

বিষণ্ণ। শোকম্লান তাদের মুখাবয়ব।

ডিং-ডং-ডিং-ডং—

জুডিয়ার পাহাড়ের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সিমনের কাফিলা চলেছে গ্যালিলির দিকে। কাফিলার মাঝখানে একটা সুদৃশ্য পালকিতে যাচ্ছে মিরিয়ম।

এমাউসে আসতেই ঝাঁপিয়ে নেমে এল সন্ধ্যার অন্ধকার। সিমনের নির্দেশে এখানে থামল কাফিলা। এমাউসে থেকে বেথসিয়মের গিরিপথে বন্যজন্তু আর রাহাজানির ভয় খুব বেশি।

দূর অন্ধকার দিগন্তে জুডিয়ার পাহাড়ের আড়ালে জেরুজ্যালেমের দিকে তাকিয়ে ছাড়া ছাড়া গলায় বলল মিরিয়ম, জানো-সিমন চাচা, ওই শহরে আমি ছিলাম রাণীর মত। রোমীয়রা আমার পায়ে উজাড় করে দিত অঢেল সম্পদ, তবু কেন সুখী হই নি—হতে পারি নি—

ঐশ্বর্য কখনো মানুষকে সুখী করতে পারে না মিরিয়ম, আস্তে আস্তে বলল সিমন। কয়েক মুহূর্ত অন্ধকার রাত্রির আকাশে রাশি রাশি তারার দিকে তাকিয়ে আবার খুব মৃদু গলায় বলল, জানো মিরিয়ম, ওই যে রূপোর চুমকির মত অজস্র তারা দেখছো—ওগুলো কিন্তু প্রত্যেকে এক একটা নক্ষত্র; যেমন বিশাল তেমনি জ্যোতির্ময়, একটু থামল সিমন। কেমন প্রদীপ্ত হয়ে উঠল তার মুখখানা। আবার বলল, ওই নক্ষত্রের আড়ালে আছেন মঙ্গলময় ঈশ্বর। তোমাব চেতনার ভেতরে যদি সেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব—

ঠিক বলেছো সিমন চাচা, বিদ্যুতের মত ঝকমক করে উঠল তার চোখমুখ। নিজের মনের ভেতরে ডুব দিয়ে আবার বলল, আমার নাচের সময়টা যে কি হয়—আমি যেন আমার সমস্ত সত্বার ভেতরে এক বিরাট জ্যোতির্ময় পুরুষকে স্পষ্ট দেখতে পাই আর আশ্চর্য একটা সুখে ভরে ওঠে মন—

দিনের পর দিন কাটে। কাফিলা চলে। তারা ছাড়িয়ে যায় বেথসিয়াম, পার হয়ে যায় ক্যানা নদী। সিমন হেঁকে বলে, এইবার আমরা পেঁছাবো ন্যাজারথে।

দুলে উঠল মিরিয়মের বুকের ভেতরটা। ন্যাজারথ—জোসুয়া কি এখন আছে? কোন দূরদূরান্তরের নিভৃত হতে যে তার যৌবনধন্য জীবনের সকল কামনা বাসনাকে মিথ্যে করে দিয়ে তার প্রতি মুহূর্তের চিন্তায় আর স্বপ্নে আহ্বান করছে সেই জোসুয়ার সঙ্গে দেখা হবে।

ন্যাজারথের বাজারের ধারে বড় মাঠে সিমন তাঁবু খাটালো। উটগুলো এখানে দানাপানি খাবে।

শহর থেকে ঘুরে এসে সিমন বলল, জোসুয়া এখানে নেই—গিয়েছেন গ্যালিলিতে। একটু থেমে আবার নিজের মনে-ই বলল, তাঁকে যাদের খুব দরকার—তিনি গ্যালিলির সেই গরীব দুঃখী লোকদের কাছেই গিয়েছেন—

বিষণ্ণ হয়ে উঠল মিরিয়মের মুখখানা।

ন্যাজারথ থেকে যে গ্যালিলি অনেক-অনেক দূর। কখন—কতদিন পরে সে তার স্বপ্নের রাজপুত্রের দেখা পাবে।

কাফিলা এল গ্যালিলির সীমান্ত শহর স্যাব্বাথে।

শহরের ভেতরে যেতেই পথচারীরা চারজন কাফ্রী ক্রীতদাসের কাঁধে পালকি দেখে কৌতূহলী হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। জিটারের খোলা দরজা দিয়ে যেই তাদের নজরে পড়ল মিরিয়মের সেই ঢেউ খেলানো লাল চুলের অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্য, অমনি ছুটে এল একরাশ কুৎসিত কথার ঝড়—

রোমীয়দের সেই বেশ্যাটা এসেছে রে—

ফ্যারিসীদের রক্ষিতা-টা এখানে আবার কি মতলবে—

সিমনের নির্দেশে পালকির গতি দ্রুত হল। বিড় বিড় করে বলল কাফিলার অধিনায়ক, এখানকার লোক খুব বর্বর—আমরা এখানে থামবো না—কাফিলা চলতে থাকে।

পালকির দেওয়ালে মুখ চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদে মিরিয়ম। পালকির পাশে পাশে হেঁটে যেতে যেতে সিমন বলল, নর্তকী হলে-ই পতিতা হয় না মেরী। মূর্খদের কথায় কেন তুমি কাঁদছো—কয়েকমুহূর্ত কি চিন্তা করে আবার বলল

আর বারবিলাসিনী হলেই বা কি আমাদের ন্যাজারথের জোস্থয়া কি বলে জানো —মানুষ কখনো পাপী হয়ে জন্মায় না—পরিস্থিতিতে পড়েই সে—

জোস্থয়া-কে কখন—কখন দেখতে পাবো, সিমন চাচা—মিরিয়মের কান্নায় জড়ানো কথাগুলো কেমন হাহাকারের মত শোনালো।

সিমন কোন কথা বলল না।

পরদিন-ই দূরে—বহুদূরে সকালের নির্মেঘ আকাশের গায়ে এক টুকরো কালো মেঘের মত গ্যালিলির পাহাড়ের চূড়োর দিকে তাকিয়ে সিমন হেঁকে বলল, এইবার আমরা আমাদের গ্যালিলির সীমানায় এসে পড়েছি—

কিছুক্ষণ পর মিরিয়মেরও নজরে পড়ল গ্যালিলির অতিকায় পাহাড় পাহাড়ের গায়ে স্বাস্থ্য ঘন সবুজ গাছগাছালির সমারোহ। তার ভেতরে আগুনের ফুলকির মত জ্বলছে রাশি রাশি হলুদ। আর পূর্বদিকের দিগন্তরেখায় গ্যালিলির সমুদ্রের নীলিম আভাস। সেই বিপুলব্যস্ত আকাশ আর সমুদ্রের নীলাভ বিস্তার, সবুজ অরণ্যের দিকে মুগ্ধ আর অপলক চোখে তাকিয়ে রইল মিরিয়ম। আর তার বুকের রক্তে কলধ্বনি বাজতে লাগল তীব্র একটা আবেগে তার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করছে। গ্যালিলির কোথায় গেলে কখন— দেখা পাবে জোস্থয়ার!

কাফিলা পাহাড়ের ঢালু পথ ধরে নেমে এল তাইবেরিয়াস শহরে। আর পারল না মিরিয়ম। নেমে পড়ল লিটার থেকে। এই শহরের ভেতর দিয়ে এঁকে বেঁকে একটা সরু রাস্তা চলে গিয়েছে ম্যাগডালায়। সেই রাস্তার ধারেই গ্যালিলির সমুদ্র। দুজন নুবিয়াকে দিয়ে মিরিয়ম তার মা-র কাছে পাঠিয়ে দিল চার-টি বাক্স। কিন্তু—

কোথায় জোস্থয়া? রাস্তার দুপাশের প্রত্যেকটি বাড়ির দরজা বন্ধ। শহরের মানুষগুলো গেল কোথায়। সিমন বিড় বিড় করে বলল, বোধ হয় বন্দরের দিকে জেলেদের পাড়ায়—

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই মিরিয়ম ছুটল সেই দিকে। দূর থেকে তাদের কানে এল অনেক মানুষের মৃদু গুঞ্জন। দ্রুত পায়ে সে হাঁটতে শুরু করল। দেখল, রাস্তা দিয়ে যেন জনস্রোত বয়ে চলেছে। তারা আসছে সোর থেকে, সিদনের সমুদ্রপোকুল থেকে এমন কি জেরুজ্যালেম থেকেও তার কথা শুনতে তাঁকে একবার দেখতে।

বালুচরে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন তিনি। তাঁকে ঘিরে ধরে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল জনতা। তাঁকে দেখতে পেল না মিরিয়ম। হাজার হাজার মানুষের

কলরবে শুনতে পেল না তাঁর কথা। দেখল শুধু সমুদ্রের শাঁ শাঁ বাতাসে উড়ছে তাঁর অসাধারণ শ্বেতশুভ্র বসনের প্রান্তভাগ। মিরিয়মের মনে হল যেন মেঘের বুক চিরে ঝিলিক দিয়ে উঠছে বিদ্যুতের উগ্র সাদা আলোর রেখা। তাঁর অশ্রুত বাণী, তাঁর শুভ্র বস্ত্রাবরণের প্রান্তদেশ, এত সন্নিকটে তাঁর উপস্থিতি তার মনের ভেতরে পরিস্ফুট করে তুলল তাঁর দিব্যমূর্তি। অগ্নিবর্ণ এক দীর্ঘতনু যুবা পুরুষ।

পরম আবেগে চোখদুটো বুজে এল মিরিয়মের। আর ধীরে ধীরে কেমন একটা অনাস্বাদিত পূর্ব সুখের অনুভবে তার চেতনা আবিষ্ট হয়ে এল—

প্রভু এইবার ফ্যারিসী সিমনের বাড়িতে যাবে রে—ভীড়ের ভেতর থেকে কে একজন বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে জনতার স্রোত ছুটল শহরের শেষ প্রান্তে সিমনের বাড়ির দিকে।

সিমনের গৃহসংলগ্ন প্রাঙ্গন এত বড় নয় যে অত লোকের স্থান সংকুলান হবে। তাই ভেতরে যাওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি আর ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে গেল। জনতার ভীড় ঠেলে যেই মিরিয়ম ভেতরে যেতে চেষ্টা করল অমনি কে একজন চিৎকার করে বলল, এই খবরদার,—ওই বারবনিতা-টা যেন ভেতরে যেতে না পারে—

ইহুদীর মেয়ে হয়ে টাকার লোভে হয়েছে বেশ্যা-ছি ছি।

দেখো বাবা, রোমীয়দের ওই রূপসী বারাঙ্গনা যেন আবার স্পর্শ করে প্রভুকে অশুচি না করে ফেলে—

কেউ কেউ আবার তাকে লক্ষ্য করে পাথরের টুকরো ছুঁড়তে লাগল। পরিব্রাজক সিমন তার বলিষ্ঠ দুটো হাত দিয়ে তাকে আগলে নিয়ে এল জোসুয়ার সামনে।

থর থর করে কেঁপে উঠল মিরিয়ম। তার বহু বিনিদ্র রাত্রির স্বপ্ন অহরহ তার চেতনার ভেতরে, সমস্ত সত্তার ভেতরে নক্ষত্রের মত জলজল করে যার প্রদীপ্ত মূর্তি—নাজারথের সেই জোসুয়ার এত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছে সে! কেমন অবশ হয়ে এল তার স্নায়ুগুলো! তার মনে হল, সে যেন একটা ভুবনজোড়া আলোর রাজ্যে এসে পড়েছে। সে তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে তাকাতে পারল না। কিন্তু তার হৃদয়ের ভেতরে যেন সেতারের মধুর ঝঙ্কারের মত বাজতে লাগল জোসুয়ার কথাগুলো : তোমরা ভুল করছো, বাইরে থেকে কোন কিছুই মানুষকে অপবিত্র করতে পারে না; যে মন থেকে

ব্যভিচার, লোভ, নরহত্যা ইত্যাদি কুচিন্তার জন্ম হয়, সেসব-ই মানুষকে অপবিত্র করে—

আশ্চর্য—সেই মধুস্রাবী কণ্ঠস্বর! অনেক অনেক দিন আগে অ্যানসের প্রাসাদে নাচতে গিয়ে অবিকল এই মৃদু মধুর আর দূরাগত কণ্ঠস্বর-ই তো ধ্বনিত হয়েছিল তার হৃদয়ের ভেতরে। তার চেতনা কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হয়ে গেল।

জনতার ভেতর থেকে ভীড় ঠেলে একজন জোসুয়ার জন্য মাটির রেকাবীতে করে নিয়ে এল খাবার তার সঙ্গে সঙ্গে কেমন সম্মোহিতের মত মিরিয়মও এগিয়ে এল। তার হাতে একটি অতিক্ষুদ্র স্বর্ণ নির্মিত পাত্রে মিশরের সুগন্ধী আতর। ভক্ত যেমন ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে ঈশ্বরকে প্রণতি জানায় তেমনি করে জোসুয়ার রক্তপদ্মের পাঁপড়ির মত পাদুটো জড়িয়ে ধরে চুম্বন এঁকে দিল। তারপরেই পাত্র নিঃশেষে উজাড় করে তাঁর পায়ে ঢেলে দিল আতর।

ছিঃ ছিঃ রোমীয়দের বেশ্যা-টা প্রভুকে অপবিত্র করে ফেলল—

ম্যাগডালার জেলের মেয়ে—টাকার লোভে জেরুজ্যালেমে গিয়ে হয়েছে বেশ্যা—এখন ভড়ং দেখাতে এসেছে—

তিন-চারজন লোক তাকে জোর করে সরিয়ে দিতে যেই এল অমনি জোসুয়া হাত তুলে থামতে ইঙ্গিত করে প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন, ছিঃ ছিঃ তোমরা ওকে নয়,—ওর পাপকে ঘৃণা করো—

মিরিয়ম তাঁর পায়ের ওপর মুখ থবড়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। চোখের জলে জোসুয়ার পা-দুটো ভিজে গেল। কয়েকমুহূর্ত পরেই আবার মিরিয়ম তার অপর্যাপ্ত আর কোমল রক্তিম রেশমের মত চুল দিয়ে জোসুয়ার পা-দুটো মুছিয়ে মাথা নীচু করে কান্না থরো থরো অস্পষ্ট গলায় বলল, প্রভু ওরা ঠিকই বলেছে—

আমি নষ্ট মেয়ে মানুষ—আমি—আমি পাপী তার বাদবাকী কথাগুলো আকুল কান্নার ভেতরে তলিয়ে গেল—

বাছা, পাপী হয়ে কেউ জন্ম নেয় না, জোসুয়া তাকে সস্নেহে দুহাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ফ্যারিসী সিমনে'র উদ্দেশে বললেন—এই স্ত্রীলোকটিকে দেখছো—আমি তোমার বাড়িতে অতিথি হয়ে এলাম অথচ তুমি আমার পা ধোবার জলটুকু পর্যন্ত দিলে না। কিন্তু এই স্ত্রীলোকটি তার চোখের জলে আমার পা-দুটো ভিজিয়ে চুল দিয়ে মুছে দিয়েছে—তারপরেও আরও যা বলেছিলেন বাইবেলে আছে সে সব কথা :—"তুমি (সিমন ফ্যারিসী) আমাকে চুম্বন পর্যন্ত করলে না। কিন্তু দেখ মহিলাটি এখানে আসার পর থেকেই আমার

পায়ে চুম্বন দিয়েই চলেছে। তুমি আমার মস্তক তৈল দিয়ে অভিষিক্ত করলে না; অথচ দেখ সে আমার পায়ে সুগন্ধী আতর মাখিয়ে দিয়েছে। তাই তোমাকে বলছি, স্ত্রীলোকটির অনেক পাপের ক্ষমা হয়েছে তার নিবিড় ভালবাসায়। তারপরেই মিরিয়মকে স্নিগ্ধ আর প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন, তোমার বিশ্বাস তোমাকে পরিত্রাণ করেছে, একটু থেমে আবার বললেন, তোমার অনুতাপের কান্নার ভেতর দিয়েই তোমার পাপ ধুয়ে মুছে গিয়েছে—

পাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে—! মুক্তি! তীব্র আনন্দে উত্তেজনায় থর থর করে কেঁপে উঠল মিরিয়ম! প্রদীপের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখখানা। আর মুহূর্তে বদলে গেল তার সেই শোকম্লান স্তিমিত মূর্তি। আর আশ্চর্য একটা দৃঢ়তার প্রলেপে ঋজু হয়ে উঠে দাঁড়ালো। সম্রাজ্ঞীর মত দৃপ্তভঙ্গীতে আর গর্বিত পদক্ষেপে ভীড় ঠেলে বাইরে এল।

জনতার চোখে বিস্ময়।

সেখানে আক্রোশের কোন চিহ্ন নাই।

আহা—আমাদের ম্যাগডালার মেয়েটাকে জোসুয়া ক্ষমা করেছে রে। গভীর সহানুভূতির রসে কেমন ভিজে ভিজে মনে হয় তার কথাগুলো। বয়সের ভারে ঝুঁকে পড়া এক বুড়ো এগিয়ে এসে সস্নেহে তার মাথায় হাত রাখল। ম্যাগডালার রাব্বি—জোয়াব—না? কলকল করে উঠল মিরিয়ম। তার নীল শিরার নক্সা কাটা হাতটি টেনে ধরে যেই চুমু খেতে গেল অমনি হাতটা টেনে নিয়ে বলল, না—না—মিরিয়ম—জোসুয়া তোমাকে আশীর্বাদ করেছে—তুমি তাঁর স্নেহধন্যা একটু থেমে আবার বলল, আমার হাত তোমার চুম্বনের যোগ্য নয়—

মা কেমন আছে—কোথায় আছে?

ও মা জানিস না—জোবাতো জোসুয়ার-ই শিষ্যা হয়েছে। গ্রামেই আছে—

—আমি গ্রামে যাচ্ছি। মার কাছে যাবো—বলেই যেন হাওয়ার ওপর পা ফেলে মিরিয়ম এল সমুদ্রের ধারে। ধু ধু বালুচরে পায়ের ছাপ এঁকে এঁকে চলেছে ম্যাগডালার দিকে। সাগরের সাঁ সাঁ বাতাস যেন তার কানের কাছে মধুর কোন রাগিনীর মত বেজে চলেছে। রং বদলে গিয়েছে তার পৃথিবীর। তার সমস্ত চেতনার ওপরে নেমে এসেছে বিহ্বল স্বপ্ন—তার রাজপুত্র কোন যাদুমন্ত্রে তার সমস্ত ক্লেদ পঙ্কিলতা নিঃশেষে মুছে দিয়ে এক অনির্বচনীয় সুখে আর পরিতৃপ্তিতে পূর্ণ করে দিয়েছে তার মন। তন্দ্রাভিভূতের মত নিজের মনেই বলল, গ্রাম-গ্রামান্তরে যেয়ে জোসুয়ার বাণী প্রচার করতে হবে—

ম্যাগডালায় গিয়ে মা-র সঙ্গে দেখা করেই চলে এল মিরিয়ম। জোসুয়া তাইবেরিয়াস ছেড়ে চলে যাবে গ্রাম গ্রামান্তরে। না—না—তার জোসুয়াকে তার বহু বিনিদ্র রাত্রির স্বপ্ন—তার সোনার বরণ রাজপুত্রকে সে একমুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল করবে না—করতে পারবে না। তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল আর তীব্র এক সুখের আবেগে তার চোখদুটো জলে ভরে এল।

ওদিকে গ্যালিলির রোমীয় শাসনকর্তা হেরড অ্যান্টিপাসের প্রাসাদে জাজারথের সেই অসাধারণ জনপ্রিয় তরুণ সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত ঘনীভূত হয়। মেষ চর্মের বা পার্চমেন্টের লিপিতে উরি লেখে—আর বিলম্ব করা উচিত নয়। জোসুয়া আকাশে বাতাসে বিদ্রোহের আগুন ছড়াচ্ছে। সে বলছে—দেশের অধীশ্বর হবে দরিদ্র জনসাধারণ—বিত্তশালী সম্ভ্রান্তরা নয়। আরও বলছে, অন্তর শুদ্ধ থাকলেই ঈশ্বরের দেখা পাওয়া যায়—মন্দিরে গিয়ে মূর্তি পূজা করা অর্থ হীন—এ সব কথা বলে মন্দিব এবং পুরোহিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করছে। সে নিজে তো এসব রাজদ্রোহকর কথা বলছেই এবং তাঁর আরও বারোজন শিষ্যকে গ্যালিলির বিভিন্ন গ্রামে তার মতামত প্রচারের জন্য পাঠিয়েছে—সে স্বপ্ন বিলাসী নয়—রাজদ্রোহী—

এই চিঠি নিয়ে রানার ছুটল জেরুজ্যালেমে—

গ্যালিলিতে কাজ শেষ করে জোসুয়া চলে যায় জুডিয়ার দিকে। তাঁর নির্দেশে মিরিয়ম গ্রামে গ্রামে ধর্মপ্রচার করে। এক অপার্থিব সুখে আর পরিতৃপ্তিতে ভরে উঠেছে মিরিয়মের জীবন। তার রাজপুত্রের নবোদিত আদিত্যের মত ভাস্বর মূর্তি প্রতিমুহূর্তে তার চেতনার ভেতরে জলজল করে। তার কণ্ঠে নেই মুক্তার মালা, বাহুতে নেই কোন স্বর্ণাভরণ। সেসব কবে গরীব দুঃখীদের বিলিয়ে দিয়েছে।

তবুও—তবুও কী আশ্চর্য তার মনে হয়, সে যেন তার সেই জেরুজ্যালেমের প্রাসাদে বিলাস বৈভব আর অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্যের ভেতরেই বাস করছে। হামামের তীব্র সুগন্ধী গোলাপ জলের পরিবর্তে কখনো পথপ্রান্তের কোন গিরিনির্ঝরের হিমশীতল সলিলে, কখনো বা দূর কোন শহর জনপদের বাজারের কূপের অপরিচ্ছন্ন জলে স্নান করে মিরিয়ম। শিশিরের মতন নরম মসৃণ সেই প্রায় স্বচ্ছ মসলিন নয়, তার পরণে দীন-দরিদ্র ধীবর রমণীর মত ক্ষারে কাচা রুক্ষ কর্কশ বস্ত্র। নেই সুগন্ধ পুষ্প-নির্যাস মিশ্রিত জলপাই তৈল, নেই আতর।

তবুও—তবুও রূপেশ্বরী মিরিয়মের যৌবনলাবণ্যমাধুরী যেন রিক্ততার সৌন্দর্যেই প্রদীপ্ত জ্যোতি বিকীর্ণ করে। গ্যালিলির পথে প্রান্তরে দূর নিভৃত পল্লীতে অবিরাম পরিভ্রমণরতা মিরিয়ম যেন এক সিদ্ধ উপাসিকার মতই এই বিশ্ব-চরাচরের অধীশ্বর তার সেই আদিত্য বর্ণ জোসুয়ার-ই পদধ্বনি শুনতে পায় দিগদিগন্তে। আর গভীর নিশীথ রাত্রে তার যেন মনে হয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন দূরের বনবনান্তরের গহণলোক থেকে তারই মধুনিষ্যান্দী কণ্ঠের বাণী এক দিব্যলোকের মর্মরধ্বনির মত জেগে উঠছে।

শুধু মিরিয়মকে নয়, শুধু গ্রামবৃদ্ধ জোয়াবকে নয়। কে জানে কোন মন্ত্রবলে গ্যালিলির দীন দুঃখী ইহুদীদের একেবারে বদলে দিয়ে গেছে জোসুয়া। তারা আর মূর্তি পূজা করে না, মন্দিরের দিকে ঘুরেও তাকায় না যেমন, তেমনি জমি নিয়ে কি বাড়িঘর-বিষয় আসয় নিয়ে মারামারিও করে না। তাদের মন থেকে যেন কর্পূরের মত উবে গিয়েছে হিংসা-দ্বেষ-লোভ আর ঈর্ষা। পরস্পরের প্রতি নিবিড় প্রীতি আর সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তারা যেন এক অবারিত সুখের পৃথিবীতে বাস করে। তাদেরই অনাথ শিশুদের পরিচর্যা করে দিন কাটে মিরিয়মের। আর দূর দিগন্ত যখন আসন্ন রাত্রির রঙে মলিন হয়ে আসে তখন মিরিয়ম তাদের বলে জোসুয়ার কথা। বলে জানো—তিনি বলেন প্রত্যেক মানুষের ভেতরে ঈশ্বর আছেন। কেউ কারো চেয়ে ছোট নয়—বলতে বলতে-ই তীব্র আবেগে তার চোখ দুটো বুজে আসে। আর তার বুকের ভেতরে জোসুয়ার মধুনিঃসৃত কণ্ঠের বাণীগুলো যেন মন্ত্রের মত নিঃশব্দে গুঞ্জরিত হতে থাকে।

আচ্ছা মেরী, এই রকমই এক শান্ত সন্ধ্যায় জোয়াব বলল, তোমার নাচের সুখ্যাতি তো আমরা কত শুনেছি। তুমি আমাদের তোমার নাচ দেখাও—না?

নাচ! অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল মিরিয়ম। কান্নায় ভাঙা ভাঙা গলায় বলল না—না—পারবো না রাব্বি—নর্তকী মিরিয়ম অনেক—অনেক দিন আগে মরে গিয়েছে—বলেই একটা পাথুরে মূর্তির মত বসে রইল সে। এমন সময়ে হঠাৎ—

—দূরে পাহাড়ের আড়াল থেকে রাখালের বাঁশীর সুর বেজে উঠল। সেদিকে তাকিয়ে সম্মোহিতের মত উঠে দাঁড়ালো মিরিয়ম। ক্রমশঃ কাছে এল সেই ক্ষীণ দূরাগত শব্দ। আর নির্জন বনভূমিকে সচকিত করে দিয়ে সেই বাঁশীর সুরের মূর্চ্ছনা তার পায়ে ফুটিয়ে তুলল নৃত্যের বোল। আকাশের রাশি রাশি তারার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে নাচতে শুরু করল মিরিয়ম। যত

সেই বাঁশীর সুর নিকটবর্তী হল ততই উদ্দাম হয়ে উঠল তার নৃত্যের গতি। জোয়াব এবং সেই গ্রামের দর্শকদের মনে হল, বিপুল ব্যপ্ত আকাশের অগণিত নক্ষত্রের ছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চাঁদের আলো গায়ে মেখে কোন অপ্সরী যেন মত্ত আবেগে নৃত্য করে চলেছে। আর মিরিয়মের সত্বার ভেতর থেকে উৎসারিত তার সেই নৃত্যের প্রতিটি মুদ্রার অপূর্ব ব্যঞ্জনা যেন সুমন্ত্রিত মন্ত্রস্বরের মত তাদের নিয়ে চলেছে কোন উর্দ্ধলোকে মহৎ ও উদার একটি অনুভূতির রাজ্যে। ধীরে ধীরে সেই অপস্রয়মান বাঁশীর সুর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে চারিদিকের নিথর স্তব্ধতার ভেতরে বিলীন হয়ে গেল। ক্লান্ত আর অবসন্ন হয়ে বসল মিরিয়ম।

কে ওখানে? হেঁকে বলল জোয়াব।

রোমীয়দের গুপ্তচর নয় তো? অস্ফুটস্বরে বলল একজন।

আমি সিমন, বহুদর্শী পরিব্রাজক সিমন মিরিয়মের দিকে কেমন করুণ চোখে তাকিয়ে বলল, তুমি শীগগীর জেরুজ্যালেমে চলো মেরী—একটু থেমে আস্তে আস্তে ফিস ফিস করে জানালো অনেক খবর—পন্তিয়াস পাইলেত, সায়াফাস এবং গ্যালিলির রোমীয় শাসনকর্তা হেরড অ্যান্টিপাস্—কোন কর্তাব্যক্তিই জোসুয়াকে সুনজরে দেখছে না। তাকে রাজদ্রোহী প্রমাণ করার চেষ্টা চলছে। এতক্ষণ হয়তো—

উরি কোথায়? রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করল মিরিয়ম।

সে তো আমাদের এই গ্যালিলিতে থেকেই জোসুয়ার গতিবিধির খবর জানাতো সায়াফাসকে এখন জেরুজ্যালেমে, একটু থেমে বলল, একমাত্র উরি-ই বাঁচাতে পারে জোসুয়াকে—

কেউ পারবে না—পারবে না, রাত্রির আকাশের অগণিত নক্ষত্র পুঞ্জের দিকে তাকিয়ে ছাড়া ছাড়া গলায় বলল গ্রামবৃদ্ধ জোয়াব, জোসুয়াই একদিন বলেছিল পৃথিবীতে তার কাজ শেষ হয়েছে আরও জেনে রেখ, শুধু আমার নয় কোন মানুষের আত্মাই ইহলোকের নয়, যার যখন কাজ শেষ হ'বে তার আত্মা বিলীন হয়ে যাবে অনন্তলোকে—

কি—কি বলছো গাঁওবুড়ো—তার জোসুয়া থাকবে না, বুকফাটা আর্তনাদ করে এই কথাটাই বলতে চেয়েছিল মিরিয়ম। কিন্তু বলল না—বলতে পারল না। শুধু কেমন উদভ্রান্ত আর শূন্য দৃষ্টিতে দূরে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। কয়েকমুহূর্ত পরেই দগ্ধপক্ষ বিহঙ্গীর মত মর্মান্তিক যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্তনাদ করে বলল—সিমন চাচা, আমাকে জেরুজ্যালেমে নিয়ে চলুন—

গ্যালিলি থেকে জেরুজ্যালেম অনেক—অনেকদূর—

মিরিয়মের মনে হল কাফিলার উটগুলো যেন পায়ে ভারী পাথর বেঁধে চলেছে বড় বেশি মন্থর গতিতে। থেকে থেকে ব্যাকুল হয়ে বলছে সে, আরও তাড়াতাড়ি চলুন সিমন চাচা—চারিদিকের অবিচ্ছিন্ন নির্জনতার ভেতরে তার কথাগুলো হাহাকারের মত শোনায়।

জেরুজ্যালেমে পেঁছেই মিরিয়ম ঝড়ের বেগে এল মাউন্ট অলিভে তার সেই রাজকীয় প্রাসাদে। ঘরে ঘরে সুসজ্জিত মহার্ঘ আসবাবপত্র ঠিক যেমন ছিল তেমনি আছে। সেই কোষাগার—সেই প্রসাধন কক্ষ। ইলা, বাগা, নিভা দেখল, মিরিয়মের পরণে অতি দীনদরিদ্র ধীবররমণীর জীর্ণ মলিন বস্ত্র। নিভার চোখে জল এসে পড়ল। অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে বলল—যার একদিন রাজরাণী হওয়ার কথা ছিল—

—দেখছিস কি বাগা-ইলা—তোরা আমাকে সাজিয়ে দে—ব্যস্ত হয়ে ছটফট করে বলল মিরিয়ম।

এল প্রসাধন কক্ষে। বিস্মিত সঙ্গীনিদের বলল, তোদের মনের মত করে সাজিয়ে দিবি—আর এখন কিছু জিজ্ঞাসা করবি না—

তারা সুগন্ধী পুষ্পনির্যাস মিশ্রিত জলপাই তৈলের প্রলেপে ধীরে ধীরে বহুদিনের অযত্নে আর অবহেলার রুক্ষ গাত্রচর্ম মসৃণ ও পেলব তুলল। পরিয়ে দিল রূপোর বুটিদার রক্তবর্ণ রেশমের বস্ত্রাভরণ। সেই অপর্যাপ্ত রক্তিম কেশের গুচ্ছে গুচ্ছে শোভা পেতে লাগল পদ্মরাগ মণি। কণ্ঠে দিল রক্তপ্রবালের মালা। বাহুতে মরকতমণিখচিত স্বর্ণবলয়। অনেক—অনেকদিন পরে জেরুজ্যালেমের নগরশোভনা রূপেশ্বরী মিরিয়ম সালঙ্করা হয়ে, কে জানে কোথায় চলেছে অভিসারে।

জুপিটারের মন্দিরের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল মিরিয়ম। সাবেকদিনের সেই সম্রাজ্ঞীর মতো সেখানকার ক্রীতদাস পরিচারকদের হুকুম করল—যাও তোমাদের প্রধান পুরোহিত উরিকে ডেকে দাও—বলবে ম্যাগডালার মিরিয়ম এসেছে—

তার নাম শুনেও সঙ্গে সঙ্গে এল না সে—যে কতদিন কতবার তার কাছে গিয়েছে অতি দীন এক প্রার্থীর মত। তার বুকের ভেতরটা ভারী—খুব ভারী হয়ে উঠল।

নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর। খররৌদ্রে মন্দিরের শ্বেতপাথরে বাঁধানো প্রাঙ্গণ থেকে তাপ উঠছে। দূর থেকে ভেসে আসছে একটা কুকুরের কান্নার বীভৎস

আওয়াজ। অজানা একটা আশঙ্কায় তার বুকের ভেতরটা ঢিব ঢিব করে উঠল। তাহলে কি এতক্ষণে—

কি ব্যাপার তুমি? উরির চোখে বিস্ময় ফুটে ওঠে।

উরি, তুমি আমার ছেলেবেলার বন্ধু, ভরাট আর মৃদু গলায় বলল মিরিয়ম। অনেক-অনেকদিন আগে গ্যালিলির সমুদ্রের বালুচরে আমাকে চুমু খেয়ে বলেছিলে, আর তারপরেও কতবার তুমি বলেছিলে, সেই চুম্বন তোমার-আমার চিরকালের বন্ধন, থামল সে। জলভরা দুটো চোখের করুণ দৃষ্টি তুলে ধরে বলল, সেদিন তোমার কথা আমি বুঝতে পারি নি উরি। আজ এসেছি-এসেছি তোমাকে বিয়ে করে তোমার সেই স্বপ্নকে-সার্থক করতে—পরম আবেগে উরির হাতটা জড়িয়ে ধরে বলল, উরি—তোমাকে বিয়ে করলে বলো—কথা দাও জোসুয়ার কোন ক্ষতি করবে না—

বড়ো দেরি করে ফেলেছো তুমি, রূঢ় কর্কশ গলায় বলল উরি, একদিন চুম্বনকে যে বন্ধন বলে মনে করেছিলাম—সেটা ভাবতেও লজ্জা হয়। আমার মনে তোমার কোন স্থান নেই। তুমি—তুমি অত্যন্ত নীচ—হীন—বেইমান—তুমি একটা বিদ্রোহীর অনুচর, একটু থেমে তীব্র উত্তেজনাকে সংযত করে বলল, তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে,—যেমন আজ সকালে গিয়েছে তোমার জোসুয়া, একটু থেমে আবার দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল, দেশদ্রোহীদের যেমন নিয়ম, তেমনি তিনজন চোরের সঙ্গে তাকেও ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। ক্রুশের বড় বড় কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে আর দারুণ যন্ত্রণা পেয়ে বুঝে গিয়েছে দেশের বিরুদ্ধাচারণ করার—

কি! তার জোসুয়া নেই। যেন দুলে উঠল জুপিটারের বিশাল মন্দিরটা। মাথার ভেতরটা কেমন করে উঠল। আর মুহূর্তে অসংলগ্ন আর কেমন বিশৃঙ্খল হয়ে গেল তার চেতনা। ঝড়ের বেগে তার প্রাসাদের দিকে হাঁটতে শুরু করল। মনে হল—যদি উরিকে বিয়ে করতো, তাহলে জোসুয়ার হয়তো এই করুণ পরিণতি হতো না। নিজের কৃতকর্মের অনুশোচনায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় তার মন। আবার তার কানের কাছে দূরাগত মন্ত্রস্বরের মত ধ্বনিত হতে থাকে জোসুয়ার সেই বাণী—মানুষের আত্মা ইহলোকের নয়—পৃথিবীতে কাজ শেষ হলে—নশ্বর দেহ ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু আত্মা বিলীন হয়ে যায় অনন্তলোকে—স্তব্ধ দ্বিপ্রহরের বিশাল ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল যেন দিক্‌দিগন্তে বাতাসের মর্মরে যেন ঝঙ্কৃত হচ্ছে তার মধুনিঃস্যন্দী কণ্ঠের সেই বিচিত্র আর আশ্চর্য উপদেশ—আপন আপন শত্রুদের ভালবাসো; যারা

তোমাদের হিংসা করে, তাদেরও উপকার করো—হঠাৎ কেন যেন বিদ্যুত-চমকের মতো তার মনে হল, জোসুয়ার এই প্রেম ও অহিংসার বাণী একদিন দূর ভবিষ্যতের অনাগতকালের মানুষকে দুঃখদুর্যোগের অন্ধকারে আলোর সন্ধান দেবে—

না—না তার জোসুয়ার মৃত্যু নেই—মৃত্যু হতে পারে না—না, সে কাঁদল না—এক ফোটা জল এল না তার চোখে। মহৎ একটা আবেগে উদীপ্ত হয়ে তার মন চলে গেল কোন উর্দ্ধলোকে। আশ্চর্য একটা প্রশান্তিতে আবিষ্ট হয়ে বাড়িতে এল। নিভাকে বলল, পিসী, ওরা জোসুয়াকে কোথায় কবর দিয়েছে খুঁজে বের করো—

ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর দুইটি রজনী অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। এল তৃতীয় দিনের নিশীথ রাত্রি। ঘন অন্ধকারে প্রেতিনীর মত নিঃশব্দ পায়ে এল তিনটি ছায়ামূর্তি। এল সেই গেহিনম উপত্যকার যেখানে এক বৃদ্ধার কুটিরে রাত্রিবাস করেছিল ঠিক তার বিপরীত দিকে সোলগোথায় আন্তোনিয়া দুর্গের কাছে। এই দুর্গের-ই প্রাচীরের বাইরে এক গিরিগুহার মুখে একখণ্ড পাথর চাপা দিয়ে নিতান্ত অবহেলায় সমাধিস্থ করেছে জোসুয়াকে।

ধীর পায়ে এগিয়ে গেল মিরিয়ম। তার হাতে স্বর্ণনির্মিত পাত্রে অগুরু নির্গাস, আর একটিতে সুগন্ধী জলপাই তৈল। আশ্চর্য একটা আত্মপ্রসাদে আবিষ্ট হয়ে গিয়েছে তার মন। গুহামুখের পাথর সরিয়ে দিলেই বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠবে তার জোসুয়ার, তার স্বপ্নের রাজপুত্রের উজ্জল চাঁদের মত সেই স্নিগ্ধ মুখশ্রী। অনন্তলোকে তার জয়যাত্রার আগে তাকে সাজিয়ে দেবে! কিন্তু—

ভারী পাথরটা সরাতেই সে শিউরে উঠল। শূন্যগর্ভ গুহায় জমাট অন্ধকার খাঁ খাঁ করছে। কিন্তু তার মনে হল—মনে হল তার আদরের জোসুয়ার শ্বেতশুভ্র বসনে আবৃত সেই অগ্নিবর্ণ দীর্ঘতনু আরও দীর্ঘতর হয়ে প্রসারিত হতে হতে দিগন্তবিসারী আকাশের সঙ্গে মিশে যেতে লাগল। আর তার অন্তরের ভেতরে সমস্ত সত্তার ভেতরে দূরাগত স্নিগ্ধ গম্ভীর মন্ত্রস্বরের মত বাজতে লাগল তার মধুস্রাবী কণ্ঠের সেই বাণী, তুমি দয়ালু হও—তবে তুমি ঈশ্বরের দয়া পাবে—

না—তার জোসুয়ার মৃত্যু নেই। জানো—আমি দেখেছি—স্বচোক্ষে দেখেছি—সে সমস্ত বিশ্বচরাচরের মানুষের কল্যাণের জন্য পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। শুনতে পাচ্ছো না সারা আকাশ বাতাস দিক্‌দিগন্ত আলোড়িত করে দুন্দুভি বাজছে—মানবপুত্রের জয়গানে মুখরিত হয়ে উঠেছে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে

আর একপ্রান্ত—বদ্ধ উন্মাদিনীর মত দুহাত তুলে এই কথাগুলোই বলতে চেয়েছিল দূরে প্রতীক্ষারত পরিব্রাজক সিমন, আর প্রধান শিষ্য পিটার এবং অন্যান্য শিষ্যদের।

কিন্তু বলতে পারল না। আর নিজেকে সংযত রাখতেও পারল না। সেই গিরিগুহার সামনে পাথরে মুখ থুবড়ে পড়ে তীব্র কান্নায় ভেঙে পড়ল।

সেই কান্নাভরা শোকার্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে সঙ্গীদের চোখে জল এসে পড়ল।

এতদিনে জেরার স্বপ্ন সার্থক হল—ম্যাগডালার মেয়ে ম্যাগডালিন স্বর্গরাজ্যের সম্রাজ্ঞী হয়ে থাকবে, অস্ফুটস্বরে সিমন বলল।

জোসুয়ার সঙ্গে ওই হতভাগী মিরিয়মও চিরকাল মানুষের মনে বেঁচে থাকবে, বলল পিটার।

হ্যাঁ। বেঁচে আছে। ম্যাগডালিনের অনুতাপবিদ্ধ জীবনের উত্তরণের বিচিত্র কাহিনী, যীশুর প্রতি তার নিবিড় অনুরাগের ইতিবৃত্ত যুগযুগান্তর ধরে শাশ্বত হয়ে আছে বাইবেলের পাতায়।

রেবেকা ও আইজ্যাক

একটা মেয়ে চাই।

মিষ্টি একটা মেয়ে। এমন একটা মেয়ে যে রঙীন প্রজাপতির মত হাওয়ার ওপর পা ফেলে ফেলে হাঁটবে। হাসি যার চোখের কালোয় আঁকা। খুশি যার লীলায়িত দেহে ফুলের পাঁপড়ির মত ঝরে ঝরে পড়বে।

শুধু কি তাই?

যখন পশ্চিমের আকাশে আবির ছিটিয়ে সূর্য অস্ত যাবে, তখন কাঁখে কলসী নিয়ে ধীর পায়ে সে কুয়োর দিকে এগিয়ে আসবে। বেলাশেষের রোদে তার ছায়া দীর্ঘতর হয়ে পড়বে প্রান্তরের বুকে। সে সখীদের সঙ্গে মৃদু গলায় কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসবে, আসবে টুকরো টুকরো কথার ফাঁকে ফাঁকে মিষ্টি হাসির ফুলঝুরি ছিটিয়ে। তাদের হাসিতে কথায় সেই বিজন-প্রান্তর ছন্দ-সুরভিত হয়ে উঠবে।

আসমানী রঙের পাতলা ওড়নায় তাদের মুখ ঢাকা থাকবে। কাঁচের শার্শীর ভেতর দিয়ে বহু-বহুদূর দিগন্তের ছবি দেখার মত আবছায়া, ম্লান আর অস্পষ্ট দেখতে পাব তাদের সুডৌল মুখ। দেখব, তাদের সুর্মা-টানা ঘন কালো বড় বড় দুটো চোখে তীব্র কৌতূহল জোনাকির মত মিটমিট করছে। কুয়োর চারিদিকে চক্রাকারে দাঁড়াবে যৌবনবতীরা। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, নানা রঙের ফুলের একটা মালা কে যেন পরিয়ে দিয়েছে সেই জলাধারের গায়ে। আমি সেই বহুবর্ণের ফুলের সমারোহের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে এগিয়ে যাব।

—আমি যে বিদেশী। ভয় এইজন্যে—অজানা অচেনা উটকো লোক দেখলে সুন্দরীরা অস্বস্তি বোধ করতে পারে।

তবুও—আমাকে যেতেই হবে। আমাকে যে খুঁজে পেতে হবে একটা মিষ্টি মেয়ে। মেঘভাঙা জোৎস্নার মত আশ্চর্য একটা কমনীয়তা তার মুখে মাখানো থাকলেই হবে না, হাসির আভায় উজ্জ্বল দুটো কালো ডাগর চোখ থাকলেই হবে না। শুধু সুন্দর মিষ্টি চেহারা হলেও হবে না। তার মনটাও মিষ্টি হওয়া চাই। কলসী ভরে যখন ঘরের দিকে তারা পা বাড়াবে তখন আমি

তাদের বলব,—আমি খুব তৃষ্ণার্ত—আমাকে একটু জল দেবেন ওই কলসী থেকে—

ওরা থমকে দাঁড়াবে। এ ওর মুখের দিকে তাকাবে। কিন্তু ওদের ভিতরে একজন—শুধু একজন এগিয়ে আসবে। বলবে, আসুন, অনুগ্রহ করে জল পান করুন—

আশ্চর্য স্নিগ্ধ আর নমনীয় কণ্ঠস্বর তার। ফিকে নীল রঙের ওড়নার আড়ালে প্রতিমার মত সুন্দর একটা মুখাবয়ব জলজল করছে। আমি তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসবো। দুহাত পেতে অঞ্জলি ভরে জল খেয়ে আমি বলবো—আঃ বাঁচালে—আমি—আমি খুব পরিতৃপ্ত—জীহোভা তোমার মঙ্গল করুন—

সে কোন কথা বলবে না। কিন্তু দূরে আমাদের কাফিলার উটগুলোকে ধুঁকতে দেখে ব্যথিত হয়ে উঠবে তার সরল দুটো চোখের দৃষ্টি। ভার ভার গলায় বলবে, আপনার সঙ্গীরা আর উটগুলোও জলতেষ্টায় খুব কষ্ট পাচ্ছে, একটু থামবে—তারপর কে জানে, কয়েকমুহূর্ত কি ভেবে দূর থেকে অস্পষ্ট গলায় বলবে, ওদের সবাইকেই আমি জল খাওয়াবো।

এক অজানা অচেনা পরদেশী মানুষের জন্য তার এই সহানুভূতি দেখে আমি বিস্মিত হবো। শুধু দেখতেই সুন্দর নয়, মনটাও তো গভীর মমতায় পরিপূর্ণ—

হে জীহোভা—হে প্রভু—ঠিক এইরকম একটি শ্রীময়ী লক্ষ্মী মেয়ের দেখা পাইয়ে দাও, তার এই আকুল প্রার্থনার কথাগুলো অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করল এলিজার। আর দিগন্তবিসারী মরুভূমির সাঁ সাঁ বাতাসের সওয়ার হয়ে তার কথাগুলো দূরদূরান্তরে মিলিয়ে গেল।

ডিং—ডং—ডিং—ডং উটের গলায় ঘণ্টা বাজে। এলিজার আর তার সহযাত্রী বণিকদের কাফিলা পাড়ি দেয় দুরদুর্গম পথ। সেই কবে যাত্রা শুরু করেছিল জেরুজ্যালেমের দক্ষিণ পশ্চিমে সমৃদ্ধ জনপদ হিব্রোন থেকে—বৈথশান আর যিরীহোর ভেতর দিয়ে মরুসাগরের পশ্চিমতীর ধরে সোজা চলেছে। হাৎসোর আর আবেল-বৈথ-মাখার পেরিয়ে এসে পড়েছে সিরিয়ার দিগন্ত-বিস্তৃত মরুভূমিতে। তার মনে পড়ল, তার মনিব অ্যাব্রাহাম বলেছিলেন, এই মরুপথের আর একটি নাম রাজপথ! এই পথের ধারে অনেক দূর দূর ব্যবধানে আছে না কি চারটি বড় বড় দুর্গ—কীরহরাসৎ তোফল আরও কি সব নাম। চারটি দুর্গকে যুক্ত করেছে বলেই নাকি এর নাম হয়েছে রাজপথ! মেসোপটেমিয়ার চারজন রাজা এই পথ ধরে এসেই মত্ত আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল প্যালেস্তাইনে। রাহজানের ভয়ও খুব বেশি এই রাস্তায়।

জীহোভার অনুগ্রহে কোন বিপদ আপদ এখন পর্যন্ত হয় নি। পেরিয়ে এসেছে শহর রামোৎ-গিলিয়দ আর বব্বাৎ-অম্মোন। কিন্তু—এখনো শেষ হয় নি মরুভূমি। যেদিকে তাকাও শুধু ধুধু বালুবিস্তার। দুপুরের খররোদে বালির ভেতর থেকে তাপ উঠছে। শাঁ শাঁ বাতাসে এক একটি আগুনের বিন্দুর মত বালির কণা উড়ে এসে পড়ছে নাকে-মুখে।

কিন্তু যত কষ্টই হোক তাকে যেতে হবে। যেতেই হবে। কাজটি যে অত্যন্ত জরুরী! তাব কানের কাছে বাজতে লাগল তাব প্রভুব নির্দেশ—আইজ্যাক বড হয়েছে এলিজার—ওর জন্য একটি মেয়ে চাই—মিষ্টি মেয়ে বুঝেছো? একটু থেমে কয়েক মুহূর্ত কি ভেবে আবার বলেছিলেন, তোমাকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে এলিজার—অনেক-অনেকদিন আগে যে পথ ধরে ইস্রায়েলীয়রা উত্তরের দেশে গিয়েছিল সেই বাস্তা ধরে তোমাকে চলে যেতে হবে তাইগ্রীস ইউফ্রেতিস নদীর দেশ—মেসোপটেমিয়া। তুমি তো জানো সেখানে আমাব স্বজাতি নাহোরেবা বাস কবে। তাদেব মেয়েরা দেখতে শুনতে যেমন সুন্দর, তেমনি স্বভাবও মিষ্টি—

মেসোপটেমিয়া! অবাক হয়ে গিয়েছিল সে! যেখানকার বাসিন্দাবা ইট-কাট-কি পাথরেব পুতুল পূজা করে আর ভণ্ড পুরোহিতদের সাক্ষাৎ দেবতার মত ভক্তি কবে তাদের সোনা-দান থেকে শুরু করে সর্বস্ব উজাড় কবে দেয় বলে ঘেন্নায় সে দেশ ছেড়ে চলে এসেছিল, এসেছিল গ্যালিলি জেলার কনান গ্রামেব পবিত্র মাটিতে।

এইখানে—এইখানেই জীহোভাতাকে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন। কনানের আকাশে বাতাসে মিশে আছে জীহোভার পবিত্র ও সুরভিত নিশ্বাস—জীহোভার একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে শেষপর্যন্ত কিনা একমাত্র ছেলের পাত্রী খুঁজতে পাঠালো পৌত্তলিকদের দেশে! তার প্রভুর মনের থৈ পাওয়া খুব কঠিন।

সারা দিনরাত মুখখানা গোমড়া করে কি ভাবে কে জানে! থেকে থেকে বিড় বিড় কবে নিজের মনেই কি যেন বলে। আর যেই রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসবে আর মোরিয়া পাহাড়ের আড়াল থেকে গা টেনে টেনে সূর্য উঠে আসবে তখন তাকে কেউ আর কিছুতেই বাধা দিতে পারবে না, ধীর পায়ে চলে যাবে মোরিয়া পাহাড়ের দিকে। ঝোপ-জঙ্গল ভেঙ্গে উঠে যাবে একেবারে চূড়ায়। আর সেখানে একটা বড় পাথরের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে সূর্যের দিকে তাকিয়ে জীহোভা বা সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করবে—

আচ্ছা প্রভু, পুরোহিতেরা তো মন্দিরে গিয়ে সূর্য দেবতা কি চন্দ্রদেবতার পূজা করে, ভয়ে ভয়ে একদিন সে বলেছিল, কিন্তু আপনি কেন লোকের চোখের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে জীহোভার স্তব করেন ?

কোন কথা-ই বলল না প্রভু। তার বুকে ভয়ের ধুকু পুকু। যদিও খুব বিশ্বাস করেন, ভালবাসেন। তবুও সে তো দাস ! কে জানে—বেমক্কা কি বলে বসেছে !

শোন, এলিজার সস্নেহে তার পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন মালিক, তুই জানিস আমার বাপ চোদ্দ পুরুষের দেশ ছিল ব্যাবিলনের দক্ষিণে আর শহরে। সেখানকার বাসিন্দারা মূর্তিপূজা করে, বিশ্বাস করে বহুদেবতার অস্তিত্বে, একটু থেমে গিয়েছিলেন প্রভু। চোখমুখ কেমন কঠিন হয়ে উঠেছিল। আবার আস্তে আস্তে বলেছিলেন, কিন্তু আমার মন বলতো—ওরা ভুল করছে। ঈশ্বর বা সদাপ্রভু এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁর-ই নির্দেশে আকাশে চন্দ্র-সূর্য উঠছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলছে—আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। বুক উজাড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, কিন্তু আমার সেই যে বিশ্বাস—সদাপ্রভু এক। সেকথা কাকে বলব আর বলবই কি—প্রমাণ কোথায় ? কোথায় গেলে দেখা পাবো সেই ইশ্বরের ? মনের ভেতরে দারুণ যন্ত্রণা নিয়ে বুড়ো বাপ আর সারা —তোর মা-র হাত ধরে দেশ ছেড়ে তাইগ্রীস—ইউফ্রেতিস পেরিয়ে গিয়েছিলাম মেসোপটেমিয়ায়। সেখানকার লোক আবার আরও এককাঠি বাড়া—

কি রকম—তারাও কি পাথরের নুড়িতে তেল সিঁদুর মাখিয়ে পুজো করতো ? প্রভুর সাবেক জীবনের কথা শুনতে খুব মজা লাগছিল বলেই সে আবার প্রশ্ন করেছিল।

যুদ্ধ কি দুর্ভিক্ষ কিম্বা অনাবৃষ্টি, অজন্মা কোন কিছু হলেই তারা দেবতাকে খুশি করার জন্য নিজেদের সন্তান বলি দিত, বলতে বলতে ঘেন্নায় প্রভুর মুখখানা দড়ির মত পাকিয়ে উঠেছিল। আবার আস্তে আস্তে যেন নিজের মনেই বলেছিলেন, সেই সর্বশক্তিমান সদাপ্রভুর যে নিয়মে সারা বিশ্বচরাচর চলছে সেই নিয়মেই বৃষ্টিপাত বা অনাবৃষ্টিও হচ্ছে। তাহলেও প্রকৃতির খামখেয়ালীপনার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে—এসব তো কাউকে বলতে পারি না—

বলতে গেলে তো আপনাকে খুন করে ফেলতো প্রভু—তাই না ?

হ্যাঁ রে এলিজার, কেমন আনমনা হয়ে দূরে মোরিয়া পাহাড়ের দিকে চোখ দুটো ছড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, আবার সে-দেশ ছেড়ে তাইগ্রীস-ইউফ্রেতিস পেরিয়ে চলে এলাম এখানে। কিন্তু—

হঠাৎ থেমে গিয়েছিলেন প্রভু। আর মুখে কিসের যেন ব্যথার ছায়া ফুটে উঠেছিল। আবার বললেন, কনানীয়রাও কিন্তু মনে করে, ঈশ্বর ঝড়ো মেঘের পিঠে চড়ে বজ্র বিদ্যুত ইত্যাদি ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সারা আকাশ-জুড়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন—প্রভু একটু হাসলেন। ম্লান হাসি। আবার বললেন, অনেক অলীক আর ভুয়ো দেবতায় তারাও বিশ্বাস করে। ওদের মন থেকে এসব অন্ধ কুসংস্কার কিছুতেই মুছে ফেলতে পারি নি বলেই চুপি চুপি মোরিয়া পাহাড়ের জঙ্গলে—

আচ্ছা প্রভু লোকে বলে, ওই পাহাড়েই নাকি জীহোভার দেখা পেয়েছিলেন?

তোর অত খবর কি রে ব্যাটা, বলেই পিঠে আদর করে একটা চাপড় মেরে বলেছিলেন, তোকে যে-কাজের ভার দিয়েছি—তুই তাই কর—

আর কিছু বলতে সাহস করে নি। প্রভুকে প্রণাম করে এই যাত্রা শুরু করেছিল। বাড়ি থেকে কিছু দূরে যেই মোরিয়া পাহাড়ের নীচে নালাটার কাছে এসেছে অমনি ছুটতে ছুটতে এসেছিল আইজ্যাক। হাঁফাতে হাঁফাতে বলেছিল, শোন—এলিজার বুড়ো বয়সে বাবার ভিমরতি ধরেছে—খবরদার হিদেনদের মেয়ে এনো না কিন্তু—বাবা বললেও আমি তাকে কিছুতেই সাদী করবো না—দারুণ যন্ত্রণায় তার চোখ ফেটে জল এসে পড়েছিল। কিন্তু—

গ্যালিলির স্থলবুন পাহাড়ের চড়াইতে কেবল উঠতে শুরু করেছে—

এ—লি—জা—র—সাঁ সাঁ বাতাসে ভেসে এল আইজ্যাকের হাঁক। কাছে এল। লক্ষ্য করল—কিছুক্ষণ আগের গোমড়া মুখখানায় হাসি ঝিকমিক করছেন। কে জানে এত খুশির কি হল!

শোন এলিজার আজই ভোররাত্রে অদ্ভুত একটি মেয়ের স্বপ্ন দেখেছি, বলল, আইজ্যাক। কয়েকমুহূর্ত মাথা নীচু করে পাহাড়ী পথের পাথরের দিকে তাকিয়ে কি ভাবলো আবার খুব মৃদু গলায় বলল, তোকে বলি বলি করেও বলি নি। তুই যদি বাবাকে বলে দিস—

তোমার স্বপ্নের কথাটাই বলো—না। তাহলে আমার সুবিধা হয়—

বলব রে এলিজার—বলব বলেই তো ছুটে এসেছি—তীব্র আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে হাত পা নেড়ে আইজ্যাক বলেছিল তার স্বপ্নের মেয়ের বিবরণ!

বড় বিচিত্র সেই মেয়ে!

তার মনে হয়েছিল যেন দুইদিক থেকে দুটো তীক্ষ্ণধার তীর এসে বিঁধে

গিয়েছে তার পাঁজরে। তার মনিবের হুকুম মত সোজা মেসোপটেমিয়ায় গিয়ে নাহোরদের সুন্দরী একটা মেয়ে নিয়ে যাবে, না দেশে দেশে ঘুরে তাঁর ছেলের স্বপ্নের সেই আশ্চর্য কনে খুঁজে বেড়াবে! আরে বাপু—স্বপ্ন—স্বপ্নই, স্বপ্ন কখনো সত্যি হয়? কে তাকে বোঝাবে সেসব।

ডিং—ডং—ডিং—ডং—উটের গলায় ঘণ্টা বাজছে। আর সেই ক্ষীণ আওয়াজ মরুভূমির শাঁ শাঁ বাতাসের একটানা গর্জনের শব্দের ভেতরে তলিয়ে যাচ্ছে। বেলা পড়ে আসছে। কিন্তু এখনো আকাশে বাতাসে আর এই অন্তহীন বালুর সমুদ্রে যেন আগুনের হোলি খেলা চলেছে। আর চারিদিকের দারুণ দাবদাহের মতই তীব্র একটা যন্ত্রণায় জ্বলে যাচ্ছে এলিজারের মাথার ভেতরটা।

কোন মেয়ে দীঘল, না, ছোটখাটো আর সেই দেহে স্বাস্থ্য আর যৌবন কতটা প্রখর হয়ে জেগে রয়েছে; তার মুখখানা চাঁদের মত গোল, না একটু লম্বাটে আর সেই মুখে কতটা পরিমাণে কমনীয়তা মাখানো আছে—সেসব দেখা যায়, বুঝতে পারা যায়! কিন্তু কোন মেয়ে আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা দেখে আনন্দে মত্ত হয়ে চুল এলো করে ময়ূরীর মত নাচতে শুরু করবে কিম্বা তারই রক্তে আর ঘামে পুষ্ট সবুজ দ্রাক্ষাকুঞ্জের দিকে তাকিয়ে বিভোর হয়ে বসে থাকবে বা এলিজারের দেখা সেই স্বপ্নের মেয়েটির মত বিচিত্র ও রহস্যময় কাণ্ড করে বসবে, তা কেমন করে জানবে? কোথায়, কোন সুন্দরী মেয়ে অকারণ খেয়ালে কখন কি করছে তা জানতে হলে তো ওদের পিছু পিছু গোয়েন্দার মত ঘুর ঘুর করতে হয়। আর বিদেশ বিভূঁইতে এসে তা করলে আর দেখতে হবে না। বেঘোরে প্রাণটা যাবে আর কি। তার বুকের পাঁজর কাঁপিয়ে একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস মরুবাতাসে বিলীন হয়ে গেল। অস্ফুটস্বরে বলল এলিজার, জীবনে এমন সঙ্কটে পড়ি নি—হে সদা প্রভু জীহোভা আমাকে এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার করো—

ওহে এ—লি—জা—র—তোমার গাধাগুলোকে একটু দেখো—কাফিলার এক বণিক হেঁকে বলল, পিঠের বোঝা কমিয়ে দাও—

সত্যিই চার চারটি গাধার পিঠ বোঝার ভারে ধনুকের মত বেঁকে গিয়েছে। হবে না, কম জিনিস আছে এক একটা ঝুড়ির ভেতরে। কোনটায় আছে কনানের সরস মাটির গম আর যব, কোনটায় জর্ডন উপত্যকার রসালো জলপাই, মোয়াবের মালভূমির ডালিম আর ডুমুর, আবার কোনটায় আছে আম্মোনের বাদাম, সীম, মটর আর—সামনের দিকের গাধাটার পিঠের চারটি ঝুড়ি বোঝাই শুধু গিলিয়াদের উঁচু ডাঙার জমির রাশি রাশি মিষ্টি আঙুর।

তার মনিব ক্ষেতখামারীর কাজে খুব দড়ো। তাই তার ক্ষেতের ফসল দিয়েই পাঠিয়েছেন এদেশের প্রথা মত কন্যাপণের এই বিপুল সম্ভার।

শোন এলিজাব, নাহোরদের গায়ে তো আমারই রক্ত, মালিকের কথাগুলো তার মনের ভেতরে গুনগুন করে উঠল, তারাও প্রায় সকলেই কৃষিকাজে খুব পটু—তাই আইজ্যাকের শ্বশুর সম্বন্ধীরা দেখিস এসব ফসল পেয়ে খুশিই হবে। কিন্তু—

সব-ই তো হল। আসল জিনিসটি অর্থাৎ সেই কনে—মনিব এবং তাঁর ছেলের, দুজনের—দুই রকমের পছন্দের কনে সে কোথায় পাবে—কেমন করে পাবে? হাতজোড় করে দূরে পশ্চিমের আকাশের ডুবু—ডুবু সূর্যের গোল আলোর গোলকটির দিকে তাকিয়ে বলল, হে জীহোভা—এইরকম বিপদে যেন কেউ কখনো না পড়ে—

আপনি মিষ্টি স্বভাবের মেয়ের কথা বলছেন প্রভু, মালিককে জিজ্ঞাসা করেছিল সে। মনিব একটু হেসে বলেছিলেন, এই মরুর দেশে এতদিন আছিস —জানিস না—যে মেয়ে দূর দেশের তৃষ্ণার্ত মুসাফিরকে জল খাওয়াবে, সেই মেয়ে, তার চেহারা যেমন হোক, যে জাতেরই হোক না কেন, জানবি—লক্ষ্মী। সে সংসারে এলেই ক্ষেতে অঢেল ফসল হবে। কোন দুঃখ কষ্ট ধার পাশে ঘেসতে পারবে না—

কিন্তু প্রভু, নাহোরদের মেয়েরা যে পুতুল পুজা করে, আইজ্যাক যে কিছুতেই তাকে সাদী করবে না—এসব কথা মুখে এসে গিয়েছিল। কিন্তু বলল না। বলে লাভ নেই। শুভকাজে যাওয়ার আগে এসব বলে প্রভুর মনে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে কী হবে—

দিন কাটে। মাস যায়। এলিজাবের কাফিলা পেরিয়ে যায় মরুভূমি। তার নজরে পড়ে প্রকৃতির সেই রুক্ষ, কঠোর রুদ্র রূপটা কেমন ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। দূরে-বহুদূরে দেখা যায় দিগন্তের সীমায় ঝাপসা কুয়াশার ভেতরে যেন উঁকি দিচ্ছে এক টুকরো কাজল কালো অন্ধকারের মত ইউফ্রেতিস উপত্যকার ঘন সবুজের আভাস। এখান থেকে আরও দশদিনের পথ।

এদিকে আইজ্যাক মোরিয়া পাহাড়ের বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। বিষণ্ন মুখখানা দুশ্চিন্তার ভারে থমথম করে। এলিজাব কি তার সেই অদ্ভুত স্বপ্নের বিচিত্র সেই মেয়ের সন্ধান পাবে। রাত্রি শেষের সেই তরল অন্ধকারে একটি দীর্ঘ ক্ষীণ ছায়াদেহ দ্রুত পায়ে চলেছে, বাতাসে ভাসছে তার অপরিসীম

রূপলাবণ্যে রমণীয় সেই দীর্ঘ তনুদেহের সৌরভ! ও কি আচ্ছন্নের মত চলেছে সেই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে নিশির ডাকে! সেও সেই আবছায়া অন্ধকারে নিজেকে লুকিয়ে তাকে অনুসরণ করছে। তারপরে—না—আর সে ভাবতে পারে না। বিচিত্র একটা আবেগে তার বুকের শিরা-উপশিরাগুলো টনটন করে!

একদিন পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে আইজ্যাক এল সেই বড় পাথরটার কাছে যেখানে তার বাবা বসে জীহোভার প্রার্থনা করেন। আর এইখানে এসে দাঁড়াতেই তার মনের ভেতরে আলোড়ন তুলল সুদূর বাল্যকালের এক ভয়ঙ্কর আর বীভৎস দুঃস্মৃতি—

একদিন অ্যাব্রাহাম বলল ছেলেকে, চল তোকে একটা খুব সুন্দর জায়গা দেখিয়ে নিয়ে আসি—

ছেলে আনন্দে নেচে উঠল। তখন আইজ্যাকের বয়স বছর দশেক হবে। সে লক্ষ্য করল, বাবা বেড়াতে যাচ্ছে, কিন্তু তার হাতে মস্ত বড় একটা কাটারি আর মোটা দাড় কেন? সে কোন প্রশ্ন করল না।

অ্যাব্রাহামের মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া। কিন্তু চোখ দুটো যেন কিসের প্রেরণায় জ্বল জ্বল করছে।

এই বড় পাথরটার কাছে এসে হঠাৎ বুকের ভেতরে ছেলেকে জড়িয়ে ধরল অ্যাব্রাহাম। আবেগে, উত্তেজনায় তার চোখে জল এসে পড়ল। অস্পষ্ট আর ঝাপসা গলায় বলল, বাবা, তুই তো জানিস সারাটা জীবন আমি বলেছি ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়—তিনি জীহোভা—ব্যাকুল হয়ে কত প্রার্থনা করেছি, কিন্তু কখনো সদাপ্রভু আমাকে দর্শন দেন নি—থেমে গেল অ্যাব্রাহাম। ছেলের মুখের দিকে কেমন জলভরা দুটো চোখের করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। অস্ফুটস্বরে বলল, বাবা, তোর চেয়ে বেশি প্রিয় তো সংসারে আমার আর কিছু নেই, তাই তোকে—বলি দেবো বাবা, দেখি তিনি আমাকে দর্শন দেন কি না—

আইজ্যাকের শরীরের ভেতরটা শির শির করে উঠল। কিন্তু অসম্ভব পিতৃভক্ত ছেলে। বলল, বাবা আমার কোন আপত্তি নেই—

অ্যাব্রাহাম ছেলেকে সেই পাথরটির ওপর শুইয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল। কিন্তু যে মুহূর্তে তীক্ষ্ণধার খড়্গ উদ্যত করল, অমনি ভোরের মেঘলা আকাশ আলোর বন্যায় ভেসে গেল। আর কে যেন সেই আলোর ভেতর থেকে বলে উঠল, ছেলের গায়ে হাত দিও না—কোন ক্ষতি করো না—আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হও অ্যাব্রাহাম—কথা শেষ হতেই আলোর ছটা মিলিয়ে গেল।

কাটারি ফেলে দিয়ে ছেলেকে তীব্র উল্লাসে বুকের ভেতরে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে বলল, জীহোভা—আমাকে দেখা দিয়েছেন রে—

সেই থেকে অ্যাব্রাহাম এই মোরিয়া পাহাড়ের নতুন নামকরণ করল জীহোভা-জীরেহ—তখুনি দূরে-বহুদূরে রক্তের সমুদ্রের ভেতর থেকে উঠে আসা সকালের সূর্যের দিকে তাকিয়ে কেমন ছাড়া ছাড়া গলায় বলেছিল, তোকে বলে রাখছি—আমি তোকে বলে রাখছি আমরা জীহোভার উপাসক, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের নাম হবে 'জু'। আর—একটু থামল অ্যাব্রাহাম। বড় বড় চোখ দুটোর দৃষ্টি কেমন সুদূর হয়ে উঠেছিল। আবার নিজের মনেই বলেছিল, আমি ইউফ্রেতিস তাইগ্রীস নদী পেরিয়ে এসেছি বলে—লোকে আমাকে বলে হীব্রু—কনান বা ইস্রেয়েলের বাসিন্দা আমাদের স্বজাতির নাম হবে হীব্রু—

এই হল তার বাবা। যেমন দুঃসাহসী, তেমনি দুর্দান্ত জেদী আর একগুঁয়ে। জীহোভা-ও স্বয়ং তাকে দেখা না দিয়ে পারেন নি! কিন্তু জীহোভার একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে তিনি কি না মূর্তিপূজারী ওই নাহোরদের মেয়ে আনতে পাঠালেন এলিজারকে—

তোর ব্যাপার কি রে? সামনে এসে দাঁড়ালো অ্যাব্রাহাম। চোখ দুটো কুঞ্চিত করে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, সারাদিন মন মরা হয়ে বনে বাদাড়ে ঘুরিস—

কোন কথা বলল না আইজ্যাক।

তোর মা-র মুখে শুনেছি, নাহোরদের মেয়ে বিয়ে করতে তোর খুব আপত্তি, একটু থেমে আবার বলল, দেখ—আমি যা বলেছি তা তোকে করতে হবে, কঠোর শোনালো তার কণ্ঠস্বর। সতর্ক করে দিয়ে আবার বলল, আমি যেন না দেখি মেয়েটিকে তুমি অবহেলা করেছো, বলেই মুসাফ (প্রার্থনা) করতে চলে গেল অ্যাব্রাহাম।

একটা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল আইজ্যাক।

তার মাথার ভেতরটা জ্বলে যেতে লাগল। মনের ভেতরে ভেসে উঠল তার সেই স্বপ্নের ক্ষীণ দীর্ঘতনু রমণী। তার চোখে মুখে কেমন আরাত্রিক পবিত্রতা! অনির্বচনীয় যৌবনলাবণ্যমাধুরী নিয়ে যেন কোন সুদূর নক্ষত্রলোক থেকে নেমে এসেছে সেই অপার্থিব নারী মূর্তি। আর তারই পাশাপাশি নাহোরদের গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট বিড়ালের মত যুবতী মেয়েগুলোর চেহারা মনে হতেই ঘৃণায় মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠল। কিন্তু—

কোন উপায় নেই। সেই মেয়েকে নিয়েই রাত্রিবাস করতে হবে। তার বাবার কানুন (আইন)—বিয়ে করা বউকে একটি রাত্রেও অন্য জায়গায় রাখা চলবে না—প্রতিদিন তাকে অঙ্কশায়িনী করতে হবে। তার বুকের ভেতরটা পাথরের মত ভার হয়ে উঠল।

সিরিয়ার মরুভূমি শেষ হল।

এলিজারও পৌঁছে গেল মেসোপটেমিয়ায়। তাইগ্রীস আর ইউফ্রেতিস নদীর দুর্বার জলধারা যেন তর্জনী তুলে শাসন করে মরুভূমিকে থামিয়ে দিয়েছে ঠিক দেশের সীমান্তে। সুজলা সুফলা দেশ। দূরে দূরে ওক, লরেল আর উইলো গাছ দিয়ে ঘেরা এক একটি গ্রাম! যেদিকে তাকাও বাতাসে মাথা নাড়ছে সারিসারি খেজুর গাছ! পাহাড়ের গায়ে ঘনসবুজের ছবির মত দ্রাক্ষাকুঞ্জ।

একে ওকে জিজ্ঞাসা করে এলিজার জানতে পারল, চারিদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা কিরকুক গ্রামে না কি নাহোরেরা বাস করে। সে এল কিরকুকে।

বেলা পড়ে আসছে। হঠাৎ এলিজারের নজরে পড়ল এক ঝাঁক রঙীন প্রজাপতির মত মেয়েরা ধীর পায়ে জল আনতে চলেছে। দুরু দুরু কেঁপে উঠল এলিজারের বুক। মনিবের কথামত মিলে যাচ্ছে—সব মিলে যাচ্ছে—

এলিজার পড়ি কি মরি করে ছুটল সেদিকে। উত্তেজনার ঝড় বয়ে চলেছে তার মাথার ভেতরে। যদি মেয়েদের ভেতর থেকে কেউ-ই তার দিকে এগিয়ে না আসে ; তাকে যদি জল না দেয়।

কুয়ো থেকে কিছুদূরে ওক গাছের নীচে বসে রইল এলিজার। বাতাসে ভাসছে তাদের চুড়ির রিনিঠিনি আওয়াজ। জলতরঙ্গের মিষ্টি শব্দ ছড়িয়ে তারা খিলখিল করে হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ছে। জল নিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একজন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওড়নার আড়াল থেকে উৎসুক চোখে তার দিকে তাকিয়ে অস্পষ্ট গলায় বলল, আপনার কি খুব পিপাসা পেয়েছে—জল খাবেন ? যেমন মিষ্টি তার গলার স্বর তেমনি ফুটফুটে সুন্দর চেহারা। বড় বড় আর ঘন কালো ডাগর দুটো চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে যেন টলমল করছে গভীর মমতা।

সে কুয়ো থেকে জল তুলে শুধু তাকে নয়, তার সহযাত্রীদের এবং ক্লান্ত অবসন্ন জানোয়ারগুলোকে পর্যন্ত খাওয়ালো। তার বুকের ভেতরটা গুরু গুরু করে উঠল। নিশ্চয়-নিশ্চয়ই এ মেয়ে—মনিবের সেই মিষ্টি মেয়ে না হয়েই যায় না।

কিন্তু আইজ্যাকের স্বপ্ন? জলে যেতে লাগল তার মাথার ভেতরটা। মূর্তিপূজার এই দেশের মেয়ে নিয়ে গেলে সে খুনোখুনি করবে। কিন্তু ওর উত্তুঙ্গ বক্ষদেশে সবুজ কাঁচুলির বন্ধনে গতিহারা সেই একজোড়া দুরন্ত গ্রহের মাঝখানে—সেই গোপন প্রদেশে কি আছে—কেমন করে—কি ভাবে তা বুঝবে? সে যে অসম্ভব। কী অদ্ভুত—কী সাংঘাতিক আর কী বিচিত্র স্বপ্ন দেখেছে আইজ্যাক। হে জীহোভা-হে সদাপ্রভু দেখো, যেন দুইদিকই রক্ষা হয় —মনে মনে যন্ত্রণায় জলে যেতে যেতেও এলিজার আকুল প্রার্থনা জানাল।

সেই অপূর্ব সুন্দরী তন্বী মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম?

রেবেকা।

বাঃ বেশ নাম। আজ রাতের মত তোমাদের বাড়িতে একটু আশ্রয় পেতে পারি?

নিশ্চয়ই—মেহমানদের আলাদা ঘর আছে, বলতে বলতেই বনহরিণীর মত দ্রুত পায়ে ছুটল বাড়ির দিকে।

তারপরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত। অ্যাব্রাহাম এবং আইজ্যাকের কথা শুনে এবং নানারকমের মূল্যবান সামগ্রীর উপঢৌকন পেয়ে খুব খুশি হয়েছিল রেবেকার দাদা লেবান। এলিজারের প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দিয়েছিল। পরদিনই রেবেকাকে নিয়ে আবার রওনা হয়েছিল এলিজার।

গ্যালিলি জেলার কনান গ্রামের কাছে আসতেই দেখা গেল, শেষ সূর্যের আলোয় আঁকা তরুণ দেবদারুর মত দীর্ঘ আর বলিষ্ঠ এক যুবক পাহাড়ের চূড়োয় দাঁড়িয়ে আছে। দুরুদুরু কেঁপে উঠল এলিজারের বুক। ওদিকে আসমানী রঙের ওড়নার আড়ালে সুর্মাটানা ডাগর কালো চোখদুটো উৎসাহে আর আগ্রহে প্রদীপের মত জ্বলতে লাগল। ধীরে ধীরে দূরদেশের সেই যৌবনবতী সুন্দরীকে বহন করে কাফিলা অ্যাব্রাহামের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

রেবেকার সেই আশ্চর্য সুন্দর মুখশ্রী দেখে অ্যাব্রাহামের চোখের দৃষ্টি মুগ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু আইজ্যাক বাপের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করে বসল, কোন দেশের মেয়ে এনেছ এলিজার?

—মেসোপটেমিয়ার নাহোরদের—

কোন কথা বলল না আইজ্যাক। বাবার মুখের দিকে কেমন করুণ চোখে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে বলল, আমি—আমি ওকে বিয়ে করতে পারব না, বলেই অশান্ত আর বিক্ষুব্ধ একটা ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল।

কঠোর হয়ে উঠল অ্যাব্রাহামের মুখখানা। আর রেবেকার চোখের সামনে দপ করে নিভে গেল সূর্যের আলো।

এলিজারের মনে হল, আইজ্যাকের সেই বিচিত্র স্বপ্নের কথা। আরে গোঁয়ার গোবিন্দ ছেলে। সুন্দরী যুবতী মেয়ে এনে দিয়েছি। তাকে বিয়ে কর। ভাবভালবাসা হোক। বাইরে থেকে বিচার না করে ওর মনটাকে বুঝতে চেষ্টা কর। তারপর তুই তোর স্বপ্নের সঙ্গে ওকে মিলিয়ে দেখ। ক্ষেতে বীজ বুনলেই কি ফসল উপছে পড়ে? মাটি কেটে কেটে জল দিয়ে মাখনের মত নরম করতে হয়, করতে হয় অনেক যত্ন-আত্যি তবেই না ফসলের অঙ্কুর দেখা যায়। তুইও সেরকম কর—

অ্যাব্রাহাম কিন্তু কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে রেবেকার সঙ্গেই ছেলের বিয়ে দিয়ে দিল। কিন্তু আইজ্যাকের মনে কোন উল্লাস নেই, আগ্রহ নেই। এমন কি তাইগ্রীস-ইউফ্রেতিসের দেশের খরযৌবনা রূপসী মেয়েটি সম্বন্ধে নেই তার বিন্দুমাত্র কৌতূহল! কিন্তু—

আশ্চর্য মেয়ে রেবেকা! স্বামীর এই নিষ্ঠুর অবহেলার জন্য হয়তো তার বুকের ভেতরে পাক দিয়ে ওঠে ছলো ছলো কান্নার ঢেউ, কিন্তু মনের যন্ত্রণা চেপে সারাদিন শাশুড়ী, সারার ঘর গেরস্থালীর কাজে সাহায্য করে। আবার কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছুটে যায় অ্যাব্রাহামের কাছে। বলে, বাবা—ঠাণ্ডা বাতাস বইছে চলুন, গম আর যবগুলো ঝাড়াই বাছাই করে ফেলি—

অ্যাব্রাহাম কিছু বলার আগেই এক রঙীন মেরুমরালীর মত যেন বাতাসের ওপরে পা ফেলে ছুটে চলে যায় বাইরের উঠানে গমের স্তূপের কাছে। চাকাহীন স্লেজ গাড়ির ওপর নিজেই উঠে বসে। বলদে টানা গাড়িটাকে গমের ওপর দিয়ে চক্রাকারে চালাতে থাকে। আর গমের খোসা ছাড়ানো হয়ে যায়।*

আর মুগ্ধ হয়ে যায় অ্যাব্রাহামের চোখের দৃষ্টি।

কিন্তু আইজ্যাকের চোখ থেকে ঘৃণা ঠিকরে পড়ে। বাবাকে খুশি করে তার মনটাকে জয় করার সুন্দর ছলনা!

দিনের বেলায় কাজকর্মে মগ্ন হয়ে বেশ আনন্দেই কাটে কিন্তু রাত্রি নামলেই তার মাথার ভেতরটা যেন ভারী—খুব ভারী হয়ে ওঠে। আর কেমন জর জর অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে যায় তার সারা শরীর।

---

* বাইবেলের দেশের সুপ্রাচীনকালের অধিবাসী হীব্রুদের কৃষিকাজের নৈপুণ্য ছিল সহজাত। পুরাতন নিয়মের বাইবেলে বর্ণিত তাদের শস্য বাছাইয়ের পদ্ধতি থেকে উপরোক্ত বিবরণ দেওয়া হল—**Encyclopedea of Bible Life—P. 20.**

সেদিন সংসারে কাজ শেষ করে ক্লান্ত আর অবসন্ন হয়ে যেই ঘরে এল, আইজ্যাক অমনি বিদ্যুতস্পৃষ্টের মত শয্যা থেকে নেমে দাঁড়ালো।

কি হয়েছে বলো তো? আমি কি অস্পৃশ্য—আমি কি তোমার যোগ্য নই—এসব কথা তার মাথার ভেতরে গরমজলের মত টগবগ করে ফুটছিল। কিন্তু কিছু বলল না। মরিয়া হয়ে আইজ্যাকের সামনে এল। তার ঘন কালো আয়ত দুটো চোখের করুণ দৃষ্টি যেন নিঃশব্দে বলতে লাগল, যারা পৌত্তলিক নয়, তাদের মেয়েদের সঙ্গে আমার পার্থক্য কোথায়? তাদের যেমন তেমনি আমার দেহেও তো উদগ্র যৌবনচিহ্নের পসরাগুলো থরে থরে সাজানো আছে—

কিন্তু আশ্চর্য! আইজ্যাকের নিরাসক্ত আর স্পৃহাহীন দুটো চোখের দৃষ্টিতে কোন চাঞ্চল্য জাগল না। ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস রেবেকার বুকের ভেতরটা কাঁপিয়ে গোপনে মিলিয়ে গেল। তার মনে হল, তাদের দেশের কোন পাষানের দেবমূর্তির সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে, তেমনি কঠিন, নিষ্ঠুর আর বেদনাহীন।

নিদারুণ একটা গ্লানির অপচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার মন। মনে হল তার রূপ-যৌবনের অপমান, নারীত্বের অপমান। তবুও—একবার শেষ চেষ্টা করতেই যেন যন্ত্রণায় জলে যেতে যেতেও মুখে মোহমাখা হাসি ফুটিয়ে আইজ্যাকের হাতদুটো ধরে বলল, চল শোবে—

না—না, তুমি আমাকে ছোঁবে না—কখনো আসবে না আমার কাছে, এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দূরে সরে গেল আইজ্যাক। আর নিজের মনেই যেন কোন দুঃস্বপ্নের ঘোরে বিড় বিড় করে বলল, তোমরা নাহোররা তোমাদের অগুনতি দেবতাকে খুশি করার জন্য পশুবলি দাও—সেই তাজা রক্ত গায়ে মেখে তোমরা আদিম মানুষের মত উল্লাসে নৃত্য করো। আর তাছাড়া—তোমাদের মেয়েরা—

কি—আমাদের মেয়েরা কি? বলো থামলে কেন? মর্মান্তিক যন্ত্রণায় জলেপুড়ে বলল রেবেকা। কিন্তু তার কান্নার আবেগে করুণ আর দারুণ যন্ত্রণায় দুমড়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে আইজ্যাক নিজেকে সংযত করল। বলল না, কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিকদের মেয়েদের সম্বন্ধে সেই ভয়ঙ্কর কথাটা—

কোন কথা বলল না আইজ্যাক। আগুনে পোড়া একটা সাপের মত ছটফট করতে করতে বাইরে ঘন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর জমাট অন্ধকার সেই ঘরের এক কোণে একটা প্রেতিনীর মত বসে

রইল রেবেকা। বিষাক্ত একটা পোকার মত তার মাথার ভেতরটা কুরে কুরে খেয়ে ফেলতে লাগল দুঃসহ একটা দুশ্চিন্তা—তার স্বামী তাকে সন্দেহ করছে! কেন—নাহোরদেব মেয়েরা কি মূর্তিপূজা করে বলেই দুশ্চরিত্র হয়েযায়।

দূরে নিশিরাতের মরা মাছের আঁশের মত আকাশে যেন শকুনের এক একটা তীক্ষ্ণ চোখের মত জ্বলছে তারাগুলো। রেবেকার মনে হল, তারাগুলো যেন শূঁচের মত বিঁধে আছে তার মাথার ভেতরে।

প্রহরে প্রহরে রাত গড়িয়ে চলল। দূরে পশ্চিমে প্রভু গ্যালিলিব পাহাড়ের গায়ে লেগেছে তামাটে জ্যোৎস্নার আভা।

আসব না, আসব না করেও আইজ্যাক আবার নিঃশব্দ পায়ে ঘরে এসে দাঁড়ালো। শ্বেতশুভ্র শয্যায় একটি রঙীন ফুলের ছিন্ন পাপড়ির মত গা এলিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে রেবেকা। তার প্রায় স্বচ্ছ নীলাভ রঙের রেশমের কুর্তার আড়ালে দৃঢ় কঠিন দুটো স্তনের লালচে আভা। সুপুষ্ট গমের শীষের মত দীর্ঘ উদ্ধত দেহছন্দ গোলাপী গালে, শুকিয়ে যাওয়া চোখের জলের রেখা। আইজ্যাকের স্নায়ুকে মাতাল করে তুলল। প্রচণ্ড একটা ঝড় ভেঙে পড়ল বুকের ভেতরে। বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল কপালে। কিন্তু—

না—না—তার সমস্ত সত্তাটা যেন আর্তনাদ করে উঠল, তার স্বপ্নের সেই মেয়ের সঙ্গে কোন মিল নেই—মিল হতে পারে না—

এই বিশাল আকাশ আর গ্রহ-নক্ষত্রেব নিয়ন্তা, পাথরের প্রতিমার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি শক্তিশালী সেই সদাপ্রভু বা জীহোভার উপাসকদের মত মহৎ ও বিশাল অনুভূতির ভেতরে আবিষ্ট হয়ে যাওয়ার মত মানসিকতা কি করে পাবে এই পৌত্তলিকের মেয়ে?

আবার গুটি গুটি পায়ে কাছে এল। আর ক্ষীণ আলোয় যেমন করে পুঁথি পড়ে, তেমনি করে রেবেকার মুখখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল কয়েকমুহূর্ত।

কেমন উইলো গাছের পাতার মত নিটোল মসৃণ মুখ! কিন্তু—নিষ্পাপ কি? সে শুনেছে মূর্তিপূজারীদের মেয়েরা আদিম মানবীর মত সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে চুল এলো করে নেচে নেচে বর্ষাকে আমন্ত্রণ জানায়। আর মরাশকুনের হাড়, ইঁদুরের মাটি, তেল, সিঁদুর আরও কত কি সব নিয়ে কুমারী মেয়েদের দিয়ে তারা যাদুবিদ্যা দেখিয়ে দেবতাকে প্রসন্ন করে। আরও অনেক-অনেক নোংরা আর কুৎসিত কাজ তারা ওই মেয়েদের দিয়েই করিয়ে নেয়। কে জানে—কে বলতে পারবে ওর ওই অপরিসীম রূপলাবণ্যে রমণীয় দেহটায় কত পাঁক—কত আবিলতা লেগে রয়েছে।

সর্বসাক্ষী আকাশে সূর্য ওঠে। বিগত রাত্রির অপ্রীতিকর ঘটনাটাকে একটা দুঃস্বপ্নের মতই মন থেকে মুছে ফেলে দিয়ে ভেড়ার পাল নিয়ে রেবেকা চলে যায় দূরে পাহাড়ের নীচে ঘন সবুজের ছবির মত প্রান্তরে। তার ভেতরে কোথায় যেন আছে এক অদৃশ্য দৃঢ়তার প্রলেপ, আছে একটা জ্বলন্ত বিশ্বাস—একদিন সন্দেহের কুয়াশা কেটে যাবে আর ঠিক স্বামীর মনে জায়গা করে নেবে।

একটা বিশাল ওক গাছের নীচে বসে থাকে রেবেকা। স্থানীয় কনানীয়রা মাঠে মাঠে চাষ করছে গম আর যব—"মর্তের চিত্তবলসাধক ভক্ষ্য," তার শ্বশুর বলেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদ-ই মানুষ পেয়েছে এই দুইটা ফসল। আর আঙুরকে "মর্তের চিত্তানন্দজনক দ্রাক্ষারস" এবং জলপাই তৈলকে বলেন 'মুখের প্রফুল্লতাজনক তৈল'। কিন্তু আশ্চর্য, যে ঈশ্বর আকাশ থেকে অঝোর ধারায় বৃষ্টি আর সূর্যালোক দিয়ে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি জোগাচ্ছেন তাঁর পূজা করলেই অপরাধ? কে জানে এরা বাপ-ছেলে কোন মূর্তি সামনে না রেখে ধু ধু আকাশের দিকে তাকিয়ে পূজো করে কি করে? কতদিন—কতবার বলেছে তার শ্বশুরকে, আপনি কেমন করে ঈশ্বরের আরাধনা করেন—একদিন দেখাবেন, নিয়ে যাবেন পাহাড়ে—

বুড়ো একবারে হাঁ হাঁ করে ওঠে, যেন আগুনের ছ্যাঁকা লেগেছে। দেবতার আরাধনা করবে তা এত ঢাক ঢাক গুড়গুড় কেন? সে এদের মতিগতি বুঝতে পারে না। জ্বলে যায় মাথার ভেতরটা। এমন সময়ে—

হঠাৎ তার নজরে পড়ল দূরে মোরিয়া পাহাড়ের গায়ে ঘনসন্নিবদ্ধ সাইপ্রাস আর উইলো গাছের নিবিড় জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলেছেন এক দীর্ঘ ছায়ামূর্তি। নিশ্চয়ই জীহোভার ধ্যান করতে চলেছেন বাবা। দেখি তো কেমন করে সেই নিরাকার ঈশ্বরের পূজো করে।

সকালের রোদ পুষ্পের আলোর মত ঝরে পড়ছে অ্যাব্রাহামের মুখে। রেশমের জোব্বার ওপরে শোভা পাচ্ছে এক সুদৃশ্য টাল্লিট (ভোরের প্রার্থনার সময়ে ব্যবহৃত শাল) পবিত্র সেই বস্ত্রাবরণের টিজিটজিট (চারটি কোণ) সোনার জরি দিয়ে মোড়া। তার হাতে দুটো কমলালেবু, আর উইলো এবং তালগাছের ছোট ছোট কয়েকটি শাখা। কিন্তু বাতাসে ভাসছে কিসের উগ্র সুগন্ধ? মনে হচ্ছে, বৃদ্ধের জোব্বার ভেতরে আছে সাদা গোলাপের সুগন্ধী নির্যাস! কে জানে—হয়তো এসবই এদের ঈশ্বরের পুজোর উপাচার।

একটা বড় ওক গাছের আড়ালে লুকিয়ে রেবেকা দেখল, আশ্চর্য! চারিদিকে নিবিড় বনভূমির মাঝখানে শ্বেতপাথরে বাঁধানো একটা উঁচু বেদী।

বেদীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসল অ্যাব্রাহাম। উইলো আর তালগাছের ডাল ইত্যাদি পূজার অর্ঘ বেদীর দুইদিকে পরমযত্নে সাজিয়ে রাখল। আর তারপরেই আকাশের দিকে তাকিয়ে চোখদুটো বুজে—ধ্যানস্থ হয়ে গেল।

মূর্তি নেই, নেই বাজনা, নেই পশুবলি, এ কেমন ধরনের পুজো—নিতান্ত দীন এই আয়োজনে কী ঈশ্বর খুশি হতে পারেন?

খুট—চারিদিকের নিস্তব্ধতার ভেতরে হঠাৎ একটা আওয়াজ হল—অ্যাব্রাহামের মনে হল পাথরের ওপর দিয়ে যেতে যেতে কারো যেন পা হড়কে গেল। কেউ নিশ্চয়ই হয়তো কনানীয়দেরই কোন গুপ্তচর তাকে লক্ষ্য করছে। ঈশ্বরের আরাধনার বিচিত্র এই প্রক্রিয়া দেখে এখুনি—এখুনি হয়তো তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত ঘনীভূত হয়ে উঠবে।

কে—কে—ওখানে? চাপা গলায় চীৎকার করে উঠল অ্যাব্রাহাম। ছুটে এসে দাঁড়ালো উঁচু টিলার ওপরে। তার নজরে পড়ল দূরে-বহুদূরে গাঢ় লাল ওড়নার প্রান্তভাগ যেন বিদ্যুতের উগ্র বঙ্কিম রেখার মতই একবার ঝিলিক দিয়েই আবার নিবিড় সবুজ বনদেহে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রেবেকা! অস্ফুট একটা স্বর বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে। আর চাপা হাসির আলোয় উজ্জল হয়ে উঠল তার দাড়ি গোঁফে সমাচ্ছন্ন মুখখানা।

এসব-ই জীহোভার কৃপা! অ্যাব্রাহামের মনে হল, রেবেকা পৌত্তলিকদের মেয়ে হলেও এখানে আসবে—আসতেই হবে—সে একদিন কোন সুদূর ব্যাবিলনের জনপদ 'আর' এর নিশ্চিন্ত জীবনের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে অনিশ্চয়তার অন্ধকারে পা বাড়িয়েছিল। আর মেসোপটেমিয়া থেকে আরও কত দেশ-দেশান্তর পরিক্রমা করে এসেছে গ্যালিলির এই কনানে। তার সহায় সম্বল কিছুই ছিল না। তার পাথেয় ছিল শুধু—বিশ্বাস—

জীহোভার অস্তিত্বে গভীর ও জলন্ত বিশ্বাস।

যাত্রার ঠিক আগের মুহূর্তে সারা আকাশ অপার্থিব আলোয় ভেসে গিয়েছিল। আর সেই দিকপ্লাবী আলোর সমুদ্রে যেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষের দেহাবয়ব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। আর বহু—বহুদূর দিগন্ত থেকে যেন বাতাসের সওয়ার হয়ে ভেসে এসেছিল তাঁর মধুস্রাবী কণ্ঠ—

অ্যাব্রাহাম তুমি নতুন একটা দেশের অধীশ্বর হবে; তোমার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুখী হবে, সমৃদ্ধ হবে। আর তারা দীন দুঃখী মানুষের প্রতি উদারতায়, সেবায় এত মহৎ হবে যে প্রতিনিয়তই তাদের ওপরে বর্ষিত হবে আমার আশীর্বাদ—অনাগতকালের আলোকোজ্জল এই প্রতিশ্রুতিগুলোই যে স্বয়ং

জীহোভা দিয়েছিলেন। তার উত্তরসূরী আইজ্যাক থেকেই তো প্রজন্মের পর প্রজন্মের অবিচ্ছিন্ন স্রোতধারা প্রবাহিত হয়ে যাবে পৃথিবীর দিকে দিকে। আইজ্যাককে যে সুখী হতেই হবে। জীহোভারই নির্দেশে নাহোরের মেয়ে রেবেকাকে নিয়ে এসেছে! নাহোরদের মেয়েরা যেমন নমনীয়, তেমনি দৃঢ়। সে একদিন আইজ্যাকের মন থেকে নিদারুণ বিরাগ আর ঘৃণার অপচ্ছায়া নিঃশেষে মুছে দেবে—

কিন্তু—

জীহোভার বরপুত্র বা সান অফ গড হলে কি হয়। অ্যাব্রাহাম যা ভাবে, তা হয় না—

দেখ—তুমি কি ভেবেছো বল তো, রুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়ল সারা, কোথায় থেকে একটা পুতুল পূজারীদের মেয়ে এনে ছেলেটার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে, একটু থেমে অ্যাব্রাহামের পাথরের মত শরীরটার দিকে নির্বিকার তাকিয়ে আবার বিষাক্ত গলায় বলল, ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছো একবার—

কোন কথা বলল না অ্যাব্রাহাম।

দেখল, সারার ক্রুদ্ধ মূর্তির আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে আইজ্যাক। যেন একটা অবোধ শিশু বিপদের আশঙ্কা দেখে মায়ের আঁচলের নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছে।

জানো, তোমার আদরের ওই পুত্রবধূটি ভেড়া চড়াতে গিয়ে পাহাড়ের হালাম (পথ) কোথায় যায়, চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সারা, আমার বিশ্বাস ম্যাগনেটো গোলাপে সিঁদুর মাখিয়ে নিশ্চয়ই পৌত্তলিক মেয়েদের মত স্বামীকে বশ করার জন্য তুকতাক করে, বলতে বলতে হঠাৎ তার গলা খাদে নেমে এল। আর কান্নার ইঙ্গিতে কেমন কুৎসিৎ হয়ে উঠল তার মুখখানা। অ্যাব্রাহামের হাতদুটো ধরে কান্নায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা আর অস্পষ্ট গলায় বলল, আমার ছেলে— আমার আইজ্যাকের—যে ক্ষতি হবে গো—

চকিতে অ্যাব্রাহামের মনের ভেতরে ভেসে উঠল, সেই নিবিড় সবুজ বনদেহে বিদ্যুতের উগ্র রক্তবর্ণ রেখার মত মিলিয়ে যাওয়া দোপাট্টা।

রেবেকা কোথায় যায়, আমি জানি। তোমার ছেলের কোন ক্ষতি হবে না—হতে পারে না—এসব কথাই বলতে চেয়েছিল অ্যাব্রাহাম। কিন্তু বলল না। সারার মত কাণ্ডজ্ঞানহীন আবেগ সর্বস্ব মেয়েমানুষকে সেসব বলে কোন লাভ নেই।

রেবেকা কোথায়? শুধু অস্ফুটস্বরে বলল।

আর এইবার—এইবার নির্জন ঘরের অন্ধকার কোণে দীপশিখার মত কেঁপে উঠল রেবেকা।

দেখো হয়তো ওই ঘরে মুখ গোমড়া করে বসে আছে, ঝাঁঝিয়ে বলল সারা। আবার অ্যাব্রাহামের কাছে এল। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস ফিস করে বলল, শোন আইজ্যাক বলছিল, পৌত্তলিকরা কিন্তু তাদের দেবতাকে খুশি করাব জন্য মেয়েদের দিয়ে—বলেই আইজ্যাক যেমন, তেমনি সারাও করল সেই ভয়ঙ্কর কুৎসিত ইঙ্গিত—

খবরদার এসব বলবে না—কঠিন হয়ে উঠল অ্যাব্রাহামের মুখখানা। আকাশের দিকে চোখ দুটো ছড়িয়ে দিয়ে বলল, তোমরা জানো—জীহোভার নির্দেশ ছাড়া আমি কোন কাজ করি না—

আর দূরে সেই অন্ধকার নির্জন ঘরে একটা বারুদের স্তূপের ওপরে বসে রইল রেবেকা। এরা মা-ছেলে কি সন্দেহ করছে; কি করেছে সে? আজ একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে—দুর্জয় একটা সঙ্কল্পে কঠোর হয়ে উঠল তার মুখখানা।

আর সেইদিন-ই ঘটে গেল কাণ্ডটা। বিকেল থেকেই দূরে গ্যালিলির সাগর থেকে হু হু করে ছুটে আসছিল সমুদ্র বাতাস। আর চারিদিকের পাহাড়ে নিবিড় ওক আর লরেল গাছের পাতায় পাতায় আছড়ে পড়ছিল সেই শাঁ শাঁ বাতাসের আর্তনাদ। শরৎকালের এই ক্ষ্যাপা পশ্চিমা বাতাসে শুরু হয় বর্ষার অভিসার। এখুনি অনিবার্যভাবে ছুটে আসবে ভারী বৃষ্টির শব্দ অর্থাৎ ঈশ্বরের আশীর্বাদে শুরু হবে মুসলধারে বৃষ্টিতে "প্রথম বর্ষা। কনানীয়দের পাড়ায় পাড়ায় জেগে উঠল উল্লাস। তারা বৃষ্টির দেবতার পূজোয় মত্ত হয়ে উঠল। এই বৃষ্টিতেই অপর্যাপ্ত ফসলের সম্ভারে ভরে উঠবে শস্যক্ষেত্র। আর দিক-দিগন্তে ভূমিলক্ষ্মীর হাসি ছড়িয়ে পড়বে!

সত্যিই সন্ধে নামতে না নামতেই শুরু হল প্রবল বর্ষণ। রাত্রি যত গভীর হল, বৃষ্টির বেগও ততই বেড়ে চলল।

ধীর পায়ে মৃদুল গতি মরালীর মত রেবেকা এল তার ঘরে। আর বাতাসে ভেসে উঠল একটা মৃদু সৌরভ। তার পরণে রেশমের চওড়া ঢিলে পা-ওলা পায়জামা। গায়ে প্রায় স্বচ্ছ মিহি মসলিনের কুর্তা। আর তার আড়ালে টান টান আংগিয়ায় আবদ্ধ উদ্ধত স্তন যুগলের অপরূপ শোভায় যেন সাদর আমন্ত্রণের হাতছানি। মাথার ফিকে সবুজ রঙের ওড়নাটা সরিয়ে রেবেকা

সুগন্ধী ফুলের নির্যাস মিশ্রিত জলপাই তৈলের প্রলেপে উজ্জ্বল আর মসৃণ মুখখানা অবারিত করল। ডালিমের দানার মত ঠোঁটে ঝিলিমিলি হাসি ফুটিয়ে বলল আইজ্যাককে, কেমন সেজেছি বললে না ?

কোন কথা বলল না আইজ্যাক।

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে রেবেকা বলল, জিজ্ঞাসা করলে না—তোমার জানতে ইচ্ছা হল না, কেন সেজেছি—জানো, ঈশ্বরের আশীর্বাদে বছরের 'প্রথম বর্ষা' নেমেছে, অঢেল ফসল হবে, একটু থামল রেবেকা। আবার বাইরে একটানা বৃষ্টির শব্দকেও ছাপিয়ে কলকল করে বলল, আমাদের দেশে এই সময় মানুষ উৎসবে মত্ত হয়ে ওঠে—

তবে আর কি—তুমিও বিকচ্ছ হয়ে নাচতে শুরু কর, আইজ্যাকের চোখে ঘৃণা ঠিকরে পড়তে লাগল। মুখখানা বিকৃত করে বলল, তুমিও পাথরের মূর্তি তৈরী করে পূজা করতে শুরু করে দাও - বাবার সবচাইতে প্রিয় মেষটাকে বলি দাও—

কেন—কেন এসব বলছো আইজ্যাকের চওড়া বুকে মাথাটা ঘসতে ঘসতে নিদারুণ যন্ত্রণায় জ্বলে পুড়ে অস্ফুটস্বরে বলল, তুমি জানো না, স্বামীর ধর্মই মেয়েদের ধর্ম। তোমার ঈশ্বরই আমার ঈশ্বর—

আমি—আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না, দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল আইজ্যাক তুমি ভেড়ার পাল চরাতে গিয়ে পাহাড়ের জঙ্গলে কোথায় যাও তুমি —উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে লাগল সে। বলল, তুমি আমার নামে তুকতাক করে আমার—আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করছো—বৃষ্টি আর ঝড়ো বাতাসের মাতামাতির ভেতরে তার কথাগুলো আর্তনাদের মত শোনালো।

আশ্চর্য কোন ক্ষোভ নয়, উত্তেজনা নয়। মৃদু হাসির আভাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠল রেবেকার সুডৌল মুখখানা। আর কে জানে, কেন গভীর এক প্রশান্তিতে আবিষ্ট হয়ে গেল তার চেতনা। অস্ফুটস্বরে যেন নিজের মনেই বলল, কোথায় যাই, একদিন তোমরা জানবে—বলেই সেই আবেশ মাখানো মোহাচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে হাসিতে ঝলমল করে উঠল। আইজ্যাকের গালে একটা তপ্ত চুম্বন এঁকে দিয়ে বলল, এই বর্ষার রাত্রে তুমি কি আমার সঙ্গে শুধু ঝগড়াই করবে, আর বলতে বলতেই খুলে ফেলল মসলিনের সেই কুর্তা, খুলল আংগিয়া আর পায়জামা এবং রঙীন অন্তর্বাস। নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাবরণ করে নগ্ন দেহটাকে মত্ত আবেগে ঢেলে দিল আইজ্যাকের গায়ে।

ছিঃ ছিঃ—এসব কী অসভ্যতা করছো, দুহাতে চোখ ঢেকে বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠল আইজ্যাক।

না, অসভ্যতা নয়, দীর্ঘ নগ্নতনুর অপরিসীম সৌন্দর্য নিয়ে দৃপ্তভঙ্গীতে আইজ্যাকের সম্মুখে দাঁড়ালো। থেমে থেমে বলল, এটাই কাব্বালাহ (নিয়ম) স্ত্রী নিজের দেহটাকে ভোগের নৈবদ্যের মত সাজিয়ে স্বামীকে উজাড় করে দেবে, একটু থেমে আবার বলল, তোমারই বাবার কাসরুথ (আইন), স্বামী স্ত্রীকে সহবাস করতে হবে—আমার গর্ভে আসবে তোমার সন্তান—আবাব থামল। চোখদুটো জলে ভরে এল। অস্ফুট আর্তনাদের মত করে বলল, আজ পর্যন্ত —তুমি আমাকে একদিনও স্পর্শ করো নি—

কোন কথা বলল না আইজ্যাক। খরচোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, তাই বলে নির্লজ্জের মত যখন তখন উলঙ্গ হবে—একটু থেমে পিচ করে থুথু ফেলে গুজ গুজ করে বলল, তোমার বুঝি এসব অভ্যাস আছে—

কী! রুদ্ধ আক্রোশে সাপিনীর মত ফুঁসে উঠল রেবেকা। বলল, তুমি কি বলতে চাও—স্পষ্ট করে বলো—

তুমি শুনে রাখো—তাহলে, তোমাদের দেশে মন্দিরে তুমি নিশ্চয়ই দেবদাসী ছিলে—তোমাকে দিয়ে পুরোহিতরা বেশ্যাবৃত্তি করিয়েছে—বদ্ধ উন্মাদের মত চীৎকার করে বলল আইজ্যাক, তুমি নষ্ট মেয়েমানুষ—তুমি উচ্ছিষ্ট—

পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রেবেকা। তারপরে বেশবাস পরে মাথা নীচু করে যেই বেরোতে যাবে—অমনি—

এ কী—কোথায়—কোথায় যাচ্ছো তুমি—চীৎকার করে বলল আইজ্যাক।

কিন্তু তার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে, সেই দুর্যোগ রাত্রির ঘন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল রেবেকা।

সারা রাত তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও পাওয়া গেল না রেবেকাকে। ভয়ে শির শির করে উঠল আইজ্যাকের বুকের ভেতরটা—

মেয়েটি বোধ হয় পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মঘাতী হয়েছে। বিড় বিড় করে বলল সারা।

না—না—তা হতে পারে না, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল অ্যাব্রাহাম। কঠোর গলায় বলল, যেমন করে পারো—খুঁজে বের করো তাকে—একটু থেমে আবার স্ত্রী আর পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কতবার—কতবার বলেছি—তোমাদের—স্বয়ং জীহোভার নির্দেশে ওকে নিয়ে এসেছি—তোমরা আমাকে যেমন, তেমন জীহোভাকেও বিশ্বাস করো না—

বাবা—আমি ভুল করেছি—ক্ষমা করুন—বলেই ঝড়ের মত বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল আইজ্যাক।

কিছুক্ষণ পরে অ্যাব্রাহাম ও এলিজারকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বৃষ্টি ধোয়া আকাশে ভোরের রেখা জেগে উঠছে। ঘনজঙ্গলে সমাচ্ছন্ন গ্যালিলি পাহাড়ে, যেখানে রেবেকা মেষ চরাতো সেখানেও তাকে দেখতে পেল না আইজ্যাক। তাহলে কোথায়—কোথায় যেতে পারে সে—তার কানের কাছে বাজতে লাগল রেবেকার কথাগুলো—কোথায় যাই একদিন বুঝতে পারবে—

তাহলে কি জীহোভা—জেরিহ অর্থাৎ মোরিয়া পাহাড়ে। যেখানে তাকে বলি দিতে গিয়ে বাবা জ্যোতির্ময় পুরুষ সেই জীহোভার দর্শন পেয়েছিলেন আইজ্যাক বদ্ধ একটা উন্মাদের মত ছুটতে লাগল সেইদিকে। জঙ্গলাকীর্ণ সেই পাহাড়ের ঢালাচা দিয়ে উপরে যেতেই চমকে উঠল তার চোখের দৃষ্টি।

এ কী! এখানে আসার পরেই তার বাবা যেখানে শ্বেতপাথরে বাঁধানো বেদী তৈরী করেছিলেন সেই বেদীর সম্মুখে নতজানু হয়ে কে এক মনে ধ্যান করছে—কার এই ধ্যানস্থ মূর্তি।

কে—কে ওখানে? সভয়ে চীৎকার করে উঠল আইজ্যাক। এক পা এক পা করে কাছে এল। আর ধক করে উঠল তার বুকের ভেতরটা।

সকালের সূর্যের লাল আলোয় গোলকটা রেবেকার মাথার চারিদিকে জ্যোতিশিখার মত ফুটে রয়েছে। তার এক হাতে উইলো আর তালগাছের শাখা আর একহাতে কমলালেবুর অর্ঘ নিয়ে নিরাকার সদাপ্রভু জীহোভার স্তব করছে পৌত্তলিকদের মেয়ে?

আইজ্যাকের বুকের ভেতরে গুরু গুরু ঝড় ভেঙ্গে পড়ল। আলোড়িত হয়ে উঠল তার চেতনা—অনেক অনেকদিন আগে ঠিক এই স্বপ্নই তো দেখেছিল সে—

রেবেকা—আমাকে ক্ষমা করো, দীন একটা প্রার্থীর মত সেই তপস্বিনী মূর্তির কাছে মাটিতে বসে পড়ে বলল আইজ্যাক, রেবেকা—আমি আইজ্যাক—বলো আমাকে ক্ষমা করেছো—

দূরে একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে ফিস ফিস করে বলল এলিজার—এই স্বপ্নের কথাই আমাকে বলেছিল প্রভু—

ওদিকে আইজ্যাকের ব্যাকুল আবেদনে তপস্বিনীর চোখদুটো মেলে তাকিয়ে রইল। কেমন বেদনাচ্ছন্ন আর সকরুণ সে দৃষ্টি—

আমি ভুল করেছিলাম—ভুল করেছিলাম—রেবেকা—বলতে বলতেই উদ্দাম আবেগে তাকে বুকের ভেতরে জড়িয়ে ধরে আইজ্যাক কেমন ব্যাকুল করুণ কণ্ঠে বলল, তুমি কি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে রেবেকা।

না গো—না—আইজ্যাকের বুকের ওপরে মুখ রেখে তীব্র আবেগে আর বাদবাকী কথাগুলো বলতে পারল না। চোখের জলে আর হাসির আলোছায়ায় অন্ধ হয়ে এল রেবেকার দৃষ্টি।

রাত আর একটু গভীর হোক।

পশ্চিমের আকাশে একটু একটু করে হেলে পড়ুক চাঁদ। আরও—আরও নিশুতি হয়ে যাক চারিদিক।

তখন সে ঠিক আসবে। আসতেই হবে। সে যে তাকে ভালবাসে! গোয়ালঘরের পাশে খড় বিচালীর গাদায় হেলান দিয়ে প্রেতের মত দাঁড়িয়ে থাকে জ্যাকব আর তন্ময় হয়ে ভাবে—র‍্যাচেলের কথা। তার গোল মুখে নীল চোখে হাসি হাসি সরলতা। বাড়ন্ত গড়ন। খুশি উচ্ছল মেয়ে। সামান্য কোন কথাতে খিল খিল হাসিতে কিশোরী মেয়ের মত ভেঙে ভেঙে পড়ে! সেই উচ্ছ্বসিত হাসির ভেতরে ওর উদ্দাম প্রাণের ইশারা ফুটে ওঠে।

তারই পাশাপাশি তার মনের ভেতরে উঁকি দেয় আর একখানা মুখ। ভাবলেশহীন নির্বিকার পাথরের মত। তার দুচোখে বিষাদের ছায়া।

খুট—হঠাৎ একটা শব্দ হল। চঞ্চল হয়ে উঠল জ্যাকব! অদূরে বাড়ির উঠোনে চাঁদের মেটে মেটে আলোয় একটা কালো ছায়াদেহের আভাস ফুটে উঠল। জ্যাকবের বুকের রক্তে কলধ্বনি বাজতে লাগল।

র‍্যাচেল আসছে!

কি ব্যাপার! কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছ? চাপা গলায় ফিস ফিস করে বলতে বলতেই র‍্যাচেল নিঃশব্দ হাসিতে এলিয়ে পড়ল জ্যাকবের চওড়া বুকে। হাসির রেশ কমলে বলল, তুমি বেশ আছ—গাছেরও খাচ্ছ তলারও কুড়োচ্ছ—একটু থামল, জ্যাকবের থুতনিটা ধরে একটু ঝাঁকিয়ে বলল, ঘরে শুয়ে আছে বৌ আর তুমি মাঝরাতে শালীর সঙ্গে—

র‍্যাচেল তুমিও একথা বলছ! চারিদিকের নিথর স্তব্ধতার ভেতরে তার কথাগুলো কাতর কান্নার মত শোনাল।

অমনি বাবুর রাগ হয়ে গেল! বলেই তার নরম কালো রেশমের মত চুলে ভরা মাথাটা জ্যাকবের বুকে ঘষতে লাগল। আর পরম আদরে দুই হাত দিয়ে জ্যাকবকে জড়িয়ে ধরল।

নিঃশব্দে তার হাত ছাড়িয়ে দূরে সরে দাঁড়াল জ্যাকব। মেঘে-ঢাকা চাঁদের

ম্লান আলোয় র‍্যাচেল লক্ষ্য করল, কেমন গম্ভীর আর কঠিন হয়ে উঠেছে জ্যাকবের মুখখানা। বড় বড় চোখদুটো চিক চিক করছে।

তার চোখে জল দেখে মুহূর্তে একটা কাণ্ড করে বসল র‍্যাচেল। উদ্দাম বন্যার একটা ঢেউয়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল তার বুকে। টাল সামলাতে না পেরে জ্যাকব পড়ে গেল খড়ের গাদায়। তখন তার বুকের ওপর বসে উন্মাদিনীর মত মাথা কুটতে কুটতে বলল র‍্যাচেল, এই সামান্য কথাতেই তুমি দুঃখ পাও, আর আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখ তো—

আমি কি করব—কি করব র‍্যাচেল, তোমার বাবা-ই তো তোমার দিদিকে বলতে বলতে জ্যাকব তাকে বুকের ভেতরে জড়িয়ে ধরে চুমুতে চুমুতে আচ্ছন্ন করে দিল তার সুডৌল মুখখানা। তার রক্তের ভেতরে যেন আগুন ধরে গেল কানদুটো ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। আর লুব্ধ, মত্ত একটা সরীসৃপের মত তার দুটো হাত র‍্যাচেলের যৌবনপুষ্ট দেহে পরম আবেগে বুলিয়ে দিতে দিতে ফিস ফিস করে বলল, কবে—কবে তোমাকে পুরোপুরি পাবো র‍্যাচেল, তরল অন্ধকারে তার কথাগুলো করুণ কান্নার মত শোনালো।

এই তো পেয়েছো—আমি তো প্রতিদিনই আসছি, জ্যাকবের বুকে মাথা রেখে যেন অনেক অনেক দূর থেকে বলল র‍্যাচেল, আর বাবা তো বলেই দিয়েছেন, আমাকে অন্য কোথাও বিয়ে দেবে না—পরম আবেগে চোখদুটো বুজল। আবার যেন নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, ধরে নাও—আমাদের বিয়ে হয়েই গিয়েছে, বলেই অনুগত স্ত্রী যেমন প্রতি রাত্রির অভ্যস্ত নিয়মে নিজেকে অবারিত করে তেমনি করে যেই কুর্তার আড়াল থেকে নিরাবরণ করল তার উদ্ধত বক্ষোসম্ভার, অমনি সেই নগ্ন বক্ষের অপরিসীম সৌন্দর্যের দিকে তাকাতেই জ্যাকবের চোখে আদিম রক্ততরঙ্গের ভাষা দুলে উঠল। আর পর্যাপ্ত সলিল সম্ভারের ভেতরে অবগাহন করেও এক ফোটা জল পান করতে অক্ষম সেই অভিশপ্ত দেবতার মত নিদারুণ যন্ত্রণায় জ্বলে যেতে যেতে অস্ফুট আর্তনাদ করে বলল জ্যাকব, না-না র‍্যাচেল, এক পাপের ফলে দেশ ছাড় হয়েছি, আবার—

তুমি কি বলো তো আহত সাপিনীর মত ফোঁস করে উঠল র‍্যাচেল। বিষাক্ত অস্ফুট কণ্ঠে বলল, কেন—কেন তুমি ডাকো আমাকে—কেন আমাকে ভালবাসতে গিয়েছিলে—

শান্ত হও র‍্যাচেল, তুমি জেনে রেখ, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না—তার ক্রুদ্ধ মূর্তিটাকে আবার বুকের ভেতর টেনে নিয়ে বলল জ্যাকব, দেখছ

না—তোমাকে পাবো বলে তোমার বাবার ক্ষেতে উদয়াস্ত ক্রীতদাসের মত খাটছি—

জানি গো—জানি, বলতেই তার বুক ঠেলে উঠল কান্নার ঢেউ। জল ভরা দুটো চোখের করুণ দৃষ্টি জ্যাকবের মুখের দিকে তুলে ধরে অস্পষ্ট আর ঝাপসা কণ্ঠে বলল, কিন্তু আমি যে আর পারছি না গো—

দেখতে দেখতে কেটে যাবে সাতটা বছর র‍্যাচেল, তার কপালে আলতো করে একটা তপ্ত চুম্বন এঁকে দিয়ে বলল, তোমাকে নিয়ে চলে যাবো কনানে। তোমার কোলে একটি দুইটি করে সন্তান আসবে—আমাদের সুখের সংসারে—

থাক আর বলো না, কেমন ক্লান্ত আর হতাশা ভরা কণ্ঠে বলল র‍্যাচেল, কে জানে কবে আসবে সেই স্বপ্নের দিন, বলেই তার চওড়া বুকে মাথা রেখে আবার মধুর স্বপ্নের ঘোরে বিড় বিড় করে বলল, এখন যেটুকু পাচ্ছি তাই আমার লাভ—

তারপর—

তারপরে চাঁদের আলো বুকে নিয়ে স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইল পৃথিবী। সুষুপ্ত সেই বিশ্বচরাচরের দূর নিভৃত কোণে গভীর প্রণয়াসক্ত দুইটি নরনারী কোন চিত্রকরের নিপুণ ছবির মত বসে রইল। আর শেষরাত্রির নিথর স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে গোয়ালঘর থেকে একটা গরু ডেকে উঠল।

আজ যাই কেমন—তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো র‍্যাচেল। পূবের আকাশে ভোরের রঙীন আভাসের দিকে তাকিয়ে বলল, এখুনি দিদি উঠে পড়বে—

সর—সর—গোয়ালঘরের তরল অন্ধকারে ভেড়াগুলো ছটফট করতে লাগল। কোনটা আবার ব্যাঁ ব্যাঁ করে ডেকে উঠল। ভোর হয়ে এসেছে। গাছে গাছে পাখি ডাকছে। তাই ওরা বাইরে যাওয়ার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

এখুনি—এখুনি—লেহ উঠে সোজা চলে আসবে তার প্রাণের চেয়েও প্রিয় ওই ভেড়াগুলোর কাছে। আর যদি দেখে তখনও তাদের বের করে মাঠে যাওয়া হয় নি, তাহলেই—

সে কী—এখানে দাঁড়িয়ে কী ভাবছো গো, মৃদু কণ্ঠে বলল লেহ, কখন সকাল হয়ে গিয়েছে এখনো ভেড়াগুলোকে বের করো নি? বলতে বলতেই হঠাৎ জ্যাকবের হাতদুটো ধরে টেনে নিয়ে এল গোয়ালঘরে। খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, চল তোমাকে একটা জিনিস দেখাবো—

দীর্ঘ গোশালার এককোণে আলাদা করে রাখা চারটে হৃষ্টপুষ্ট ভেড়ার সামনে

এসে জ্যাকবকে নিয়ে নীচু হয়ে বসল লেহ। আরও—আরও নীচু হয়ে ভেড়াগুলোর পেটের ওপরে মেহেদির লালরঙের বড় বড় ছোপের দিকে ইঙ্গিত করে বলল লেহ, এই চিহ্নগুলো কিসের বলো তো?

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না—

তা বুঝবে কেন, হেসে হেসে আর একটু যেন জ্বালা মিশিয়ে বলল লেহ, তোমার মন যে কোথায় পড়ে থাকে—সে তো আমি জানি- বলেই আদর করে জ্যাকবের খাঁড়ার মত উঁচু নাকটা টেনে ধরে চাপা গলায় বলল, হাঁদারাম এই চারটে ভেড়া—আমাদের—

মানে?

তোমার আর আমার—

কেমন করে? সবই তো তোমার বাবার—

না মশায়—না, আমার বিয়ের অনেক আগে আমি গমের শীষ আর জলপাই তেল দিয়ে এই চারটে ভেড়া কিনেছিলাম বুঝলে, একটু থামল। জ্যাকবের বুকে মাথা রেখে অস্ফুট গলায় বলল, বাবার ক্ষেতে আর ছাগল ভেড়ার পাল নিয়ে সেই কতবছর ধরে বেগার খেটে যাচ্ছো- আমাদেরও তো একটা ভবিষ্যৎ আছে—

কোন কথা বলল না জ্যাকব। লেহর দীর্ঘ পুরুষালী চেহারা, তার ধারালো গম্ভীর মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আশ্চর্য র‍্যাচেলের সঙ্গে কত পার্থক্য! একজন উদ্দাম একটা বন্যার ঢেউয়ের মত প্রবল বেগে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়; আর একজন চাঁদের স্নিগ্ধ ও মায়াময় আলোর মত তার ধূসর রুক্ষ আর বঞ্চিত জীবনটাকে যেন সুখ আর সমৃদ্ধির জ্যোৎস্নায় প্লাবিত করে দিতে চায়—

কি দেখছ গো আমার মুখে—

তোমার কথা-ই ভাবছি লেহ, থামল জ্যাকব। বিদ্যুতচমকের মত র‍্যাচেলের হাসি মাখা অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল। তবুও তাকে খুশি করার জন্যই থেমে থেমে বলল, তোমাকে তো বলেছিলাম লেহ- চল—আমরা অন্য কোন বাড়িতে গিয়ে থাকি—

একটা কথা বলল না লেহ। কেমন বিচিত্র দৃষ্টিতে জ্যাকবের দিকে তাকিয়ে রইল। অস্ফুট স্বরে বলল, কেন বলো এসব কথা—তীব্র একটা জ্বালায় বুকের ভেতরটা চিন চিন করে জ্বলে যেতে লাগল। সেই অসহ্য আর বিষাক্ত যন্ত্রণা চেপে শান্ত আর মৃদু গলায় বলল, অন্য একটা বাড়িতে

যেয়েই বা লাভ কি—বাবার জমিতে তো তোমাকে বেগার খাটতেই হবে, একটু থামল। আবার যেন জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকার মত করে বলল, ছ্যাচেলকেও তো চাই তোমার—

অস্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠল জ্যাকবের মুখে।

না—না, আমার জন্য চিন্তা করো না, কান্নার ইঙ্গিতে তার মুখখানা এঁকে বেঁকে দুমড়ে উঠল। ভার ভার গলায় বলল, বিয়ের পর তিন তিনটি বছর তো পেরিয়ে গেল টেরাফিমকে (নাহোরদের গৃহদেবতা) যত ডেকেছি—কিছুই তো হল না—

ব্যা—ব্যা—বা, চীৎকার করে ডেকে উঠল ভেড়াগুলো। জ্যাকব ছুটে তাদের কাছে যেতে যেতে বলল, ওদের খিদে পেয়েছে লেহ্—আমি ওদের নিয়ে মাঠে যাই—

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই, ক্ষণকাল আগের সব দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে লেহও তাড়াতাড়ি জানোয়ারগুলোকে বের করতে সাহায্য করল। নিজের ভেড়াগুলোকে বুকে জড়িয়ে ধরল। আদর করল। তার একটির স্ফীত উদরের দিকে ইঙ্গিত করে বলল জ্যাকবকে—পুষিকে একটু চোখে চোখে রেখ—দেখছ তো ওর বাচ্চা হবে—একটা দীর্ঘশ্বাস তার বুকের ভেতরে গোপনে মিলিয়ে গেল।

ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুরের রোদ। হারানের চারিদিকে পন্টিক পাহাড়ের গায়ে নিবিড় সবুজ ওক গাছের পাতায় পাতায় তরল সোনার মত রোদ গলে গলে পড়ছে। কাছে দূরে যতদূর চোখ যায়, আর্মেনিয়াগ্রন্থির টরাস স্টানো-ভাই ইত্যাদি ছোট বড পাহাড়ের* সারি, হঠাৎ দেখলে মনে হয়, সেই দিগন্ত-বিসারী ধূমাচ্ছন্ন ধূসরতার ভেতরে যেন সাগরের ঢেউ ফুঁসে ফুঁসে উঠেছে। আর দূরে—বহুদূরে ইউফ্রেতিসের নীলিম আভাসের দিকে তাকিয়ে জ্যাকবের চোখের পাতায় নেমে এল সাবেকদিনের স্মৃতি—

চার বছর আগে এমনি এক ভরা দুপুরে ওই ইউফ্রেতিস পেরিয়ে সে এসেছিল এই মেসোপটেমিয়ার হারানে। এসেছিল নয়, আসতে হয়েছিল পুবের দেশ প্যালেস্তাইনের গ্যালিলি অঞ্চলের কনান থেকে। বাবা-মা, আর দুই ভাই। বেশ সুখের সংসার ছিল তাদের। সুখের তো হবেই। জীহোভার আশীর্বাদধন্য অ্যাব্রাহামের বংশধর তারা। বাবা আইজ্যাক শুধু বুড়ো নয়, চোখের দৃষ্টিও হারিয়েছেন। প্রায় অথর্ব। সংসারে মা অর্থাৎ রেবেকাই ছিলেন সর্বেসর্বা। দাদা এসায়ু দিনরাত বাইরে বনে-জঙ্গলে শিকার করে

বেড়াতো। বেশ লম্বা চওড়া জবরদস্ত চেহারা। বাবা কিন্তু বড় ছেলের জন্য গর্ব পোষণ করতেন আর মা ভালবাসতেন তাকে। তার শান্তশিষ্ট স্বভাব, ঘর-গেরস্থালীর কাজে তার আগ্রহ, গরু-ছাগল-ভেড়ার পাল নিয়ে মাঠে চরানো —ইত্যাদি কাজের প্রশংসা বাবাকে শুনিয়ে শুনিয়ে করে হঠাৎ চীৎকার করে বলতেন—তোমার বড ছেলে কি বিষয়-আশয়ের ভাগ নেবে না? তাহলে ছোটভাইটার ঘাড়ে সৃষ্টির কাজ ফেলে রেখে সে কোন আনন্দে বনেবাদাডে ঘুরে বেড়ায়—

একদিন বাবা দাদাকে বললেন, শোন, আমার তো বয়স হয়েছে—আজ শিকার থেকে ফিরে আয়। একটু থেমে দাদার লোমশ গায়ে হাত বুলিয়ে আবার বললেন, মাংস দিয়ে রুটি খেয়ে আমি বলবো—আমার বিষয়-সম্পত্তি তোদের কাকে কতটুকু দেব—

মা তাকে ডেকে বললেন কতগুলো ভয়ঙ্কর কথা। সে চমকে উঠেছিল। কিন্তু উপায় নেই। মা-র আদেশ। সন্ধে গড়িয়ে রাত নামল। সেই অন্ধ আর বৃদ্ধ পিতার কাছে মাংসের ঝোলের বাটি নিয়ে দাঁড়াতে হল। তার লোমশ গায়ে আলতো করে হাত বুলিয়ে বললেন, 'কে এসায়ু এসেছিস বাবা—কি শিকার করেছিস—কিসের মাংস নিয়ে এসেছিস—

তাঁর একটা কথারও জবাব দিতে পারল না। গলা শুকিয়ে কাঠ। কচি ছাগলের চামড়া পরে দাদার মত লোমশ দেহ হলে কি হবে গলার স্বর শুনলেই তো ধরে ফেলবেন। তবুও গলাটাকে বিকৃত করে বলেছিল, হরিণের মাংস বাবা—

তুই কে রে—গা-টা এসায়ুর আর গলার আওয়াজটা কিন্তু জ্যাকবের মনে হয়—

দুরু দুরু কাঁপছিল তার বুক। কেন যেন বৃদ্ধ আর উচ্চবাচ্য না করে মাংস খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে বলল, শোন বাবা এসায়ু, আমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হবি তুই—আর ছোটভাইটাকে—দু একটা গরু ভেড়া কি ছাগল দিয়ে দিস—

মা উল্লসিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু প্রহরে প্রহরে রাত্রি গভীর হল। ক্রমশঃ এসায়ুর বাড়িতে ফিরে আসার সময় যত এগিয়ে আসতে লাগল ততই মা র মনে ভয় বাসা বাঁধতে শুরু করল। কি বলবে— এসায়ু—বিষয়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে শুনে কি কাণ্ড বাধাবে কে জানে—হয়তো ছোট ভাইটাকে খুন করেই বসবে। যা গোঁয়ার আর বুনো মোষের মত রাগ।

তাকে ডেকে বললেন —শোন জ্যাকব—তুই বরং হারানে—তোর মামার কাছে চলে যা--গুণ্ডাটার রাগ পড়ুক, মাথা ঠাণ্ডা হোক, তারপর আবার ফিরে আসিস। আবার থেমে থেমে বলেছিলেন, যদি পারিস, নাহোরদের কোন সুন্দরী মেয়ে দেখে বিয়ে থা করিস—

কনানের হিব্রোন থেকে মরুসাগরের পশ্চিম তীর ধরে সে চলেছে। কিন্তু জর্ডন নদী পেরিয়ে আসতেই ঘটে গেল অদ্ভুত একটা কাণ্ড। নদীর ওপারে চুনাপাথরের খাড়া পাহাড়ের নীচে একটা ওকগাছের ছায়ায় বিশ্রাম করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

সেই বিশাল চুনাপাথরের পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ির মত ধাপ বেয়ে নেমে এলেন এক অগ্নিবর্ণ পুরুষ। বললেন, আমি অ্যাব্রাহামের এবং তোমার পিতার আরাধ্য দেবতা। তুমি যে দেশেই যাও—যতদূরেই যাও, জেনে রাখো, তোমাকে তোমার সন্তান-সন্ততি এবং স্ত্রীকে নিয়ে ফিরে যেতেই হবে গ্যালিলির পবিত্র মাটিতে, দূর আকাশে মিলিয়ে যেতে যেতে যেন দিগন্তের ওপার থেকে বললেন, অ্যাব্রাহামের-ই উত্তরসূরীরা গ্যালিলি থেকেই উত্তরে, দক্ষিণে, পূবে, পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়বে—

ঘুম ভেঙ্গে গেল। খুশিতে ভরে উঠল মন। সে পাপী,—হীন ষড়যন্ত্র করে বাবাকে—দাদাকে ঠকিয়েছে। তবুও ঈশ্বর তো তাকে পরিত্যাগ করেন নি। সেই অপরাধ—সেই পাপের গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে নিবিড় একটা প্রশান্তিতে আবিষ্ট হয়ে গেল তার চেতনা। আর যেন বাতাসের ওপর পা ফেলে পাখির মত উড়ে সিরিয়ার মরুভূমি ডিঙিয়ে ইউফ্রেতিস পেরিয়ে পৌঁছে গেল উত্তর মেসোপটেমিয়ার সমৃদ্ধ জনপদ—হারানে।

একটা কুয়োর কাছে উঁচু ঢিবির ওপরে বসল। সকালের রোদে ঝলমল করছে সবুজ গমের ক্ষেতের মাঝে মাঝে ছবির মত সুন্দর এক একটা বাড়ি। কে জানে কোনটা তার মামাবাড়ি। হঠাৎ তার নজরে পড়ল, দূরে ক্ষেতের মাঝখানে দূর বিসর্পিল পথের শেষপ্রান্তে যেন ম্যাগনেটো গোলাপের রক্তবর্ণ পাপড়ি বাতাসে ভেসে ভেসে তার দিকেই আসছে! হাওয়ায় খিলখিল হাসির মিষ্টি শব্দ ছড়িয়ে এল একদল মেয়ে। তার মনে হল, রক্তিম তুষারের যেন কতগুলি ফুল। তাদের কারো পরণে খাটো লাল, কারো সবুজ রঙের ঘাঘরা। তাদের প্রত্যেকের কাঁধে মাটির কলসী। কিন্তু—

বহু চেষ্টা করেও তারা কুয়ো থেকে জল তুলতে পারল না। একটা বিশাল পাথর দিয়ে ঢাকা আছে কুয়োর মুখ। সেই পাথর ওরা সরাতে পারল না।

আপনারা যদি বলেন, আমি চেষ্টা করবো ? সে এগিয়ে গিয়েছিল। আর নিজের দীর্ঘ দেহের অপার স্বাস্থ্যের মহিমার দিকে গর্বের দৃষ্টিতে একবার তাকিয়েছিল। আর শক্ত দুটো হাত দিয়ে অবলীলাক্রমে সরিয়ে দিয়েছিল পাথরটাকে। মেয়েদের চোখে ফুটে উঠেছিল বিমুগ্ধ দৃষ্টি। তাদের ভেতরে একজন—একজন ধীর পায়ে এগিয়ে এসেছিল।

ঘাঘরার নীচে দেখা যায় তার নিটোল পা দুটো, যেন গোলাপী রঙের প্রলেপ দেওয়া। রুক্ষ বেণী কোমর পর্যন্ত ঝুলছে। গায়ে রক্তরঙের কুর্তা। মাথায় কপাল চেপে সবুজ রুমালের ফেট তার নীচে লালচে মুখ। টিকালো নাক। আর তার দুপাশে দুটো ভাসা ভাসা চোখ যেন মরুসাগরের নীলিমায় টলটল করছে।

আপনার গায়ে তো খুব জোর, তার দীর্ঘ দেহের লীলায়িত পেশীপুঞ্জের স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে সসঙ্কোচে বলল, কে আপনি—এখানে কাদের বাড়িতে এসেছেন ?

অচেনা এক তরুণীর মুখে এতগুলো প্রশ্ন শুনে হকচকিয়ে গিয়েছিল সে।

কিন্তু তাকে চুপ করে থাকতে দেখে মেয়েটি আবার বলল, বোবা নাকি কথা বলতে পারেন না—

এসেছি গ্যালিলি থেকে, থেমে থেমে সসঙ্কোচে সে বলেছিল, যাবো লেবানের বাড়ি—

ও মা—তাই নাকি ! ঝিক্ করে হেসে উঠল তার চোখ দুটো। বলল, তিনিই তো আমার বাবা। খিল খিল করে হেসে বলল আমার নাম—র‍্যাচেল। গ্যালিলির কনানে শুনেছি আছেন আমাদের এক পিসীমা—রেবেকা—

সে কি ! সে বিস্মিত হয়ে র‍্যাচেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তিনিই তো আমার মা—

খুশির উচ্ছ্বাসে ভেঙ্গে পড়ে কল কল করে বলেছিল, আমার যে কী আনন্দই হচ্ছে।

তার সেই উচ্ছল হাসিখুশি ঝলমলে মূর্তিটা সেই যে তার মনের ভেতরে আঁকা হয়ে গেল, আজ পর্যন্ত তা এতটুকু ম্লান হয় নি !

বাড়ির সামনে আসতেই দেখেছিল, পুরুষালী চেহারার একটা মেয়ে কাঁচি দিয়ে ভেড়ার লোম কাটছে। র‍্যাচেলের সঙ্গে একটা উটকো লোক দেখে মাত্র একবার কঠিন দৃষ্টিতে তাকে দেখেছিল।

লেবান তার পরিচয় জানতে পেরে খুশি হয়েছিল। থাকতে দিয়েছিল

পরম যত্নে। পরে বুঝতে পেরেছিল, অত যত্নআত্তির আড়ালে স্বার্থ ছিল লেবানের। চাষবাস আর গরু ছাগল ভেড়া অর্থাৎ গৃহপালিত জন্তুর যাবতীয় তত্ত্ব ছিল তার নখদর্পণে। কখন সমুদ্রের বাতাস শীতার্ত বাত্রির হিমশীতল ... সংস্পর্শে এসে শিশির বিন্দু হয়ে ঝরে ঝরে পড়বে মাটিতে, মাটি হয়ে ... সরেস গমের বীজ ছড়িয়ে দিতে হবে—এসব যেমন তেমনি জানতো ... গরুটা বা ভেড়াটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে—কেন হাঁটছে—কেন পেট ... খাচ্ছে না—, কি হয়েছে, কোন গাছ গাছড়ার ওষুধ খাওয়াতে হবে—লেবান মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

... ক দিনে দিনে পন্টিক আর টরাস পাহাড়ের গায়ে উইলো আর লরেল ... নীলাভ ছায়ায় লোকচক্ষুর অগোচরে তার আর র‍্যাচেলের প্রেম একটা ... মতই বেড়ে উঠেছিল। আর লেহ্—

সে জানোয়ারগুলোর যত্ন করতো, চাষের কাজ করতো সমস্ত অন্তর দিয়ে ... মনে মনে তার ওপর খুবই প্রসন্ন ছিল। এক এক সময় তার নজরে পড়ে ... দূর থেকে তার পেশীবহুল মজবুত চেহারাটার দিকে অপলক চোখে ... আছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই—

একদিন লেবান বলল তাকে, তুমি আসার পরেই ফসলের পরিমাণ বেড়েছে গরু-ভেড়ার সংখ্যাও বেড়েছে—তোমাকে তো পারিশ্রমিক দিতে হয়। কত ... নেবে—

আমি কিছু চাই না—আপনার ছোট মেয়ে র‍্যাচেলকে বিয়ে করতে চাই শুধু।

লেবান কিছু বলল না। ধূর্ত হাসি ফুটে উঠল মুখে। কয়েক মুহূর্ত কী ভেবে বলল বেশ তাই হবে। লেবানের সম্মতি পেয়ে তার মনটা খুশিতে উত্তাল হয়ে উঠল। কিন্তু—

আলোকোজ্জ্বল বিয়ের আসরে রূপোর চুমকি বসানো বেগুনী রঙের ওড়না সরাতেই থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তার হৃদস্পন্দন। গোটা পৃথিবীটাই যেন ... উঠেছিল। র‍্যাচেল নয়—লেহ্।

কেন আপনি আমাকে ঠকিয়েছেন—আপনি বেইমান—শয়তান, এসব কথা বলতে যেয়ে মনে পড়ল, সে-ও একদিন নিজের সহোদর ভাইকে বঞ্চিত করেছিল, সেই পাপেই হয়তো—

শোন জ্যাকব—আমাদের নাহোরদের প্রথা অনুসারে বড়কে বাড়িতে আইবুড়ো রেখে ছোটর বিয়ে দেওয়া যায় না—

কিন্তু—র‍্যাচেলকে না হলে যে—অবরুদ্ধ ব্যথায় আর কিছু বলতে পারেনি।

সস্নেহে তার মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনা দিয়ে বলল লেবান, তুমি যদি বিনা পারিশ্রমিকে সাত বছর আমার চাষ আবাদের কাজ করতে পারো তাহলে ছোটমেয়েকে তোমার হাতে দেব—

শুরু হল তার নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণার জীবন চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে র‍্যাচেলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, লেহর সঙ্গে ভালবাসার অভিনয়!

অভিনয়? না, লেহ তাকে খুব ভালবাসে। কিন্তু লেহর মন বিষণ্ণ-আশয়ের অন্ধকার কবরে বন্দী। তাই সে চেষ্টা করেও তাকে ভালবাসতে পারে না বলে তার দুঃখ হয়।

কি গো চুপচাপ বসে কার ধ্যান করছ, অসময়ে হঠাৎ লেহ এল, ভেড়াগুলো খাদের দিকে যাচ্ছে কি না দেখছো, বলেই ঘন হয়ে তার কাছে বসল। চারিদিকে তাকিয়ে কি যেন দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে বলে, জানো আমার খুব ভয় করে, সেই যে গমের শীষ বিক্রি করে কেনা ভেড়াটা—ওই যে গো যার নাম পুষি। ওর বাচ্চা হবে, এই সময় খুব সাবধান—থামল লেহ। জ্যাকবের দিকে স্থিরচোখে তাকিয়ে বলল, র‍্যাচেল এসেছিল—না?

কৈ না, সে তো এখন ঘরের কাজ করছে, হেসে হেসে পরিবেশটাকে সহজ করার জন্যই বলল, এখানে আমার কাছে মাথা ঠাণ্ডা করে আর সব দুশ্চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দু দণ্ড বসো তো।

ও মা! ছটফট করে উঠে দাঁড়াল লেহ, এখুনি চাষীরা মাঠ থেকে গরু নিয়ে আসবে, বলেই দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে যেতে যেতে চীৎকার করে বলল, পুষির দিকে ল—ক্ষ্য—রে—খো—কি—ন্তু—

লেহ যা ভয় করছিল তাই হল। পশ্চিম পাহাড়ের গভীর অন্ধকার খাদে পড়ে গেল পুষি। খবর পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল লেহ।

দূর থেকে শুনতে পেল, খাদের ভেতর থেকে পাক খেয়ে খেয়ে উঠে আসছে পুষির করুণ আর্তনাদ। খাদের নীচে আবছায়া অন্ধকারে রক্তমাখা মাংস-পিণ্ডের মত পড়ে আছে পুষি। আর তার ভেতর থেকে উঠে আসা মৃত্যু-যন্ত্রণার তীব্র গোঙানির শব্দটা পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে সারা দিগন্ত জুড়ে যেন একটা বুকফাটা হাহাকারের মত বেজে চলেছে। লেহ দুহাতে বুক চেপে ধরে ডুকরে উঠল।

দূরে বহুদূরে কালো মেঘে ঢাকা আকাশের বুক চিরে বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠল টেরাফিমের ধারালো মুখ। দিগন্তের পার থেকে ভেসে এল তাঁর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর—তুমি র‍্যাচেলকে হিংসা কর সেই পাপেই তোমার পুষি।

না—না আমার পুষি তো কোন পাপ করেনি—আমার পুষিকে ফিরিয়ে দাও—পাগলের মত চীৎকার করতে করতে যেই ছুটে খাদে ঝাঁপ দিতে গেল অমনি—

খট্—প্রচণ্ড শব্দে উঁচু খাট থেকে পড়ে গেল লেহ শক্ত পাথরের মেঝেতে। ধড়মড় করে জেগে উঠে জ্যাকব বলল—এ কী! রক্তে ভেসে যাচ্ছে তোমার শয্যা।

হাকিম এল। বলল, পেটের ভেতরে তিনমাসের বাচ্চা ছিল, শুধু যে সেটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে তা নয়, আর কোনদিন ছেলেপুলে হবে না।

গভীর শোকের ছায়া নেমে এল বাড়িতে।

চোখের মণির মত বড় মেয়ের এই করুণ পরিণতিতে ভেঙ্গে পড়ল লেবান। তার মনের ভেতরে ভেসে উঠল, সেই তিনবছর আগে বিয়ের আসরে র‍্যাচেলের বদলে লেহ-কে দেখে জ্যাকবের অসহায় আর করুণ মুখখানা, তারই পাশাপাশি ভেসে উঠল টেরাফিমের প্রদীপ্ত মুখাবয়ব। তাঁর বড় বড় দুটো চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে; তিনি যেন নিঃশব্দে বলছেন, বুকের রক্ত দিয়ে তোমার ক্ষেতে অঢেল ফসল ফলাচ্ছে যে, সেই সৎ এবং মহৎ প্রকৃতির মানুষটাকে তুমি প্রবঞ্চিত করেছো। তোমায় সেই পাপে তোমার আদরের মেয়েকে নারীজীবনের মর্মান্তিক অভিশাপ বহন করে বেঁচে থাকতে হবে—

কৃতকর্মের অনুশোচনায় জ্বলে যেতে লাগল লেবান। বড় ছেলে বেথুলকে ডেকে বলল, টেরাফিমের পুজোর আয়োজন করো—

বেথুল চামড়ার থলিতে করে নিয়ে এল পন্টিক পাহাড়ের নীচে লরেল আর জলপাইগাছের নিবিড় অরণ্যের চাকভাঙ্গা মধু, নিয়ে এল রাশি রাশি রসালো, সুপুষ্ট খেজুর আর আঙুর। ষোড়শোপচারে পূজার ব্যবস্থা হল। লেবানের আত্মীয়স্বজন যে যেখানে ছিল, তারাও ভীড় করে এসে গেল পুজো দেখতে। এইবার লেবান ব্যস্ত হয়ে উঠল, কখন খবর পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এখনো পুরোহিত আসছেন না কেন?

বেথুল, যে ষাঁড়টাকে বলি দেওয়া হবে; বলল লেবান, সেটাকে এখনও আনিস নি কেন?

বেথুল কোন কথা বলল না। কিন্তু কেন যেন তার মুখখানা ভারী হয়ে উঠল। কি একটা বলি বলি করেও লোকজনের সামনে বলতে পারল না। ধীর পায়ে গোয়ালঘরের দিকে চলে গেল।

টেরাফিমের পূজোর উৎসবে মুখরিত, লোকগমগম সেই বাড়ির বাইরে একটা উঁচু ঢিবির ওপরে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়েছিল জ্যাকব। সে অ্যাব্রাহামের উত্তরসূরী। সে চিরন্তন, শাশ্বত সেই সর্বশক্তিমান, জীহোভার ভক্ত! পৌত্তলিক নাহোরদের অলীক ও ভুয়ো দেবতার পূজোর সেই সমারোহ দেখে ভেতরে ভেতরে যন্ত্রণায় জ্বলে যাচ্ছিল।

আরে! তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কী করছো, আচমকা একটা দমকা হাওয়ার মত এল র‍্যাচেল, বাড়িতে কত হুল্লোড় হচ্ছে—চল—চল, বলেই তার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ঝাকড়া এক গাছটার নীচে আবছায়া অন্ধকারে থমকে দাঁড়ালো। জ্যাকবের হাতে হঠাৎ চিমটি কেটে চাপা গলায় বলল, দেখো—এইবার বাবা আর আপত্তি করবে না—তোমার সঙ্গে—বলেই বর্ষার নতুন জলের আহ্লাদের মত কল কল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে আবার বলল, দিদির ব্যাপারটায় বাবা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছে, চোখের পলকে ছুটে চলে গেল বাড়িতে। দূরে তার অপস্রয়মান হাস্যোচ্ছল মূর্তির দিকে তাকিয়ে তার মনে হল, আশ্চর্য! লেহর এতবড় একটা দুর্ঘটনা ওর মনে এতটুকু রেখাপাত করতে পারে নি? তবুও র‍্যাচেলকে দোষ দেওয়া যায় না। তার-ই প্রতি গভীর প্রেমে মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছে সে। র‍্যাচেল তার প্রথম প্রেম। আর লেহ তার জীবনে মূর্তিমতী কল্যাণী—লক্ষ্মী। ওরা দুইজনে-ই আনন্দে, সুখে সমৃদ্ধিতে মধুময় করে তুলবে তার দাসত্বের এই অভিশপ্ত জীবন!

তোমার স্ত্রী আর সন্তানসন্ততিদের নিয়ে তোমাকে ফিরে যেতে হবে গ্যালিলিতে, তার কানের কাছে বাজতে লাগল জীহোভার সেই নির্দেশ। কিন্তু —তার-ই পাপে—সেই মা'র চক্রান্তে সহোদর ভাইকে বঞ্চিত করার অপরাধে লেহ বন্ধ্যা হয়ে গেল। কবে সেই ধূর্ত কপট বৃদ্ধ তার ছোট মেয়েকে তার হাতে দেবে? কবে দেশে ফিরে যেতে পারবে, অসহ্য যন্ত্রণায় জ্বলে যেতে লাগল তার মাথার ভেতরটা—

লেবান, টেরাফিমের পূজোর এতবড় একটা এলাহী ব্যবস্থা করেছো, গ্রামবৃদ্ধ জ্যাকিয়াস গুজ গুজ করে বলল, বলি ব্যাপারটা কী বলো তো?

উঠোনের এককোণে দাঁড়িয়ে থাকা বিষাদের প্রতিমার মত লেহর দিকে ইঙ্গিত করে লেবান বলল, লেহর দুঃস্বপ্ন থেকে শুরু করে সব কথা। জ্যাকিয়াস কয়েকমুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে লেহর দিকে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে বলল, নিগাহ!

কী!—বলছো কি তুমি, উত্তেজনায় আতঙ্কে লেবানের কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এল।

দেখ তুমি, মাথাটা ঝাঁকিয়ে হেসে হেসে বলল মোড়ল, কোহেনও পুরোহিত) তাই বলবে—

ভোঁ—ও—ও—হঠাৎ ছড়িয়ে পড়ল দূরাগত শিঙার শব্দ

কোহেন আসছেন—কোহেন ! সমবেত জনতার ভেতরে গুঞ্জন উঠল।

চারজন ক্রীতদাস পালকীতে করে পুরোহিতকে বহন করে নিয়ে এসে লেবানের বাড়ির সামনে থামল।

পুরোহিত নামলেন দীর্ঘ গৌরবর্ণ, বয়সের ভারে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়েছে। পা পর্যন্ত ঢাকা রক্তবর্ণ পশমের জোব্বা। তার প্রান্তভাগ আবার টিজিটজিটের মতই সোনার জরি দিয়ে মোড়া। মাথায় রক্তিম পালকের টুপী। পুরোহিতের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কেমন আরাত্রিক আর পবিত্র গাম্ভীর্যে গমগম করতে লাগল সারা বাড়ি।

লেবান নিজে ম্যাগনেটো গোলাপের সুগন্ধী জল দিয়ে পুরোহিতের পা ধুইয়ে দিল। টেরাফিমের মূর্তির সামনে পদ্মাসনে বসে পুরোহিত ভরাট গলায় মন্ত্র পড়তে শুরু করল। একসময়ে পূজারী হেঁকে বললে—এবার বলির ব্যবস্থা করো—

জয়—টেরাফিমের জয়, উল্লাসে জয়ধ্বনি দিল আমন্ত্রিত দর্শকরা।

বেথুলের মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল।

ষাড়টাকে আড়কাঠে ফেলে বলি দেওয়া হল। আর সেই তাজা রক্ত ছড়া দেওয়ার মত করে বাড়ির চারিদিকে ছিটিয়ে দিল কোহেন। এইবার লেবানকে উঠোনের এককোণে নিয়ে যেয়ে বলল, দেখ তোমার বড় মেয়ে নিগাহ (শাস্ত্র বিরুদ্ধ বা কোন পাপে লিপ্ত রমণী) হয়েছে না হলে পেটের বাচ্চা নষ্ট হবে কেন ? আবার একটু থেমে বলল প্রায়শ্চিত্তের জন্য যা করতে হয় তার ব্যবস্থা করো—

পুরোহিতের নির্দেশ—নিয়তির অমোঘ বিধানের মত। তাই লেবান আর উচ্চবাচ্য না করে বেথুলকে দুটো ছাগল নিয়ে আসতে হুকুম করল। এইবার বেথুল আর পারল না। অবরুদ্ধ যন্ত্রণায় ফেটে পড়ে বলল, বাবা এইবার আমরা ছাগল দিতে পারবো না—দিদিদের তো অনেক কয়টা আছে—ওরা দিক—

—না—না, আমি, দুহাতে বুক চেপে ধরে চীৎকার করে বলল লেহ, আমাদের একটা ছাগলও দিতে পারবো না—

কেন আমরা তো একটা ষাঁড় দিয়েছি, বাড়ির একটা শুভকাজে তোমাদের কী কোন কর্তব্যই নেই ?

কোহেনের চোখে আগুন ঝিলিক দিয়ে উঠল। লেবানের চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল। বেথুল ছুটে গিয়ে জ্যাকবের দু'টো হৃষ্টপুষ্ট ছাগল নিয়ে এল।

বাবা তোমার পায়ে পড়ি, ডুকরে কেঁদে উঠল লেহ। লেবানের পায়ের ওপর পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, এই দুটো ছাগল ওর বড় আদরের—

পাগলামো করিস না লেহ, গর্জে উঠল লেবান। আড়চোখে কোহেনের গম্ভীর আর কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে চাপা বিষাক্ত গলায় বলল, তুই নিগাহ হয়েছিস আর বলির পশু দেব আমি? কোহেন মেনে নেবেন—টেরাফিম সন্তুষ্ট হবেন—

আর একটা কথা বলল না। বলতে পারল না লেহ। বাজপড়া ঠুটো তালগাছের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু—

রুষ্ট দেবতাকে প্রসন্ন করার জন্য প্রায়শ্চিত্তের নিয়ম অনুসারে একটা ছাগল বলি দেওয়া হল। আর আরেকটা ছাগলের মাথায় * কালো কাপড় অর্থাৎ লেহর পাপের বোঝা বেঁধে যেই মরুভূমির অপদেবতা অ্যাজাজিলকে ভেট পাঠানো হল অমনি একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

সেই খররোদ মাথায় নিয়ে পাগলের মত লেহ ছুটল সেই ভয়াল মরুভূমির দিকে। জ্যাকব বসে ছিল উইলো গাছের নীচে। ছুটে গিয়ে পিছন থেকে তাকে জাপটে ধরল। তার পেশীবহুল বাহুর নিগড়ে বন্দী হয়ে আহত বাঘিনীর মত ফুঁসে উঠে বলল, কেন—কেন—তুমি আমাকে বাধা দিলে—তীব্র উত্তেজনায় আর ছুটে আসার ক্লান্তিতে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, অ্যাজাজিলের কাছে গিয়ে আমি—আমি আত্মঘাতী হতাম—অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল লেহ।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঝাঁপিয়ে নেমে এল। লেবান তার জাগ্রত গৃহদেবতা টেরাফিমের পা-দুটো জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করতে লাগল, তারই পাপে সংসারে অশান্তির ছায়া ঘনিয়ে আসছে। আত্মীয় হলেও বিধর্মী এবং পরদেশী যুবককে বাড়িতে শুধু আশ্রয় নয়, বড় মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে যে মহাপাপ করেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত করবে সে জোড়া ষাঁড় বলি দিয়ে—অস্ফুটস্বরে বলল, তোমার-ই আশীর্বাদে আমার ক্ষেতে অঢেল শস্য উপচে পড়ে, তুমি রুষ্ট হয়ো না ষোড়শপোচারে তোমার পুজা দেব—

অন্ধকারের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে লেহ দূর থেকে লেবানকে লক্ষ্য করতে লাগল। তীব্র অস্বস্তির পীড়নে জ্বলে যাচ্ছে তার মাথার ভেতরটা। কখনো কোন পরপুরুষের দিকে তাকায় নি। স্বামীকে ভক্তি করে দেবতার মত, তবুও

*Millman, Henry Hart—"History of the Jews"—P. 64

বিনাদোষে সে হয়ে গেল 'নিগাহ'। তাদের দু'একটা ছাগল-ভেড়া আছে, তাতেই হিংসায় জলে যায় বেথুল! কেমন উদভ্রান্ত আর অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল টেরাফিমের প্রদীপ্ত মুখের দিকে! তারপরেই হঠাৎ একটা ঝড়ো বাতাসের মত ছুটে বাড়ির ভেতর গেল। আর র‍্যাচেলকে ডেকে নিয়ে চোখের পলকে বাইরে ঘন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

র‍্যাচেলের বুকের ভেতরটা ভয়ে দুর দুর করছে। নিশ্চয়ই দিনের পর দিন জ্যাকবের কাছে তার গোপন অভিসার জেনে গিয়েছে। তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। তবুও হেসে হেসে সহজ হয়ে বলল, ব্যাপার কি রে দিদি?

কোন কথা বলল না লেহ। কান্নার আভাসে থমথম করতে লাগল তার মুখখানা। অবরুদ্ধ যন্ত্রণায় পুড়ে যেতে যেতে অস্ফুটস্বরে বলল, তুই ওকে—ওকে খুব ভালবাসিস, বলতেই আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

জ্যাকবের কথা শুনেই র‍্যাচেলের বুকটা দুলে উঠল কিন্তু সহজ গলায় বলল তোর কি হয়েছে বল তো? পরমআবেগে তাকে জড়িয়ে ধরল। আবার বলল র‍্যাচেল, তোকে কোহেন নিগাহ বলেছে—

না রে-না থামল লেহ। চোখেমুখে আতঙ্কের চিহ্ন ফুটে উঠল। চাপা-গলায় বলল, বেথুল বোধ হয় আমাদের যা কয়েকটা জানোয়ার আছে, তা কেড়ে নেবে, হঠাৎ থেমে গেল সে। আবার অস্ফুটস্বরে যেন নিজের মনেই বলল, আমাদের আর এখানে থাকা হবে না—

রাত্রির অন্ধকারটা যেন র‍্যাচেলের চোখে চেপে নেমে এল। তার বিষন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল লেহ। বলল, ওকে নিয়ে যাবো—শুনেই বুঝি তোর মুখ অন্ধকার হয়ে গেল বলেই তার কানের কাছে ফিস ফিস করে বলল আশ্চর্য কয়েকটা কথা।

ভয়ে উত্তেজনায় আর অজানিত একটা আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে গেল র‍্যাচেল। যেমন ছুটে এসেছিল তেমনি চলে গেল লেহ।

রাত্রি নামল গভীর হয়ে। ঘুম নেই জ্যাকবের চোখে। কে জানে আর কতদিন—কত কাল এই পৌত্তলিক পরিবারের এই মূর্তিপূজা, পশুবলি ইত্যাদি অন্ধ কুসংস্কারের কারাগারে বন্দী হয়ে থাকতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে মনের আয়নায় ফুটে উঠল হাসিমাখা একটি সুডৌলমুখে। আর হু হু করে উঠল তার বুকের ভেতরটা। আর তার মনের ভেতরে সহস্র তর্জনী তুলে কে যেন শাসাতে লাগল, কেন—কেন তুমি বাহাদুরী করে কুয়োর মুখে পাথর তুলতে গিয়েছিলে—কেন—

মুখ ফিরিয়ে এত কি ভাবছ, সজোরে আর তাকে ঘুরিয়ে বুকের ভেতরে মাথা গুঁজে বলল, জানো, বেথুল আজই আমাদের আর দুটো ছাগলও নিয়ে নেবে দেখো—থামল লেহ। জ্যাকবের একরাশ ঘন কালো কোঁকড়ানো চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আবার বলল, তুমি রোদে জলে গতর খাটিয়ে রক্ত জল করে ওদের জন্য কত করো, তোমাকে বাবা পর্যন্ত একবার পুজো দেখতে ডাকল না, কত লোক হুল্লোড় করে খেল—

তুমি তো জানো লেহ, ডাকলেও আমি তোমাদের ছুয়ো দেবতার পুজো দেখতে যেতাম না—

না—না সেটা বড় কথা নয় গো—তোমাকে এ বাড়িতে কেউ ভালবাসে না একটু থামল। আবার আস্তে আস্তে বলল, চলো—আমরা তোমার মা-র কাছে কনানে চলে যাই—

বলছো কী তুমি? তীব্র ও তীক্ষ্ণ এক বিদ্যুতের আলো যেন ঝকমক করে উঠল জ্যাকবের মুখে। বুকের ভেতরে খুশির ঢেউ উতরোল হয়ে উঠল। কিন্তু র‍্যাচেলের মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই মনটা মুহূর্তে চুপসে গেল।

কী হল, র‍্যাচেলের কথা ভাবছ, কান্নায় ভার ভার গলায় বলল লেহ, তোমার সুখের জন্য আমি—আমি সব করতে পারি গো, থামল সে। মাথা নীচু করে অস্ফুটস্বরে বলল আবার, র‍্যাচেলকে তুমি ভালোবাসো—ওকে আমি তোমার সঙ্গে বিয়ে দেব—তুমি সুখী হবে, তোমাদের ছেলেপুলের কচিগলার কান্নায় হাসিতে আমাদের সংসার—বাদবাকী কথাগুলো আর বলতে পারল না লেহ।

উচ্ছ্বসিত আবেগে লেহর মুখখানা চুমুতে আচ্ছন্ন করে দিল জ্যাকব।

নিশীথ রাত্রির ঘন অন্ধকারে তিনটি ছায়ামূর্তি নিঃশব্দ পায়ে বেরিয়ে এল।

রাস্তায় নেমেই ঝড়ের বেগে হাঁটতে শুরু করল তারা। কোথা থেকে তীক্ষ্ণ হাওয়ার ঝলক এল একটা। পথের পাশে দীর্ঘ উইলো গাছটার বুড়ো ডাইনীর মত মাথা নাড়তে লাগল। আর সরু ডালপালাগুলো অতিলৌকিক প্রেত-চ্ছায়ার মত কেঁপে উঠল থর থরিয়ে।

তুমি সব কয়টি ভেড়া-ছাগল এনেছো তো? চাপা গলায় বলল লেহ।

হ্যাঁ-রে-বাবা—হ্যাঁ সব এনেছি আর দেখ এটাও আনতে ভুলিনি, অন্ধকারে জ্যাকবের হাতে বর্শার তীক্ষ্ণধার ফলকটা ঝকমক করে উঠল। আবার দ্রুত উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, জোরে পা চালিয়ে চল—মঙ্গলের বাজারে পৌঁছেই কনানের কাফিলা ধরবো—

একটা কথাও বলছে না র‍্যাচেল। তার শুধু মনে হচ্ছে এই রাতের অন্ধকারে সে যেন কোন সুদূর স্বপ্নের দেশে চলেছে।

যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লেহ। বলল, ইস—টেরাফিমকে প্রণাম করে আসি নি তো? বলেই ঝড়ের .বগে ছুটতে লাগল সে বাড়িব দিকে।

যেও না—লেহ—আমি ওসব মানি না—

না—না বড় জাগ্রত ঠাকুর—তোমাব যদি কোন অমঙ্গল—শাঁ শাঁ বাতাসে আব তার কথা শোনা গেল না। কিন্তু—

কিছুক্ষণ পর নিবাপদেই ফিরে এল লেহ। আবার তাবা চারিদিকের সেই হিমশীতল নিষ্ঠুব অন্ধকারের স্রোত পাড়ি দিয়ে চলতে শুরু করল। আর মাথাব ওপরে জ্বলজ্বল কবতে লাগল অসংখ্য নক্ষত্রের ভ্রূকুটি।

তোমাদের দুইজনকে দেখলে মা যে কী খুশি হবে, বলল জ্যাকব। মনের ভেতরে এসাযুব কর্কশ কঠিন মুখখানা ভেসে উঠতেই বুকটা পাথবের মত ভারী হযে উঠল।

কি দাদার কথা ভাবছো তো, লেহ বলল, চল দেখবে—আমি ঠিক মিটমাট করে দেব—

বাত্রির তরল অন্ধকারে লেহব দীঘল চেহাবাটাকে যেন দেবী মূর্তির মত মনে হল জ্যাকবের। যেই তারা গিলিয়াড পাহাড়ের কাছে এল অমনি।

খট্—খট্—খট্—হঠাৎ চারিদিকের নিস্তব্ধতাকে সচকিত করে অনেকগুলো দ্রুত পদশব্দ বেজে উঠল।

রাহজান—রাহজান—ফিস ফিস করে বলল লেহ। র‍্যাচেল ছুটে এসে জ্যাকবের বুকের কাছে ঘন হয়ে দাঁড়ালো। জ্যাকব বলল, ভয়ের কিছু নেই—পলেস্টীয় কি আম্মোনীয় উপজাতিরা লুঠতরাজ করতে যাচ্ছে—আমাদের কিছু বলবে না।

—কিন্তু তার কথা শেষ হওয়ার আগেই বাতাসের বুক চিরে গোঁ গোঁ শব্দ তুলে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটে আসতে লাগল। দূর থেকে কে যেন চীৎকার করে বলল দাঁড়াও তোমরা—তা নাহলে কিন্তু—দেখতে দেখতে তাদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলল প্রেতচ্ছায়ার মত কতগুলো লোক। তোমরা আমার টেরাফিমের মূর্তি চুরি করে এনেছ, চীৎকার করে বলল লেবান, বলো—বলো—দেরী করো না—বলেই তলোয়ারটা উদ্যত করে এগিয়ে এল জ্যাকবের দিকে।

না—না—বাবা—ও নেয় নি—লেহ তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল।

নিশ্চয়ই তোমরা নিয়েছ লেবানের পাঁচ ছেলে গর্জে উঠল। বেথুল বলল, বাবা নিশ্চয় দিদিই নিয়েছে বলেই যেই লেহর জামা ধরে টানতে গেল, অমনি মত্ত আক্রোশে হুঙ্কার দিয়ে উঠল জ্যাকব। অন্ধকারে ঝিলিক দিয়ে উঠল লেবানের তলোয়ার। আর এক ঘায়ে ছিটকে পড়ল লেহর মাথাটা। রক্তের নদীর ভেতরে টলে পড়ল তার প্রাণহীন দেহটা। কুর্তার আড়াল থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল টেরাফিমের রূপোর মূর্তি।

দূর বিদেশে স্বামীর সুখ সমৃদ্ধি আর সৌভাগ্যের আকুল কামনায় আজন্ম সংস্কারে গৃহদেবতাকে সঙ্গে নিয়েছিল, নারীজীবনের সর্ব সুখ থেকে নির্মমভাবে বঞ্চিত হয়েও স্বামীর প্রতি নিবিড় অনুরাগে যার মন প্রতিটি মুহূর্তে আবিষ্ট হয়ে থাকত, সেই মহীয়সী রমণীর অসাধারণ আত্মত্যাগের গৌরবোজ্জ্বল ইতিবৃত্ত আছে বাইবেলের পাতায়—ইট ওয়াজ লেহ, ফর দি ওয়েলফেয়ার অফ হার হাসব্যাণ্ড স্টোলেন হাউসহোল্ড গড—টেরাফিম্।

ঘুম আসে না তার চোখে।

রাত বাড়ে। আকাশের চাঁদ একটু একটু করে পশ্চিমে হেলে পড়ে। নীলনদের জল তার ছায়া নিয়ে দুলতে থাকে। রাজপ্রাসাদের পশুশালা থেকে একটা রাতজাগা পাখির কর্কশ স্বর ভেসে আসে।

খট্—খট্—খট্—মিশরের রাজধানী থীবসের কেন্দ্রস্থলে ফারাও দ্বিতীয় রামেসিসের এই বিশাল রাজপুরীর চারিদিকে সান্ত্রি সেনার পদচারণার শব্দ ভেসে আসছে। সারস আর মরালীর উল্লসিত ক্রীড়ায় কুঞ্জবেষ্টিত কমল সরোবরের জলের মর্মরধ্বনিও কর্ণগোচর হয়।

ভো—ও—ও—শিঙার দূরাগত শব্দে মধ্যরাত্রি বিজ্ঞাপিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে থীবসের দশদ্বারের প্রহরীরা দুন্দুভি বাজিয়ে উচ্চকণ্ঠে প্রহর ঘোষণা করে। নিথর নৈশ নীরবতা ক্ষণকালের জন্য বিক্ষুব্ধ করে সেই উচ্চরোল বাতাসের সওয়ার হয়ে দূরে মিলিয়ে যায়।

যুযুপ্ত নগরীর সমস্ত বিচিত্র শব্দের ঐকতান যেন তার মস্তিষ্কের কোষে কোষে মুখর হয়ে উঠেছে। আর কেমন বিকল হয়ে আসছে তার অবসন্ন চেতনা। কিন্তু কি করবে সে—কী করতে পারে? সুরম্য এই শয়নকক্ষের অর্গল মুক্ত করে বাইরে অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রাঙ্গনে চলে যাবে? কিন্তু তারপরে—

প্রায় পাদ ক্রোশ ভূমির ওপরে এই বিশাল রাজপুরীর চারিদিকে পাষাণের প্রাচীর। পূর্বদিকে প্রশস্ত রাজপথের ওপরে প্রধান তোরণের ওপরে অতন্দ্র প্রহরায় নিযুক্ত রয়েছে বিশ্বস্ত মিশরীয় রক্ষীরা। তাদের কারো হাতে তীক্ষ্ণ-ধার বল্লম, কারো হাতে কুঠার। সেই সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত তোরণদ্বার উত্তীর্ণ হলেই উইলো আর উচ্চচূড় ইউক্যালিপট্যাস ও নিবিড় দেওদার বীথি পরিবেষ্টিত প্রশস্ত উদ্যানে নানাবর্ণের ফুলের সমারোহ। সেই উদ্যানের ঘন সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন অঙ্গনের বুক চিরে চলে গিয়েছে রক্তবর্ণ পাথরে নির্মিত একটি সংকীর্ণ পথ। সেই পথ যেখানে শেষ হয়েছে ঠিক সেইখানেই শোভা পাচ্ছে অতিকায় রাজহংসীর মত শ্বেতশুভ্র রাজপ্রাসাদ। তার পশ্চাতেই মহলের পর
তা. প্রাসাদের পর প্রাসাদ—কোনটি কোষাগার, কোনটি আভরণ গৃহ,

কোনটি চিত্রভবন। সকলের পশ্চাতে শীর্ণ অথচ জলপূর্ণ পরিখার গণ্ডী নিবদ্ধ ফারাওয়ের সেনাপতিদের অধিনায়ক প্রবল পরাক্রান্ত রণকুশলী ফটিকারের এই সুবৃহৎ বাসগৃহ! সেনাবিভাগের সর্বাধিনায়ক বলেই হয়তো প্রতিটি প্রাসাদে যত রক্ষী আছে তার দ্বিগুণ প্রহরী এই উচ্চশীর্ষ সৌধের প্রহরায় নিযুক্ত করা হয়েছে। এখন এই গৃহের গণ্ডী উত্তীর্ণ হয়ে বাইরে যাওয়া যে কোন জীবন্ত প্রাণীর কাছে দুঃসাধ্য।

না—কোন উপায় নেই। উপায় নেই, কোন পন্থা নেই কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্মিত সংকীর্ণ ও শ্বাসরোধী এই কক্ষের পরিধি পেরিয়ে কোথাও যাওয়ার। কি করে যাবে পর্বতপ্রমাণ বাধা শুধু নিপুণ তীরন্দাজ মিশরীয় প্রহরী নয়। রাজপুরীর প্রাকারবেষ্টনীর সারিবদ্ধ বল্লমধারী সেনা নয়, প্রতিবন্ধক হল তার সততা, তার নিষ্ঠা, তার সুগভীর আন্তরিকতা। তার প্রতিশ্রুতি, তার কর্তব্যের কারাগারেই সে নিজে বন্দী হয়ে আছে। কে জানে কতদিন কতকাল তাকে থাকতে হবে এই দুঃসহ পরিবেশে।

অথচ এই রাজপুরীর কিঙ্করী, নর্তকী, তাম্বুলিক, সংবাহক, সূপকার, সুহাস্পিত এবং সুবিয় দাসদাসীরা জানে সে কত সুখী। মিশরের ফারাও রামেসিসের অযুত সেনাবাহিনীর অগ্রনায়ক ফটিকারের বাসগৃহের রক্ষক সে। শুধু তাই নয়, সদাসর্বদা সেই সমরনায়কের সান্নিধ্যে থেকে তাঁর পরিচর্যা করে। তাই রাজপুরীর অনেকে তাকে বলে ফাটিফারের সান্নিধাতা। আসন্ন বসন্তে কোন দেশে ফারাওয়ের সেনাবাহিনী রণযাত্রা করবে আর সেই অভিযানে রথারূঢ় কৃষ্ণবর্ণ সুদানী সৈনিকের সংখ্যা কত থাকবে, কত থাকবে মিশরীয় অশ্বারোহী সেনা, ইত্যাদি একান্ত গূঢ় ও গোপন সামরিক তথ্য সে জানে।

তার প্রভু তাকে ভালবাসে। বিশ্বাস করে। যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে তাঁর নির্দেশের কথাগুলো তার কানে বাজতে লাগল, বৎস জোসেফ—আমি জানি তুমি শুধু ক্রীতদাস নও—তুমি বিদেশী তবুও—ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলেন সেনানায়ক। আবার পরমস্নেহে তার পৃষ্ঠদেশে স্পর্শ করে বলেছিলেন, কিন্তু —আমি দেখেছি—তুমি বুদ্ধিমান—তুমি বিশ্বাসী—তুমি সৎ প্রকৃতির—

কি করতে হবে, আপনি শুধু সেই আজ্ঞা করুন প্রভু, সসঙ্কোচে সে বলেছিল।

শোন—তুমি তো জানো, এবারে কোন রণক্ষেত্রে যাচ্ছি, ক্ষণকাল কি চিন্তা করে বললেন, রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করতে অনেক বিলম্ব হবে। আমার র ভাণ্ডার শস্যভাণ্ডার এবং অশ্বশালা নিয়মিত পরিদর্শন করবে—আবার ক

হয়ে তোরণদ্বার পথে অতিক্রান্ত হতে হতে উচ্চ কণ্ঠে বললেন, আমার স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তোমার—

সেইদিন থেকে ফটিফারের প্রাসাদ, এবং অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্যের অস্থায়ী মালিক সে।

বিপুল আত্মপ্রসাদে উদ্দীপ্ত হয়ে সে এখানে থাকতে পারতো। কিন্তু যেই রাত্রি নামে, আর একটু একটু করে ঘন হয় রাত্রি, চারিদিক নিশুতি হয়ে যায়, তখুনি সেই ভয়ঙ্কর আতঙ্ক হিংস্র একটা দৈত্যের মত তার বুকে চেপে বসে। ঘুম কেড়ে নেয় চোখ থেকে। আর বিছানাটায় মনে হয় আগুনের ফুলকি ছিটানো। তার চেতনার ভেতরে যেন অজস্র বিষাক্ত কাঁটা বিদ্ধ হতে থাকে। কেন—কেন এমন হয়?

কেন এমন হয়—তা যে সে একেবারেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না—তা নয়। তার মনের ভেতরে নিজের চেহারাটা ভেসে ওঠে। খাপখোলা তলোয়ারের মত দীর্ঘ আর ধারালো তার তনুরেখা। বড় বড় দুটো চোখে নীলাভ ছায়া। এক মাথা ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো কালো চুল।

তাকে যে দেখে—সে-ই বলে, দেখেছিস, কী সুন্দর ইস্রায়েলীটার চেহারা।

দেবদূতের মত দিব্যকান্তির ওপরে তার নিজেরই ক্রোধ হয়। আক্রোশে জ্বলে। কিন্তু তার কিছুই করার নেই। অবায়বিক গঠনের ওপরে কারো হাত নেই।

সে জানে, স্বাস্থ্য আর যৌবনের সৌন্দর্যে সমুজ্জ্বল তার অনিন্দ্যসুন্দর দীর্ঘ তনুর আকর্ষণে, ঠিক প্রস্ফুটিত পুষ্পের আকর্ষণে যেমন ভ্রমর আসে, এমনি করে।

সে আসে।

আসে গভীর নিশীথে। আর ভয়ঙ্কর সেই প্রস্তাব করে। আর তার সারা শরীরের কঠিন পেশীস্তবকের প্রতিটি কণিকা যেন দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে যায়—

খুট—অন্ধকার অলিন্দে একটা শব্দ হল।

সঙ্গে সঙ্গে জ্যা মুক্ত ধনুকের মত সে উঠে বসল। দ্রুততর হয়ে উঠল হৃদস্পন্দনের গতি। মাথার ভেতরে তীব্র উত্তেজনার জোয়ার বয়ে যেতে লাগল। তার মনে হল—এখুনি- এই মুহূর্তে সে বোধ হয় ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে—

ধপ-ধপ-ধপ—

তার সতর্ক আর সন্ত্রস্ত পদক্ষেপের অস্ফুট শব্দ শোনা যাচ্ছে। সে আসছে। তার মহার্ঘ মসলিনের বস্ত্রাভরণের মৃদু খস খস আওয়াজটাও শ্রুতিগোচর হচ্ছে।

স্বর্ণালঙ্কারের রিনিরিনি শব্দ বাজছে। এখুনি আর কয়েকমুহূর্ত পরে সে এসে পড়বে। তার কজ্জলিত দুটো আয়ত চক্ষুর দৃষ্টিতে থাকবে আমন্ত্রণের ইসারা। মেহেদির রঙে রাঙানো সুডৌল মসৃণ মুখ মরালীর মত তৃষ্ণার্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার মুখের ওপরে। আর পনীরের মত কোমল রক্তবর্ণ অধর দুটো তার গণ্ডদেশে একটি বিহ্বল ও তপ্ত চুম্বন অঙ্কিত করতে উন্মুখ হয়ে উঠবে—

টক-টক-টক—তার শয়নকক্ষের দ্বারে মৃদু করাঘাতের শব্দে তার আগমন সংকেত পরিস্ফুট হয়ে উঠল। নিশীথ বায়ু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল তার দেহবল্লরীর মৃদু সৌরভে। আর রাত্রির সেই মধ্যযামের নিথর স্তব্ধতার ভেতরে দ্রোণফুলের ফুটে উঠল স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর—দরজা খোল জোসেফ, আমি ট্যামার—

তবুও অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই কক্ষে একটা প্রেতচ্ছায়ার মত বসে থাকে সে। আর তার মেরুদণ্ডে হিমশীতল জলের স্রোত বয়ে যায়। অবসন্ন হয়ে আসে তার চেতনা।

জোসেফ—আমি ট্যামার, কেমন ব্যাকুল আর করুণ শোনালো তার কণ্ঠস্বর

খুলবো না, খুলবো না করেও জোসেফ উঠে এল। আসতে হল। তার কথা অমান্য করতে পারে না। ট্যামার যে তার—

জোসেফ, আমাকে—আমাকে ফিরিয়ে দেবে,—

খট্—মেহগিনি কাষ্ঠ নির্মিত সেই দ্বারের ইন্দ্রকীলক মুক্ত করল জোসেফ। আর নিদারুণ আতঙ্কে, উত্তেজনায়, তার দেহমন বিবশ হয়ে গেল। তরল অন্ধকারাচ্ছন্ন অলিন্দে অত্যুজ্জ্বল সেই সর্বনাশা দীপশিখা দাউ দাউ করে জ্বলছে।

ট্যামারের অপর্যাপ্ত কুঞ্চিত কেশদামে দুইটি পদ্মরাগমণি সর্পচক্ষুর মত জ্বল জ্বল করছে। পরিধানে প্রায় স্বচ্ছ, শিথিল শয়নকালীন বস্ত্রাবরণ। তার আড়ালে অবারিত হয়ে উঠেছে বক্ষোবাসের আবরণমুক্ত কঠিন, উদ্ধত দুইটি স্তনভাণ্ড, গুরুনিতম্বের অস্পষ্ট ছায়াভাস।

অধোমুখে দাঁড়িয়ে রইল জোসেফ। খরযৌবনবতীর সেই অনির্বচনীয় অনাবৃত সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারল না। কিন্তু নিরীক্ষণ না করলেও সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। ট্যামার দুইটি চক্ষুর স্থির দৃষ্টি কামনায় আবিল হয়ে উঠেছে আর নিঃশব্দে বলছে, আমরা সরোবর—তোমরা মরাল—তবুও কেন—

কি হল—আমাকে কি অলিন্দেই দাঁড় করিয়ে রাখবে জোসেফ—কেমন সকরুণ শোনালো তার কোমল কণ্ঠস্বর। বলল, ক্ষণকালের জন্যেও কি আমাকে তোমার শয়নকক্ষের অভ্যন্তরে যেতে দিতে তোমার অসম্মতি—

না-না-তা কেন, প্রেতাবিষ্ট মানুষের মত অস্ফুটস্বরে বলল, জোসেফ—এস-না, এস—

নিতান্ত নিরুপায় হয়ে জোসেফ তাকে নিয়ে এল। আর যেই চর্বির তৈলে পরিপূর্ণ রৌপ্যনির্মিত বর্তিকায় অগ্নিসংযোগ করতে উদ্যোগী হল অমনি তাকে বাধা দিয়ে ট্যামার বলল, আলোর প্রয়োজন নেই। এই ঘন অন্ধকারেই তোমাকে দেখতে আমার ভালো লাগে—

জোসেফ মস্তক অবনত করে দাঁড়িয়ে রইল। নিদারুণ ত্রাসে হিম হয়ে গেল তার বুকের রক্ত। তার প্রশস্ত ললাটে স্বেদবিন্দু দেখা দিল।

জোসেফ, আমাকে দেখলে তোমার হৃদয়ে কোন চাঞ্চল্য জাগে না, ক্ষীণ কণ্ঠে বলতে বলতে তার নিশ্বাসের সীমানায় ঘনীভূত হয়ে বসে ট্যামার। আর পরম আদরে তার প্রশস্ত বুকে আলতো করে হাত বুলিয়ে দেয়।

জোসেফের মনে হয়, ট্যামারের লুব্ধ আর মত্ত আঙুলগুলি যেন বিষাক্ত সরীসৃপের মত তার দেহ বেয়ে উঠছে। পরম প্রার্থিত বস্তুকে কাছে পাওয়ার আনন্দে ট্যামারের বুকের ভেতরে জলতরঙ্গের ঝঙ্কার বাজছে। তার স্নায়ুতে তরঙ্গায়িত হয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে তীব্র একটা উত্তেজনা। কামনার জ্বরে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে তার সারা দেহ। লেলিহান অগ্নির ঝড় বয়ে যাচ্ছে মস্তিকের ভিতরে। তার ইচ্ছে করছে, জোসেফের দেওদারের মত দীর্ঘ দেহে একটা ঢেউয়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে গ্রাস করে নিতে, ইচ্ছে করে তার প্রশস্ত বলিষ্ঠ বুকে নদী হয়ে মিশে যেতে।

এখন নিশিরাত ঝাঁ ঝাঁ করছে বাইরে। বিশ্বচরাচরে কোন প্রাণী জেগে নেই। চারিদিকে মৃত্যুর মত নিথর স্তব্ধতা। কিন্তু—

কেন জোসেফ তুষারাবৃত পাহাড়ের মত হিমশীতল আর কঠিন—কেন সে তার শিথিল বেশবাসের আবরণটাকে এক টান দিয়ে খুলে ফেলে তার নারী-দেহের অপূর্ব সম্ভারকে উন্মত্তের মত সম্ভোগ করছে না?

এই নিঃশব্দ পায়ে সে যে এসেছে নিজেকে নিঃশেষে উজাড় করে দিতেই—ঠিক ভক্ত যেমন নিজের সর্বস্ব নিবেদন করে দেবতার উদ্দেশ্যে।

নিজেকে আর সংযত করতে পারল না। তার অনিন্দ্যসুন্দর তনুদেহ নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে অধরে চুম্বন করল ট্যামার। দক্ষিণহস্তের করতল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে সরে দাঁড়াল জোসেফ। ফটিফারের ভারী মুখখানা তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। যেন বহু—বহুদূর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল ট্যামার, এস জোসেফ—শয্যায় যাবে না?

—না—না তোমাকে তো কতবার বলেছি, আমি পারব না—কিছুতেই পারব না—

—কেন, আহতা ব্যাঘ্রীর মত গর্জন করে উঠল ট্যামার।

মস্তক অবনত করে জোসেফ বলল, আমি অবিশ্বাসী হতে পারব না। তুমি আমার প্রভুপত্নী—

একটা কথাও বলতে পারল না ট্যামার। প্রত্যাখ্যানের চরম অপমান যেন আগুনের ফুলকির মত তার রোমকূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ল। শুধু আক্রোশভরা চোখদুটো সাপিনীর জিভের মত চিক চিক করে উঠল। আর কিছু না বলে মাথা নীচু করে বেরিয়ে গেল প্রাঙ্গনের তরল অন্ধকারে।

তার অপস্রিয়মান দেহরেখার দিকে তাকিয়ে বুক উজাড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল জোসেফ। কেন ট্যামার বোঝে না—বুঝতে চায় না, তার বাধাটা কোথায়—

দিবালোকে কিন্তু সব অন্যরকম। যেন কেউ কাউকে চেনেই না। দুজন যেন দুটো ভিন্ন ভিন্ন দূরগ্রহের বাসিন্দা। সম্রাজ্ঞীর মত একটা সুদূর আর রহস্যময় ব্যবধান বজায় রেখে চলে ট্যামার।

জোসেফ বিপুল আনন্দে নিজের কাজে মত্ত হয়ে থাকে। ফারাওয়ের প্রধান সেনাধক্ষ্য। তাই রাজপ্রাসাদের মত বিশাল বাসগৃহ। সূপকার, কিঙ্করী কঞ্চুকী (অন্তপুররক্ষক) এবং আরও বহুবিধ দাসদাসীর কর্মকোলাহলে মুখরিত সেই গৃহের প্রতিটি মহল পরিদর্শন করে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে ভৃত্যরা প্রত্যেকে তাদের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করছে কি না। তারপরেই বেরিয়ে যায়, নীলনদের তীরে মিশরীয়দের দেবভূমি ডেহারী এল-বাহরীতে আমেন, আপ্ত বা ওসিরিসের শ্বেতপাথরে নির্মিত মন্দির ছাড়িয়ে প্রভুর সুবিশাল শস্যক্ষেত্রে।

সেইখানে-ই দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে সে সময়টাকে উত্তীর্ণ করে দেয়। প্রাসাদে ফিরে যেতে মন চায় না। সেই নিশীথ রাত্রির অপঘটনার কথা মনে হলেই নিদারুণ একটা যন্ত্রণা তাকে যেন শতমুখ দিয়ে বিদীর্ণ করতে থাকে। দ্বিপ্রহরের জ্বলন্ত সূর্য প্রচণ্ড তাপ বিকীরণ করে। বিশ্বচরাচরে ব্যপ্ত সেই দাবদাহ যেন তার চেতনাকে তিলে তিলে দগ্ধ করে। ট্যামার কি জানে, কে সে, কি তার আসল পরিচয়—সে কী শুধু ফটিফারের ইস্রায়েলী ক্রীতদাস?

নবোদ্ভিন্ন যৌবনের অপর্যাপ্ত সম্ভারকে অবারিত করে যখন ট্যামার নিশীথ অভিসারে তারই শয়নকক্ষে আসে, তখন সে কেন হিমশীতল

শবদেহের মতো অনড় হয়ে বসে থাকে—কেন ওর দেহলতাকে নির্মম পীড়নে বিমথিত করে উন্মত্তের মত সম্ভোগ করতে পারে না।

বক্ষপঞ্জর বিদীর্ণ করে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে জোসেফ।

সেদিন দুবিয়া ক্রীতদাসদের ডেকে প্রভুর গৃহের সুদৃশ্য রথটি পরিমার্জনা করতে নিযুক্ত করল। গৃহে প্রত্যাবর্তন করে রথারূঢ় হয়ে প্রভু নীলনদে সিন্ধুঘোটক শিকারে যাবেন প্রাসাদের চারিদিকে দ্রুত পদক্ষেপে পরিক্রমা করে ভৃত্যদের নানাবিধ কাজে নিযোজিত করল জোসেফ।

কিন্তু সে জানতে পারল না, দূরে প্রভু শয়নকক্ষের গবাক্ষ থেকে একজোড়া চোখের খরদৃষ্টি তাকে অনুসরণ করছে। জানতে পারল না, তার বুকের ভেতরে তীব্র একটা জ্বালা তুষাগ্নির মত ধিকি ধিকি জ্বলছে।

প্রভাতের নবোদিত সূর্যের আলোর গোলকটা জোসেফের মস্তিষ্কের চারিদিকে জ্যোতিশিখার মত পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে। ট্যামারের মনে হল স্বর্গলোক থেকে যেন নেমে এসেছে কোন দেবদূত! কিন্তু সুদর্শন এই ইস্রায়েলী ক্রীতদাসের অলৌকিক যৌবনশ্রী, পৌরুষদৃপ্ত দেহ সৌষ্ঠবের অন্তরালে আছে—নিশ্চয়ই আছে কোন বেদনাদীর্ণ ঘটনা, আছে কোন দুরতিক্রম্য বাধা। তা নাহলে—

কিন্তু কি সেই বাধা, কোন অদৃশ্য দৃঢ়তার প্রলেপে সে নিজেকে সংযত করে রাখে?

গৃহকর্মের যাবতীয় ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে করে জোসেফ হৃষ্ট মনে যাত্রা করল প্রভুর শস্যক্ষেত্রে প্রতিদিন যেমন যায়।

কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত রাজপথ প্রকম্পিত করে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ এবং শ্রেষ্ঠীদের সুদৃশ্য রথ ঝড়ের গতিতে চলেছে দেবভূমি ডেহরী-এল-বাহরি অভিমুখে। শকটের সম্মুখে কোন স্বর্ণভাণ্ডে আছে সুগন্ধী গোলাপবারি, কোনটায় আছে আরবিয় গন্ধধূপ—দেবতার পূজার জন্য আরও রাশি রাশি মহার্ঘ উপচার।

মিশরীয়রা কখনো স্বীকার করে না ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, এবং তিনি নিরাকার ও অনন্ত শক্তিমান সদাপ্রভু জীহোভা। তারা শুধু মূর্তিই পূজা করে না, অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্য নিঃশেষ করে তৈরি করে শ্বেতপ্রস্তরের কারুমণ্ডিত দেবালয়। সেখানে এক একটি দেবতাকে সপরিবারে প্রতিষ্ঠিত করে! মিশরীয়দের আজব কাণ্ড দেখলে তার হাসি পায়। কিন্তু সে বিদেশী, তদোপরি ক্রীতদাস। তাই—

খট্-খট্-খট্ –হঠাৎ বাতাসে ভেসে উঠল অশ্বক্ষুরের ধ্বনি। সুসজ্জিত একটি

রথ দ্রুত গতিতে আসছে! অশ্ব দুইটির গলদেশে স্বর্ণমণ্ডিত রজ্জুতে আবদ্ধ ক্ষুদ্রাকৃতি রৌপ্যনির্মিত ঘণ্টিগায় শব্দ বাজছে ঠুন-ঠুন-ঠুন—

আরোহী এক সালঙ্করা রূপসী রমণী!

জোসেফের মনে হল, হয়তো কোন স্বর্ণশ্রেষ্ঠী কি কোন ভিজিরের পত্নী চলেছেন মন্দিরে। সে নিজের চিন্তার ভেতরে মগ্ন হয়ে দ্রুত পদক্ষেপে হাঁটছিল, তেমনি হাঁটতে লাগল।

ঠুন-ঠুন ঠুন—ক্রমশঃ প্রবল হযে উঠল ঘণ্টাধ্বনি। নিকটবর্তী হয়ে উঠল অশ্বক্ষুরের শব্দ। আর যেই স্পষ্ট দৃশ্যগোচর হল অশ্বশকট অমনি জোসেফের হৃদস্পন্দন যেন আকস্মিক স্তব্ধ হয়ে গেল।

প্রভুপত্নী ট্যামার!

জোসেফ—তুমি এই মুহূর্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করো, সারথি সাঁডিয় এক কিশোর ট্যামারের স্নেহধন্য মেন্না হেঁকে বলল, রত্নভাণ্ডারে যেয়ে দেখবে দেবতার পূজার অর্ঘ সাজানো আছে, সেসব অবিলম্বে নিয়ে ডেহরী এল-বাহরিতে আসবে —আ র রাজপথ কম্পিত কবে দ্রুত ধাবমান হয়ে গেল রথ। আর রথারূঢা সালঙ্কবা ট্যামার তার দিকে মুহূর্তের জন্যও দৃষ্টি নিবদ্ধ করল না। বায়ুমণ্ডলে আতরের মিষ্টি সৌরভ সঞ্চারিত কবে দিয়ে দেবলোকের অপ্সরীর মত দূব দিগন্তরেখায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল জোসেফ।

সর্বসাক্ষী নীলনদের অবিরাম জলপ্রবাহের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল— আবার নতুন কোন ছলনার রঙীন জালে আবদ্ধ করার প্রয়াস করছে এই সর্বনাশা কুহকিনী! কবে—কবে রণক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন করবে তার প্রভু। তীব্র অস্থিরতায় তার মুখাবয়ব বিকৃত হয়ে উঠল। তবুও—প্রভুপত্নীর নির্দেশ। তাই প্রাসাদে যেতেই হল। কিন্তু—

রত্নভাণ্ডারে প্রবেশ করেই বিস্ফারিত হয়ে গেল জোসেফের দুই চক্ষুর দৃষ্টি! একটি, দুইটি নয়, দশটি স্বর্ণভাণ্ডে শোভা পাচ্ছে মহার্ঘ আরবিয় সুগন্ধী ধুনো। আছে বৈদুর্যমণি, কর্কতের, পুষ্পরাগ আর মুক্তা—এত অপর্যাপ্ত সম্পদ এক অলীক দেবতাকে অর্ঘ দেবে। বিদ্যুতচমকের মত ফটিফারের সরল হাস্যপ্রদীপ্ত মুখখানা মনের মধ্যে ভেসে উঠল। প্রভুর অনুপস্থিতিতে তাঁর কষ্টার্জিত ঐশ্বর্যের অপচয়। তার একটা গুরুদায়িত্ব আছে। তার সততা, তার নিষ্ঠার জন্যই প্রভু তাকে উন্নীত করেছেন সাধারণ নগণ্য ক্রীতদাস থেকে 'সাক্ষে' অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ সম্ভ্রান্ত ক্রীতদাসে তাই—

শুধু একটি মাত্র স্বর্ণভাণ্ড নিয়ে এল থীবসের সুবিখ্যাত নয়নাভিরাম দেবভূমি ডহরী-এল-বাহরিতে। প্রায় এক ক্রোশ ভূমির চারিদিকে শ্বেতবর্ণ প্রস্তরের প্রাচীর। তার ভেতরে অপূর্ব কারুশিল্পমণ্ডিত উচ্চশীর্ষ অনেক দেবায়তন মিলে যেন এক ইন্দ্রভূবন রচনা করেছে।

সে অপৌত্তলিক। কখনো আসে নি এখানে। এক একটি মন্দিরের বৈচিত্র্যময় কারুশোভা এবং নানাবিধ দেবমূর্তির গঠন সৌষ্ঠব দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

সর্বপ্রথমে সুদৃশ্য মন্দিরের স্বর্ণমণ্ডিত উচ্চশীর্ষে প্রভাতসূর্যের রক্তচন্দনের মত আলোয় অত্যুজ্জল রঙীন মরীচিকার মত জ্বলছে। প্রশস্ত অলিন্দ অতিক্রম করে এল দেবমূর্তির সম্মুখে। শ্বেতশুভ্র প্রস্তরে নির্মিত সুঠাম তনু এক অনিন্দ্যসুন্দর যুবাপুরুষ! কিন্তু—কেন তার মস্তকে একটি শ্বেতপক্ষী বিস্তার করে উড্ডীয়মান, কেন তার বর্ণাঢ্য মূর্তির চারিদিকে সূর্যমণ্ডলের প্রদীপ্ত জ্যোতি! ইনি-ই কি মিশরীয়দের অগ্রগণ্য দেবতা আমেন? কিন্তু—

সে যাইহোক—কোথায় সেই কুহকিনী, কোথায় কোন দেবায়তনে তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। তীব্র একটা অস্বস্তির কাঁটায় ক্ষত বিক্ষত হতে লাগল তার মন। চোখদুটো ছড়িয়ে দিল সেই বিশাল দেবভূমির প্রান্তসীমায়। যতদূর চোখ যায়, প্রখর সূর্যালোকে ঘন সন্নিবদ্ধ দেবালয়গুলির উচ্চশীর্ষ এক একটা সুদীর্ঘ অগ্নিশিখার মত জ্বলছে।

ট্যামার অন্বেষণে এল দ্বিতীয় দেবায়তনে। গন্ধধূপ আর তীব্র সুগন্ধী অগুরুর সৌরভে আমোদিত প্রকোষ্ঠে শোভা পাচ্ছে এক হাস্যোচ্ছল সুখী দেবসংসার। অসাধারণ রূপবান আর তরুণ দেবতার শিরোদেশে রত্নখচিত উজ্জ্বল মুকুট। কিন্তু কে জানে, কেন তার হাতে একটা প্রস্ফুটিত পদ্মফুল, আর এক হাতে জ্যোতির্ময় সূর্য। তার সন্নিকটে সুঠাম ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে এক রূপরম্যা রমণীমূর্তি। তার গুরুনিতম্বে রত্নসূত্র, উদ্ধত আর কঠিন দুইটি কুচকলিকা যেন কিসের আবেগে কোমল হয়ে রয়েছে। কিন্তু তার আয়ত চোখদুটোতে ম্লান, বিষণ্ণ দৃষ্টি! পাষাণ ভেদ করেও ফুটে উঠেছে তার মুখাবয়বে এক গভীর বেদনাদীর্ণ অভিব্যক্তি! কে জানে এই রমণীই বোধহয় সেই যুবাপুরুষের পত্নী।

জোসেফ—এই যে—আমি এখানে—পূর্বমুখী অলিন্দ থেকে ভেসে এল ট্যামারের কণ্ঠস্বর।

ধীর পদক্ষেপে তার সম্মুখে এল জোসেফ। তার হাস্যপ্রদীপ্ত মুখের দিকে

তাকাতে পারল না জোসেফ। অজানিত একটা আশঙ্কায় তার বুকের ভেতরে ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।

কী ব্যাপার, তুমি একটি মাত্র স্বর্ণভাণ্ড নিয়ে এলে কেন? মৃদুকণ্ঠে বলল ট্যামার। তার কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো। আবার বলল, আমি আরো নয়টি স্বর্ণভাণ্ডে আরবিয় গুগগুল (ধুনো) রেখেছিলাম—তার সঙ্গে ছিল বৈদুর্যমণি—

জানি—ইচ্ছে করেই সেসব নিয়ে আসি নি—

কেন? ট্যামারের কজ্জলিত দুটো আয়ত চোখে তীক্ষ্ণদৃষ্টি পরিস্ফুট হয়ে উঠল। কয়েক মুহূর্ত কি চিন্তা করে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, বুঝতে পেরেছি তোমার প্রভুর অনুমতি না নিয়ে—

না—না—তা ঠিক নয়, অস্ফুটস্বরে বলল জোসেফ। তার মুখে সঙ্কোচের ছায়া পড়ল।

কোন কথা বলল না ট্যামার। দূরে নীলনদের অফুরান জলধারার দিকে তার চোখদুটোকে প্রসারিত করে দিয়ে নিজের ভেতরে মগ্ন হয়ে অস্ফুটস্বরে বলল, তুমি জানো না, অপর্যাপ্ত গন্ধধূপ দিয়ে দেবতার অর্ঘের আয়োজন করে-ছিলাম—তোমার প্রভু জানতে পারলে সন্তুষ্ট-ই হতেন—

নিরুত্তর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জোসেফ। আর তার দুটো চোখে বিস্ময়ের দৃষ্টি ফুটে উঠল। এই দেবমন্দিরের বিস্তীর্ণ অলিন্দের প্রান্তে দণ্ডায়মান ওই শ্বেতবসনা রমণীর ম্লান বিষণ্ণ মূর্তির ভেতরে কোথাও সেই বিগত রাত্রির হাস্যোজ্জ্বল অভিসারিকাকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

এস—আমার সঙ্গে, জোসেফের জিজ্ঞাসু দৃষ্টিকে অনুসরণ করে বলল ট্যামার। সম্মোহিতের মত জোসেফ তার সঙ্গে গেল। দেবালয়টি প্রদক্ষিণ করে অপরূপ কারুশোভায়মণ্ডিত একটি দেওয়াল গাত্রে খোদিত ঘনসন্নিবদ্ধ তরুশ্রেণীর দিকে ইঙ্গিত করে বলল, এই গাছগুলো হল দেবতরু অর্থাৎ ধূপগাছ, ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ থেকে আবার বলল, আমাদের বিশ্বাস যত অধিক পরিমানে গন্ধধূপের উপচার দেওয়া যাবে, তত বেশি প্রসন্ন হবেন দেবতা—

আমি এখুনি এনে দিচ্ছি, অপরাধীর মত বলল জোসেফ। আমি তো এদেশের মানুষের ধর্মকর্মের রীতিনীতি জানি না, বলেই প্রস্থোনোদ্যত হল।

পালিয়ে যেতে চেষ্টা করছো, অস্ফুটস্বরে বলল ট্যামার। গভীর ব্যথার ছায়া ফুটে উঠল মুখে। কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সংযত করে স্পষ্টকণ্ঠে বলল, মেয়াকে পাঠিয়ে দিয়েছি—তোমাকে যেতে হবে না—বলেই স্থির আর অপলক

চোখে জোসেফের দেওদারের মত দীর্ঘতনুর অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে রইল। আর কেন যেন শাণিত ছুরিকার মত ধারালো হাসি ঝিলমিল করে উঠল তার মুখে।

জোসেফ—তুমি—কেন সদাসর্বদা বিষণ্ণ হয়ে থাকে, কেমন ব্যাকুল করুণ কণ্ঠে বলল ট্যামার, তোমার দুঃখ কিসের? আমাকে বলবে না?

প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল জোসেফ। আর সাবেকদিনের লোনা ঘাম আর তাজা রক্তমাখা এক একটি ভয়াবহ অপঘটনা মৃতের মত নিষ্পলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে যেন মনের ভেতরে মিছিল করে চলে যেতে লাগল।

তুমি ক্রীতদাস হলেও তোমার প্রভু তো তোমার সঙ্গে অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করে জোসেফ—

না—না—অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল জোসেফ। আর তীব্র যন্ত্রণায় মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠল। প্রায় নিঃশব্দ গলায় বলল, তোমাকে বলবো—সব বলবো—

মানুষ কেন দেবতারাও দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পায় না জোসেফ, যেন কিছুটা সান্ত্বনার সুরে বলল ট্যামার। আর পরম আদরে তার দক্ষিণহস্ত আকর্ষণ করে নিয়ে এল দেবায়তনের অভ্যন্তরে। সেই প্রদীপ্ত তরুণ দেবতার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, শোন ওঁর নাম ওসিরিস—উনিও আমেন, রা, এবং আপ্তের মতই আর এক সূর্যদেবতা। তাই ওর মাথায় স্বর্ণের প্রভায় উজ্জ্বল মুকুট। আর হাতের পদ্মফুল হল—বিশ্বচরাচরের মানুষের কল্যাণের প্রতীক আর তাই তাঁর আর এক হাতে জীবে, উদ্ভিদে প্রাণদায়িনী প্রদীপ্ত সূর্য, বলতে বলতে আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল ট্যামার। আর যুগযুগান্তর ধরে তার রক্তে বহমান সরল ধর্মবিশ্বাসের আলোয় চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যেন অভিভূত একটা আচ্ছন্নতার অতলে নিমগ্ন হয়ে বলল ট্যামার, জানো, এই ওসিরিস, যিনি মানুষের কল্যাণের জন্যই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, যিনি জগতের মানুষকে প্রথম কৃষিকাজ ও বাণিজ্য শিখিয়েছিলেন। তাকেও প্রাণ দিতে হয়েছিল তারই একমাত্র পুত্র টাইফেনের হাতে—

কেন?

কেন আবার, হিংসা—পিতার অসাধারণ খ্যাতি সে সহ্য করতে পারছিল না, একটু স্তব্ধ হল। আবার জোসেফের দিকে খরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, শুধু কি হত্যা করেছিল—ধারালো খড়্গ দিয়ে কেটে কেটে ওসিরিসের দেহ শত খণ্ড করে একটি বৃহৎ পেটিকায় ভরে—

আর বলো না—বলো না ট্যামার, হঠাৎ বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠল জোসেফ। দুই হাতের দুই আঙুল দিয়ে শক্ত করে কান চেপে ধরে বদ্ধ উন্মাদের মত চীৎকার করে বলল, আমি আর শুনতে পারছি না—পারবো না ট্যামার—

তার উত্তেজিত উদভ্রান্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে বিদ্যুতচমকের মত তার মনের অন্ধকারে ঝলসে উঠেই মিলিয়ে গেল একটা সন্দেহ। এইরকম কোন নৃশংস ঘটনাই ওর মনটাকে বিকৃত করে দেয় নি তো? কিন্তু সেসব প্রসঙ্গে একটি কথা না বলে ট্যামার মৃদু হেসে সেই অস্বস্তিকর আর শ্বাসরোধী পরিবেশকে লঘু করার জন্যই বলল, তারপরে শোনোই না—

ওসিরিসের পাশে যাঁকে দেখছ উনি তাঁর স্ত্রী ওয়াসিস। ওয়াসিস নিদারুণ শোকে ভেঙ্গে পড়লেন। জানো—তারই চোখের জলে নীলনদের জলের রং—নীল। কিন্তু—স্তব্ধ হল ট্যামার। তার চোখদুটো উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। গভীর আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলল, কিন্তু ওয়াসিস নিশ্চেষ্ট আর হতাশ হয়ে বসে থাকার মত রমণী নন। ওই যে তার ডান হাতে একটা লাঠির মত দেখছ—ওটা হল বল্কল অর্থাৎ বৃক্ষচর্মে আবৃত যাদুদণ্ড। সেই ঐন্দ্রজালিক দণ্ড দিয়ে স্বামীকে পুনর্জীবিত—

ভো—ও—ও—ও—চতুপার্শ্বের বায়ুতরঙ্গে শিহরণ জাগিয়ে দিয়ে দেবায়তনের অভ্যন্তরের প্রাঙ্গন থেকে শিঙ্গা বেজে উঠল।

চলো—জোসেফ—পুরোহিত ঘোষণা করছেন, এখন বৃষ বলি হবে—কিন্তু ট্যামারের কথা শেষ হওয়ার আগেই চারিদিক প্রকম্পিত করে বেজে উঠল ডঙ্কা—ডং ড্যাডাং-ড্যাং—আর ঢং ঢং-করে বাজতে লাগল ঘণ্টা! ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠল সেই ডঙ্কানিনাদ আর উদ্দাম ঘণ্টাধ্বনি—

হা—ম্বা—আকস্মিক সেই আকাশ বাতাস আলোড়িত করা ঐকতানকে ছাপিয়ে শোনা গেল সেই বৃষের অন্তিম আর্তনাদ—

আমি আর পারছি না ট্যামার থর থর করে কম্পিত হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল জোসেফ। মুমূর্ষ মানুষের মত ক্ষীণ অস্ফুট কণ্ঠে বলল, আমাকে বাইরে যেতে দাও—

কেন—কেন—ওরকম করছো জোসেফ, তাকে বুকের ভেতরে জড়িয়ে ধরে অস্থির কণ্ঠে বলল—তোমাকেও কি কখনো কেউ খুন করতে—

না—না—ওসব কথা শুনতে চেও না ট্যামার, বাদবাকী কথাগুলো অবরুদ্ধ ব্যথার উজান ঠেলে আর বলতে পারল না।

জোসেফ বলেছিল।

বলেছিল ট্যামারকে তার জীবনের সেই ভয়াবহ আর বীভৎস দুর্ঘটনার কথা। কিন্তু যেমন দীর্ঘ আর তেমনি করুণ সেই বিবৃতি। আর তার ভেতরে ছিল অনেক আবেগ, অনেক অসংযত উচ্ছ্বাস। যেসব বাদ দিয়ে এখানে খুব সংক্ষেপে বলা হল তার বক্তব্য—

জোসেফের নিবাস প্যালেস্তাইনের সুজলা সুফলা দেশ সেই কনানে। পিতা হীব্রুদের আদিপুরুষ অ্যাব্রাহামের উত্তরসূরী জ্যাকব। একটি, দুটি নয় সাতটি পুত্র তার। কিন্তু একমাত্র জোসেফ ব্যতীত অন্যান্য ছেলেরা ছিল অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল এবং দুর্বৃত্ত স্বভাবের। তাই জোসেফকে অত্যন্ত বেশি ভালবাসতো জ্যাকব! ছেলেরা ভেড়ার পাল নিয়ে মাঠে যেত দিনান্তে জ্যাকব দেখত একটি কি দুইটি ভেড়ার কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

জোসেফ কে গোপনে তাদের অনুসরণ করতে বলল। জোসেফ ফিরে এসে জ্যাকবকে জানালো, কোনদিন তারা সিরিয়া কি টায়ারের বণিকের কাছে উচ্চমূল্যে মেষ বিক্রয় করে, কোনদিন প্রবীন মেষের সুমিষ্ট মাংসে উদরপূর্তি করে!

জোসেফের এই গুপ্তচরবৃত্তির কথা জানতে পারল তারা। আর বুকের ভেতরে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলতে লাগল। আর কিছুদিন পরে সেই অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিল তার রক্তবর্ণ স্বর্ণসূত্রখচিত মসলিনের কুর্তা। জ্যাকব তাকে আদর করে উপহার দিয়েছিল!

জ্যাকবের গভীর স্নেহ, তার ওপরে অগাধ বিশ্বাস সর্বোপরি সেই মহার্ঘ মসলিনের পোশাক-ই জোসেফের কাল হয়েছিল—এই পর্যন্ত থামল সে।

কেন—ছোটভাইকে যদি বাবা ভালবেসে কোন উপহার দেনই তাতে বড়দের হিংসা কেন? গভীর সহানুভূতিতে কেমন ভিজে ভিজে মনে হল ট্যামারের কণ্ঠস্বর!

তুমি তোমাদের ওসিরিসের কাহিনী বলছিলে না, করুণ দুটো চোখের ক্লান্ত আর অবসন্ন দৃষ্টি ট্যামারের মুখে নিবদ্ধ করে বলল, জোসেফ টাইফোন তো পিতৃহত্যা করেছিল। যে মানুষ যে রকম অন্য সবাই তার মত হোক এটাই চায় সে। তা না হলেই হিংসার আগুন জ্বলে ওঠে। ট্যামার—দূরে নীলনদের নীল জলরাশির দিকে চোখ দুটো ছড়িয়ে দিয়ে নিশ্চল প্রস্তর মূর্তির মত বসে রইল জোসেফ। আবার নিজের মনেই অস্ফুটস্বরে বলল, আমি তো তাদের মত ছিলাম না। আমি আমাদের দেবতা জীহোভার ভক্ত। সকাল

সন্ধ্যা তাঁর আরাধনা না করে অন্নজল গ্রহণ করতাম না। মিথ্যা কথা বলতে পারি না—

তা তো হল—তুমি ক্রীতদাস হলে কি করে, সেসব বলো জোসেফ—দেবদূতের মত তার প্রদীপ্ত মুখাবয়বের দিকে স্থির আর অপলক চোখে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল ট্যামার, তোমাকে দেখে আমার প্রথমদিনই মনে হয়েছিল।

সে ইতিহাস যেমন নিষ্ঠুর, নৃশংস তেমনি করুণ ট্যামার, বলতে বলতেই দশ বছর আগের সেই ভয়াবহ দুঃস্মৃতির পীড়নে তার মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠল। অস্ফুটস্বরে বলল, সেদিনের কথা মনে হলে আমার সারা দেহে শিহরণ বয়ে যায়।

ব্যথার ছায়া ফুটে উঠল ট্যামারের চোখে।

তবুও বলো—আমাকে বলো জোসেফ, গভীর মমতায় কেমন কোমল, আর স্নিগ্ধ মনে হল তার কণ্ঠস্বর।

একদিন ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করছি, মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে বলতে শুরু করল জোসেফ, এমন সময় ওরা আমাকে ধরে ফেলল। হাত-পা বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে আমাকে পাঁজাকোল করে একটা কুয়োর ভেতরে ফেলে দিল—

ইস্—অস্ফুট আর ভয়ার্ত একটা শব্দ বেরিয়ে এল ট্যামারের মুখ থেকে।

কুয়োটা ছিল অকেজো, মজে যাওয়া, যেন অনেক-অনেক দূর থেকে ভারী গলায় বলতে শুরু করল জোসেফ, কাঁটাগাছ আর পাথরের নুড়িতে ভরা সেই অন্ধকার গহ্বরে বসে আমি নিশ্চিত মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি—

আমি—আমি আর শুনতে পারছি না জোসেফ, অগ্নিদগ্ধ সাপিনীর মত মর্মান্তিক যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বলল ট্যামার। পরম আবেগে তার একটা হাত নিজের হাতের মুঠোর ভেতরে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে তীব্র উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে লাগল।

তারপরে যা হয়েছিল, সে—ইতিবৃত্ত আছে বাইবেলে।

জোসেফ সেই বিষাক্ত কণ্টকতরু আর নুড়ি প্রস্তরে আকীর্ণ কূপের ভেতরে অনিবার্য মৃত্যুর দিকে তিলে তিলে এগিয়ে চলেছিল। আশ্চর্য সেই অন্তিম মুহূর্তে তার কর্ণগোচর হয়েছিল, সহোদর ভ্রাতাদের উল্লসিত অট্টহাসি। তারপরে আওয়াজ শুনে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পেরেছিল—উচ্ছ্বসিত আনন্দে তারা পিষ্টক আর সুস্বাদু ছাগ মাংস দিয়ে বনভোজনের উৎসবে মত্ত হয়ে উঠেছিল।

নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিহাস! সেসব খাদ্য কণিকা তাদের গলনালী দিয়ে

অতিক্রান্ত হয়ে গেল। সামান্যতম বাধার সৃষ্টি করল না—ইট ভিত্ত নট চোক দযার মাউথ।

ডিং—ডং—ডিং—ডং—এমন সময় বহুদূর থেকে উটের গলার ঘণ্টার ধ্বনি ভেসে এল। মনে হল যেন কোন দূর দেশের বণিকদের কাফিলা চলেছে।

আচ্ছা—বাবার আদরের দুলালটাকে বণিকদের কাছে বিক্রি করে দিলে হয় না, মেজভাই জুডার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তার প্রস্তাবটি সমর্থন করল অন্যান্য ভাইরা। সেই সওদাগরদের কাছে তাকে বিক্রি করে দিল তারা।

কাফিলাটি ছিল মিডিয়া থেকে ইসমোলিয়াগামী মিশরীয় সার্থবাহদের ক্যারাভান। তারা আবার ফারাওয়ের সেনাধ্যক্ষ ফটিফারের কাছে বিক্রয় করেছিল জোসেফকে—এই পর্যন্ত বলে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল সে। আবার থেমে থেমে অস্পষ্ট আর ঝাপসা কণ্ঠে বলেছিল, আমার ভ্রাতারা তাদের নৃশংস দুষ্কার্যটির পরিসমাপ্তি করেছিল একটি হীন, জঘন্য কৌশল করে।

কি?

বণিকদের কাছে বিক্রয় করার আগে আমার জামাটা টেনে খুলে নিয়ে তাতে রক্ত মাখিয়ে নিয়েছিল—

বৃষ-বলির উৎকট উল্লাস স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

দর্শক এবং পূজার্থীরা চলে গিয়েছে অনেকক্ষণ আগে। নিথর স্তব্ধতায় খাঁ খাঁ করছে মন্দির প্রাঙ্গন। নীলনদের ওপর দিয়ে বয়ে আসা হিমশীতল বাতাস জনমানব শূন্য বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে অব্যক্ত যন্ত্রণার গোঙানির মত আর্তনাদ করছে।

আমার পিতা, আত্মীয়-পরিজনের কাছে আমি মৃত ট্যামার, অবরুদ্ধ কান্নায় ভারাক্রান্ত বিকৃত কণ্ঠে বলল, জোসেফ। জীহোভাই জানেন, আর কখনো বাবাকে দেখতে—

দুঃখ করো না জোসেফ, তার ঘন কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশদামে পরিপূর্ণ মস্তকটি বুকের ভেতরে আকর্ষণ করে বলল ট্যামার আমি তো আছি—

খট্—খট—খট্—দ্রুত ধাবমান অশ্বক্ষুরের ধ্বনিতে প্রকম্পিত হল দেবায়তন সংলগ্ন রাজপথ। ক্ষণকাল পরেই প্রাঙ্গনে প্রবেশ করল এক সশস্ত্র সৈনিক। ট্যামারকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, উত্তর সিরিয়ার জুরু রণাঙ্গন থেকে হিটিটিদের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন সেনাধ্যক্ষ। আগামীকল্য প্রভাতে প্রত্যাবর্তন করছেন তিনি, বলেই অশ্বারূঢ় হয়ে চলে গেল সে।

খুশির আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল জোসেফের মুখাবয়ব।

ট্যামারের চোখে নেমে এল গভীর বিষাদের ছায়া।

ফটিফার আসছে।

জোসেফ। মত্ত উল্লাসে গম, আঙুর, জলপাই আর পশম বিক্রির হিসাবনিকাশ ঠিক করতে লাগল। তার প্রভু তাকে বিশ্বাস করেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মতই সম্মান করেন। তাঁর সেই বিশ্বাসের মর্যাদা যেন বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয়। দ্রুত পদক্ষেপে সে এল আবার প্রভুর শস্যক্ষেতে। যতদূর চোখ যায় দিগবিস্তীর্ণ প্রান্তরে সুপক্ক গমের সোনালী শিষে যেন ভূমিলক্ষীর-ই হাসি ছড়িয়ে পড়ছে।

সে নতজানু হয়ে বসল। গমের সুপুষ্ট দানার ভারে নুয়ে পড়া সেই মঞ্জরী এক একটা হাতে নিয়ে তন্নতন্ন করে দেখল কোথাও বিষাক্ত কীট আক্রমণ করেছে কি না; দূরান্তবর্তী নীলনদের সঙ্গে যুক্ত নয়নজুলি দিয়ে জলের প্রবাহ পর্যাপ্ত পরিমাণে যবের ক্ষেতে আসছে কি না দেখল—

দেখেছিস—ওই ইস্রায়েলী বান্দাটা প্রভুর জন্য কী রকম ভূতের মত পরিশ্রম করে, মিশরীয় কৃষকদের অস্ফুট গুঞ্জন তার কর্ণগোচর হয়।

আশ্চর্য! তার মালিক সদয় ব্যবহার করেন, দিয়েছেন আশ্রয়। ক্রীতদাস থেকে তাকে অঙ্গীকারবদ্ধ দাসের পর্যায়ে করেছেন উত্তরণ আর সে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তার কর্তব্য করবে না?

প্রভু উপস্থিত নেই বলে কর্তব্যে অবহেলা করে তাকে প্রবঞ্চনা করবে। না না অসম্ভব! সে জীহোভার ভক্ত, তাঁর আশীর্বাদ ধন্য। কত নিশীথ রাত্রে মধুর সুখস্বপ্নের ভেতরে তাঁর জ্যোতির্ময় আবির্ভাব হয়েছে—শুনেছে দূরাগত দিব্যকণ্ঠের বাণী—জোসেফ একদিন তুমি অনেক—অনেক বড় হবে, তোমার কাজে ব—হু বহু দুঃখী মানুষ উপকৃত হবে ··আমি তোমার সঙ্গে আছি ·· কখনো কোন পাপ কার্যে লিপ্ত হবে না—

তাই তো রাত্রির পর রাত্রি অপর্যাপ্ত আর উদগ্র যৌবনের পসরা সাজিয়ে যে নিজেকে নিবেদন করতে এসেছে, তাকেও প্রত্যাখান করতে হয়েছে। যাক ট্যামারকে সে সব বলেছে, আশা করা যায়, প্রভুপত্নী উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে তার বাধা কোথায়; কোন অদৃশ্য কারাগারে সে অন্তরীন হয়ে রয়েছে। মনে হয় অদ্য রজনীতে বিপদসঙ্কুল নিশি অভিসারে তৃষ্ণার্ত মরালীর মত আর সে আসবে না। বিচিত্র একটা পুলকানুভূতিতে তার মনটা অগ্নিদগ্ধ মোমের মত গলে গলে পড়তে লাগল।

হা-ম্বা—হঠাৎ একটা গাভীর করুণ আর্তস্বর ছিন্ন করে দিল চিন্তাসূত্র। সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্তের মত তড়িৎ বেগে ছুটে গিয়ে জোসেফ দেখল, তারই প্রভুর সুদানী গাভীকে বেত্রাঘাত করছে তাদেরই রাখাল হেপাটি।

কি করবো বলুন, অন্য লোকের ক্ষেতের ফসলে মুখ দিয়েছিল, হেপাটির চোখে ভয়ের ছায়া পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

তুই যে ওকে আঘাত করছিস—দেখেছিস? জোসেফ গভীর স্ফীতকায় উদরের দিকে ইঙ্গিত করল। মুখখানা বিকৃত করে বলল, গর্ভবতী গাভীকে প্রহার করে তুই মহাপাপ—

আমি বুঝতে পারিনি, আমাকে ক্ষমা করুন—হেপাটি করজোড়ে মিনতি চাইল।

জোসেফ স্থির দৃষ্টিতে গাভীর উদরের দিকে তাকিয়ে বলল, শোন আজ কালের ভেতরেই প্রসব করবে—যখুনি হবে—আমাকে ডাকবি কিন্তু—

হেপাটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

সেইদিন—সেইদিনই গভীর রাত্রে আবার তার ঘরের দরজায় করাঘাতের আওয়াজ বেজে উঠল টক টক টক—

দাঁড়া হেপাটি, সুদানী গাভীটি নিশ্চয়ই প্রসব করেছে তাই বলতে বলতে তাড়াতাড়ি দড়াম করে দরজা খুলতেই প্রেতচ্ছায়া দেখার মত চমকে উঠল।

না, রাখাল হেপাটি নয়, ট্যামার। জোসেফের মুখ থেকে অস্ফুটস্বর বেরিয়ে এল—তুমি!

সে লক্ষ্য করল, থর থর করে কাঁপছে ট্যামার। তীব্র কোন বেদনার ভারে মাথাটা নুয়ে পড়েছে। জোসেফের মনে হল, নিঃশব্দ একটা কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে ট্যামারের সারা শরীর।

বিপুলব্যপ্ত আকাশে নিশিশেষের ম্লান চাঁদের আলো, তুহিনশীতল বাতাসের অশ্রান্ত আর্তনাদ, তরল অন্ধকারাচ্ছন্ন অলিন্দে ট্যামারের কান্না থরো থরো মূর্তি সব মিলিয়ে কেমন গভীর একটা মমতার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল জোসেফের মন। প্রবল বাসনা হল পরম স্নেহে ট্যামারকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে সান্ত্বনা দেয়, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে তার দুঃখ কিসের?

কিন্তু কিছুই করল না। প্রভুপত্নী। পরস্ত্রী! তাই স্পর্শ করতে পারল না। সম্মানজনক ব্যবধান রেখে দূরে দাঁড়িয়ে সস্নেহে বলল, কাঁদছ কেন, আগামীকাল প্রভাতেই তো প্রভু—

মনের সঙ্গে বহু সংগ্রাম করলাম জোসেফ, অশ্রু অবরুদ্ধকণ্ঠে বলল ট্যামার

কিন্তু পারলাম না, বলতে বলতে তার কাছে এল। আর তীব্র আবেগে তার প্রশান্ত বুকে মাথাটি ঘর্ষণ করতে করতে অস্পষ্টকণ্ঠে বলল, তোমার কাছে না এসে পারলাম না, ক্ষণকালের জন্য শুরু হল। আবার ক্ষীণ মৃদু কণ্ঠে বলল, শত চেষ্টা করেও ঘুমাতে পারলাম না। যতবার চোখ বুঝছি, ততবার তোমার মুখখানা ভেসে ভেসে উঠছে মনের ভেতরে, থামল ট্যামার। আবার তার মাথায় বুকে হাত বুলিয়ে কোমল বিষন্ন কণ্ঠে বলল, ওরা তোমাকে কত—কত কষ্ট দিয়েছে—ওদেরই চক্রান্তে তোমাকে দেশ ছাড়তে হয়েছে, ঘর ছাড়তে হয়েছে তুমি—তুমি আজ ক্রীতদাস—তোমার জন্য যদি কিছু করতে পারতাম তার শেষের দিকের কথাগুলো—আকুল কান্নার ভেতরে তলিয়ে গেল।

হঠাৎ জোসেফকে ছেড়ে সামান্য ব্যবধানে দাঁড়ালো। আর কেমন উদভ্রান্ত আর নিস্পলক দৃষ্টিতে জোসেফের দিকে তাকিয়ে তীব্র যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে হতে অস্ফুটকণ্ঠে বলল, জ'নো নিজের ওপরে ক্রোধ হয়, অনুতাপ হয়—কেন—কেন, তোমার প্রতি প্রণয়ের সঞ্চার হল—গভীর ব্যথায় থমথম করতে লাগল মুখখানা। আবার করুণ আর মৃদুকণ্ঠে বলল, মন থেকে তোমাকে মুছে ফেলতে কত চেষ্টা করেছি—কিন্তু পারি নি জোসেফ—পারি নি, কেমন বুকফাটা হাহাকারের মত শোনালো তার কথাগুলো।

আবার ধীর পদক্ষেপে কেমন আচ্ছন্নের মত জোসেফের কাছে ঘন হয়ে এসে দাঁড়ালো ট্যামার। তার পেশীবহুল দুই স্কন্ধদেশে দুই বাহু রেখে বহুকালের অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত বলল, আজ নিশীথেই তোমার কাছে আমার শেষ আসা জোসেফ, বলতে বলতেই গভীর আবেগে চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করে দিল তার মুখখানা। তবুও—

জোসেফ নিষ্প্রাণ প্রস্তর মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে এক মনে জীহোভার ধ্যান করছে। তার নিরুত্তাপ, নির্বিকার মুখাবয়ব দেখে হঠাৎ তীব্র ক্রোধে, আর অপমানে জ্বলে উঠল ট্যামার। আর মুহূর্তে একটা দানবীয় কাণ্ড করে বসল।

না আকস্মিক আবেগ নয়—উন্মত্ততা নয়। অনেক বর্ষা—অনেক শরতের—গভীর নিশীথের অস্বস্তির দীর্ঘ প্রতীক্ষা, অনেক অতৃপ্ত কামনার জ্বালা, অনেক নির্মম প্রত্যাখান আর অনেক সীমাহীন দীনতা তিলে তিলে পুঞ্জীভূত হতে হতে হয়ে গিয়েছিল সুবিশাল এক বারুদের স্তূপ। বিস্ফোরণ আর বিধ্বংসী অগ্ন্যুৎপাতের জন্য প্রয়োজন ছিল সামান্য একটা উপলক্ষের।

জীহোভার ধ্যানে নিমগ্ন জোসেফের প্রশান্ত অবিচল মূর্তির দিকে কঠোর

দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘসে বলল, তুমি কি—তুমি কি মানুষ—ঠিক হিংস্র বাঘিনী যেমন অব্যর্থ লক্ষ্যে তার শিকারের দিকে এগিয়ে আসে তেমনি করে তা'র দিকে এগিয়ে এল। আর দুহাতে তার সুপুষ্ট বলিষ্ঠ স্কন্ধদেশ আকর্ষণ করে প্রচণ্ড বেগে ঝাঁকি দিতে দিতে বদ্ধ উন্মাদিনীর মত ফিসফিস করে বলল, তুমি আমাকে একদিন—একদিন—বলেই তীক্ষ্ণধার নখাগ্র দিয়ে তাকে আঁচড়ে খিমচে ধরে হঠাৎ ফর ফর করে তার কুর্তা ছিঁড়ে নিয়ে আহত আর ব্যর্থ বাঘিনীর মত গজরাতে গজরাতে চলে গেল ট্যামার! দূরে অন্ধকার অলিন্দে তার অপসৃয়মাণ ছায়াদেহটা যেন প্রতিহিংসাপরায়ন প্রেতিনীর মতই বলল, আমি দেখে নেব -কত বড় তোমার গর্ব—

তারপরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত।

ফটিফার এল। বিজয়োৎসবান্তে, রাশি রাশি সুগন্ধী পুষ্পমাল্য এবং ফারাওয়ের মহার্ঘ অনেক উপহার সামগ্রী নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল। শয়নকক্ষে প্রবেশ করেই দেখল, শয্যায় লুটিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ট্যামার।

কী ব্যাপার?

আচ্ছা লোকের ওপরে আমার দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছিলে, জলভরা দুটো চোখে আগুন ঝিকিয়ে উঠল। অধোমুখে লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলল, প্রতি রাত্রে উত্যক্ত করতো আমাকে—এই দেখ, জোসেফের কুর্তার ছিন্ন কিছু অংশ তার চোখের সামনে তুলে ধরল—

বিশ্বাসঘাতক—বেইমান! নিরুদ্ধ আক্রোশে জ্বলে উঠল ফটিফার। কোন প্রশ্ন নেই। জেরা নেই। থীবসের দুর্ভেদ্য কারাগারের অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হল জোসেফ।

দশবছর আগে মজে যাওয়া কূপে বন্দী হয়ে যেমন করেছিল জোসেফ তেমনি অখণ্ড মনযোগে জীহোভার নাম জপতে লাগল। দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে রাত্রি গভীর হল। নিথর স্তব্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল বিশাল বন্দীশালা। নৈশপ্রহরীদের উৎকোচে বশীভূত করে আর গভীর কৃষ্ণবর্ণ জোব্বায় আপাদমস্তক আবৃত করে এল এক ছায়ামূর্তি! দেখল কারাগারের পাথরের শূন্য মেঝেতে শুয়ে রয়েছে ফারাওয়ের প্রধান সেনানায়কের স্নেহধন্য বিশ্বস্ত দাস! পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

জোসেফ—কেমন আছো?

ভালো আছি—

বিস্ময়ে ট্যামারের চোখদুটো ছটফট করে উঠল। আশ্চর্য! কোন আক্রোশ

নেই, বিদ্বেষ নেই, নেই কোন অভিমান। যেন এক নিবিড় প্রশান্তিতে আবিষ্ট হয়ে আছে।

আর একটিও কথা না বলে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল ট্যামার।

কয়েকদিন পরে বন্দীশালায় কয়েদী হয়ে এল আরও দুইজন—ফারাওয়ের রাজপ্রাসাদের প্রধান ভৃত্য আর রুটির কারিগর বা বেকার।

জোসেফের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। কিন্তু একদিন সে লক্ষ্য করল নবাগত দুই বন্দীই খুব উদ্বিগ্ন। কি হয়েছে?

আমরা দুইজনেই দুইটি স্বপ্ন দেখেছি, অর্থ বুঝতে পারছি না বলল—প্রধান পরিচারক।

আমি আমার ঈশ্বরের অনুগ্রহে যে-কোন স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে পারি, নিজের ভেতরে মগ্ন হয়ে বলল জোসেফ, ইচ্ছে করলে স্বপ্নের বিবরণ বলতে পারো—

তাদের বৃত্তান্ত শুনে প্রধান ভৃত্যকে বলল জোসেফ, স্বপ্নের অর্থ হল, তুমি আর তিনদিন পরে মুক্তি পাবে—আর রুটির কারিগরের উৎসুক মুখের দিকে তাকিয়ে বিষন্ন হয়ে উঠল তার মুখখানা। আস্তে আস্তে বলল, তোমার স্বপ্ন খুব অশুভ সংকেত—ভাই—

তিনদিন পর ফাঁসী হল বেকারের আর নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে সসম্মানে মুক্তি লাভ করল পরিচারক। যাওয়ার সময় বহুদর্শী প্রধান সেই ভৃত্য সস্নেহে জোসেফের পিঠে হাত রেখে বলল, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তোমার দুঃসময়ে আমি তোমাকে সাহায্য করবো—

আবার এল ট্যামার।

অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়ে একটা ধূর্ত অভিসন্ধির মূর্তির মত কারাকক্ষের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। তার অধরে জলজ্বল করছে হিংস্র হাসি।

জোসেফ, আগামীকাল তোমার বিচার হবে, ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে আবার বলল, মহামান্য ফারাও স্বয়ং তোমার বিচার করবেন—

বেশ প্রশান্ত কণ্ঠে বলল, জোসেফ, যা শাস্তি দেবেন, মাথা পেতে নেব—

তোমার প্রাণদণ্ড হবে—

আমি তো কোন অন্যায় করিনি, জীহোভার যদি তাই অভিরুচি হয়—হবে—

তার অবিচল ধৈর্য, নিবিড় প্রশান্তি আরও কঠোর, আরও নিষ্ঠুর আর হিংস্র করে তুলল ট্যামারকে। তীব্র যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে বলতে চাইল—দেখবো, তোমার জীহোভা তোমাকে কেমন করে রক্ষা করে—কিন্তু—

বিচিত্র সেই ইস্রায়েলী যুবকের অত্যুজ্জ্বল দীপশিখার মত গৌরবর্ণ দীর্ঘ তনুদেহে বিচ্ছুরিত অপার্থিব সৌন্দর্য, বড় বড় দুটো নীল চোখে কেমন সুদূর উদাস দৃষ্টি, প্রেম প্রণয়, সুখ-দুঃখের এই মাটির পৃথিবী থেকে যেন অনেক-অনেক দূরে এক অনন্ত আনন্দলোকের অপার মহিমায় নিমগ্ন সেই আশ্চর্য প্রশান্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে একটা কথাও বলতে পারল না।

বিদ্যুতচমকের মত তার মনে হল, কোন সেই নিরাকার ঈশ্বর, যাঁকে বিশ্বাস করলে মৃত্যুর মত বিভীষিকাকেও তুচ্ছ করে অমন শান্ত নিরুদ্বেগ থাকা যায়? সেও তো কত বার সহস্র স্ফটিকপাত্রে অপর্যাপ্ত গন্ধধূপ আর মহার্ঘ মণি-মুক্তার উপচার দিয়ে ওসিরিস কি আমেনের পূজো করেছে ভক্তি ভরে—কৈ অমন নির্ভরতা তো কখনও অনুভব করে নি, দুঃখ শোকে অবিচল থাকতে পারেনি—

কয়েকমুহূর্ত অপলক চোখে জোসেফের নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে বলল, মৃত্যুকেও তুমি—ভয় করো না জোসেফ, অবরুদ্ধ আবেগে আর কিছুই বলতে পারল না ট্যামার। দু'চোখ ছাপিয়ে উদ্গত অশ্রু গোপন করতেই যেন দ্রুত অস্থির পদক্ষেপে অন্ধকারাচ্ছন্ন কারাপ্রাঙ্গন অতিক্রম করে চলে গেল।

রক্তের সমুদ্রে অবগাহন করে সূর্য উঠল।

রাজপ্রাসাদের প্রধান তোরণের ওপর থেকে দুন্দুভি বেজে উঠল।

সেই সঙ্গে শিঙ্গার গম্ভীর দূরাগত শব্দে রাজসভার প্রভাতী অধিবেশনে ফারাওয়ের আগমনবার্তা ঘোষিত হল।

বিশাল সভাকক্ষের শ্বেতপ্রস্তরের হর্ম্যতলের ওপরে এক একটি কারুকার্য খচিত দারু-বেদিকায় বসেছেন মন্ত্রীবৃন্দ এবং সভাসদবর্গ। তাঁদের থেকে কিছু ব্যবধানে মিশরের সেনাবিভাগের সর্বাধিনায়ক ফটিফার এবং অন্যান্য সেনানায়করা বসেছেন। অত্যন্ত কঠোর ও গম্ভীর তাদের মুখাবয়ব! সর্বজনশ্রদ্ধেয় অসাধারণ রণকুশলী দিগ্বিজয়ী বীর ফটিফারের পত্নীর সঙ্গে ব্যভিচার! বিদেশী এক ক্রীতদাসের এতদূর স্পর্ধা?

সভাকক্ষে সমবেত মাণ্ডলিকবর্গের মাঝখানে রক্তবর্ণ চীনাংশুকে আবৃত সুদীর্ঘ সংকীর্ণ পথ। সেই পথ যেখানে শেষ হয়েছে ঠিক সেইখানে নানাবর্ণে চিত্রিত চারটি দারুনির্মিত স্তম্ভের শীর্ষদেশ পরিণত হয়েছে এক প্রস্ফুটিত অতিকায় পদ্মফুলে। তার ভেতরে কাঞ্চন আর হস্তীদন্তের সমাহারে তৈরি মণিমুক্তা খচিত রাজসিংহাসন। কিন্তু—

সিংহাসন শূন্য।

এখনও মহামান্য ফারাও রামেসিস আসছেন না কেন! নারীঘটিত অপরাধের বিচারে যৌনলালসার অনেক সুস্বাদু আর শ্রুতিসুখকর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। তাই দীর্ঘ প্রতীক্ষায় চঞ্চল হয়ে উঠেছেন সভাসদবর্গ।

ত্রিভুবনপ্রভাকর মাননীয় ফারাও, মহামাত্য ঘোষণা করলেন, কোন গুরুতর কারণে বিনিদ্র রাত্রিযাপন করেছেন। তিনি ক্লান্ত অবসন্ন বোধ করছেন, ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে মাণ্ডলিকদের হতাশাচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তাঁর পরিবর্তে বিচার করবেন মহারাণী।

এই ঘোষণা শ্রবণ করে দূরে সেনাধক্ষ্যের প্রাসাদের নির্জন কক্ষে দীপশিখার মত কেঁপে উঠল ট্যামার! মহারাণী নেফাটারিয়া অত্যন্ত নীতি-বাগিশী। কঠোর স্বভাবের স্ত্রীলোক। তাহলে তো ওর মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য। তীব্র একটা আবেগ বুকের ভেতরে পাক খেয়ে উঠে এল কণ্ঠে। নিদারুণ ব্যথায় টন টন করতে লাগল গলার ভেতরটা।

মহারাণী এলেন।

প্রহরীবেষ্টিত হয়ে এল জোসেফ। শৃঙ্খলিত দুটো হাত। প্রহরীদের চতুষ্কের (বেত্রদণ্ড) আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে গিয়েছে পৃষ্ঠদেশ।

গভীর বিস্ময়ে অপলক হয়ে উঠল নেফাটারিয়ার চোখদুটো। কর্কশ রজ্জু দিয়ে পিঠমোড়া করে বাঁধা হয়েছে বন্দীকে। তার সর্বাঙ্গে চতুষ্কের আঘাতের চিহ্ন! তবুও প্রশান্ত আর নিরুদ্বেগ তার মুখাবয়ব। আশ্চর্য তো!

সুদর্শন চেহারা হলে কি হবে, তুই ব্যাটা ক্রীতদাস হয়ে কিনা গেলি প্রভুপত্নীর সঙ্গে ইয়ে করতে—

হ্যাঁ বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে গিয়েছিল—

সমবেত সভাসদদের ভেতরে গুঞ্জন ওঠে। মহারাণী মহামাত্যের দিকে ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহামাত্য ঘোষণা করলেন, প্রধান সেনানায়ক ফটিফার তাঁর নালিশ পেশ করবেন—

ফটিফার তার কোমরবন্ধে আবদ্ধ দীর্ঘ অসির স্বর্ণমণ্ডিত হাতল দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে তীব্র উত্তেজনায় কখনো কম্পিত হয়ে, কখনো চরম ঘৃণার ধিক্কারে জ্বলতে জ্বলতে তার একদা অতি বিশ্বস্ত ক্রীতদাসের বিরুদ্ধে বিষ উদ্গীরণ করতে শুরু করল।

না—না—ওর কোন দোষ নেই—সব দোষ—সব পাপ তার—দূরে সেই

নির্জন ঘরে দাঁড়িয়ে ট্যামারের ইচ্ছে হল, দুহাতে বুক চেপে ধরে চীৎকার করে বলে এই কথাগুলো—কিন্তু কিছুই করল না। করতে পারল না

অনেক—অনেক দেরী হয়ে গেছে, অনেক দূর গড়িয়েছে ব্যাপারটা। তীব্র উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে লাগল সে। নতজানু হয়ে বসে পড়ল সে

তার মনে হল, তার পায়ের তলায় মাটি নেই। ভারী– খুব ভারী আর অচল অনড় শবদেহের মত হয়ে উঠছে তার দেহটা—আর একটু একটু করে অতল একটা খাদের গভীর অন্ধকারে সে তলিয়ে যাচ্ছে। তার পাপ—কামনার জ্বালায় অন্ধ হয়ে পরপুরুষের কাছে দেহদানের নির্লজ্জ প্রস্তাব করার পাপ, মিথ্যে বলে সম্পূর্ণ নিরপরাধ একটা মানুষকে হত্যা করার পাপ—সব—সব যেন এক একটা অতিকায় দৈত্যের মত সেই খাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আর নিষ্ঠুর অট্টহাসি হাসছে। সে যেন শুনতে পাচ্ছে—শুনতে পাচ্ছে দিগন্ত জুড়ে সেই ভয়ঙ্কর অট্টহাসির শব্দ। সেই হা হা করা মর্মভেদী হাসি যেন প্রভাতের নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে চলে গেল; নীলনদ পার হল, তার পরে বহু জনপদ, গ্রাম, নগর ছাড়িয়ে, দেশদেশান্তর লোকলোকান্তর পেরিয়ে ক্রমশঃ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল, ক্ষীণতম সেই শব্দ তীক্ষ্ণ বিষাক্ত কাঁটার মত বিদ্ধ হতে লাগল তার মাথায়—তার মনে হল, তার মাথার ভেতরে যেন আছে বিপুলব্যপ্ত একটা আকাশ আর সেই শব্দ কিছুতেই তার মস্তিষ্কের সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারছে না—অসহ্য যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে মুমূর্ষু মানুষের মত ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল।

আর বলতে হবে না আপনাকে, নেফাটারিয়া ফটিফারকে শুদ্ধ হতে নির্দেশ দিলেন। তারপরেই ঘোষণা করলেন, আমি অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দিলাম—

আশ্চর্য! কোন ভাবান্তর হল না জোসেফের! সেই শান্ত মুখে স্মিত হাসি। দুচোখে সুদূর, স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টি। সে যেন জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানের সেই সিংহদ্বার অতিক্রম করে অনন্ত সেই আনন্দলোকে যাত্রার উল্লাসে বিভোর হয়ে আছে।

মাণ্ডলিকরা স্তব্ধ।

কারো মুখে একটি কথা নেই।

বিচিত্র সেই বন্দীর দিকে তাকিয়ে কয়েকমুহূর্ত কি ভেবে মহারাণী বললেন, তোমার কিছু বলার আছে? তোমার বক্তব্য নির্ভয়ে বলতে পারো—

আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ রাণী মা, জোসেফ করজোড়ে বলতে শুরু করল, আমি ইস্রায়েলী, গ্যালিলির পবিত্র মাটিতে আমার জন্ম—আমি হীব্রুদের আদিপুরুষ

অ্যাব্রাহামের উত্তরপুরুষ, তার গৌরবর্ণ দীর্ঘ দেহ অগ্নিশিখার মত জলজল করতে লাগল।

আবার আকাশের দিকে ইসারা করে প্রশান্ত কণ্ঠে বলল, আমি আমাদের নিরাকার ঈশ্বর জীহোভার আশীর্বাদধন্য। তাঁর অনুগ্রহে অনেক অলৌকিক ক্ষমতা আছে আমার। আমি সেই জীহোভার নামে শপথ করে বলছি—আমি এখন যা বলবো তার প্রতিটি কথা সত্য, ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে মহারাণীর হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলল জোসেফ, বিনা অপরাধে আপনি প্রাণদণ্ড দিয়েছেন—আমি আপনাদের ওসিরিস—কি আমেনের কিম্বা আপ্তের-যে দেবতা আপনারা বলবেন, তাঁর পাদস্পর্শ করে বলতে পারি কখনো কোনদিন একমুহূর্তের জন্য কোন পরস্ত্রীর দিকে লোভের দৃষ্টিতে তাকাই নি। আব আমার মিথ্যা অপরাধের সঙ্গে যাঁর নাম জড়িত হয়েছে—তিনি তো আমার প্রভুপত্নী—আমার মাতৃসমা—

তাহলে তোমার ছেঁড়া কুর্তা কি করে এল, আমার স্ত্রীর ঘরে? ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মত গর্জন করে বলল ফটিফার।

কোন কথা বলল না জোসেফ।

কেমন করুণ হয়ে উঠল তার মুখখানা। তার প্রভুর যে দুটো চোখে অবিরল ধারায় স্নেহ ঝরতো, সেই চোখেই আগুন জ্বলছে। নিয়তির কী নিষ্ঠুর আর বিচিত্র লীলা!

কী চুপ করে আছো কেন? বলো—

আপনি অধিকাংশ সময় যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করেন প্রভু, শান্ত বিনম্র কণ্ঠে বলল জোসেফ, অনেক সময় মাসের পর মাস বৎসরের পরবৎসর অতিক্রান্ত হয়ে যায়। সেই বিশাল প্রাসাদে প্রভুপত্নী সম্পূর্ণ সঙ্গীহীন হয়ে একেবারে একাকী অবস্থান করেন, হঠাৎ থেমে গেল জোসেফ। অবনত মস্তকে সসঙ্কোচে আবার বলল, সেই অবস্থায় প্রাকৃতিক কারণে-ই তাঁর মন চঞ্চল হওয়া খুব স্বাভাবিক প্রভু। তাঁর অসম্মানজনক পাপ প্রস্তাবে সম্মত হতে পারিনি বলেই তিনি ক্রোধে অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে—

না—আমি আর পারছি না, যেন বিষাক্ত সরীসৃপের দংশনে অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে চীৎকার করে বলল ফটিফার, তুমি—তুমি সামান্য একটা ক্রীতদাস হয়ে ওর সম্বন্ধে এতবড় অপবাদ দিলে—

প্রতিহারী, ডেকে নিয়ে এস মাননীয় প্রধান সেনাধক্ষ্যের পত্নীকে—কঠোর কণ্ঠে আদেশ দিলেন নেফাটারিয়া।

সভাকক্ষে গুঞ্জন উঠল।

ক্রোধে, অপমানে ফটিফারের ভারী মাংসল মুখখানা অমানবিক হয়ে উঠল। তুমি সমস্ত বৎসর রণক্ষেত্রে ব্যাপৃত থাকো, এই প্রাসাদপুরীতে আমার কি করে দিন কাটে বলো তো, ট্যামারের বহুদিনের এই একই অনুযোগের কথাগুলো তার কানের কাছে বাজতে লাগল। তাই বলে সে একটা ক্রীতদাসের সঙ্গে ব্যভিচার করবে?

না—না—তা হতে পারে না। এখুনি দৃপ্তপদক্ষেপে সে আসবে। আর অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে ওই কামুক শয়তানটির দিকে তাকিয়ে ঘটনার প্রকৃত বিবরণ বলে সত্যকে—

ট্যামার এল।

প্রহরীকে যেতে হল না। নিজেই এল। কিন্তু সেই কোষমুক্ত তরবারির মত শানিত অত্যুজ্জ্বল সেই মূর্তি কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। কেমন রিক্ত আর অবসন্ন মনে হল তাকে। জলে ভরা দুটো চোখ। আর সেই চোখের দৃষ্টিতে গ্লানির অপচ্ছায়া আর তার কৃতকর্মের অনুশোচনা জানিয়ে দিল তার কলঙ্কের ইতিবৃত্ত।

অগ্নিদগ্ধ শ্বাপদের মত সভাকক্ষ থেকে ফটিফার সবেগে প্রস্থান করল।

ছিঃ ছিঃ! তুমি মাননীয় ফারাওয়ের সেনাবিভাগের সর্বাধিনায়কের পত্নী হয়ে—নিরুদ্ধ ক্রোধে আর কিছু বলতে পারলেন না মহারাণী নেফাটারিয়া। কয়েকমুহূর্ত পরে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে কঠোর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর ব্যভিচারিণী পত্নীকে সমুচিত দণ্ড না দিলে দেশজুড়ে ঘরে ঘরে কুলরমণীরা—পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হবে—তাই আমি ওকে শূলদণ্ড দিলাম—

না—না মহারাণী আপনি ভুল করছেন ব্যাকুলকণ্ঠে মিনতি করে জোসেফ বলল, আমার শ্রদ্ধেয়া প্রভুপত্নী সম্পূর্ণ নিরাপরাধী। তিনি ফুলের মত পবিত্র এবং অপাপবিদ্ধা, কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে আবার আকুল হয়ে বলল, আপনি ওঁকে মুক্তি দিন মহারাণী।

সমবেত মাণ্ডলিকবর্গ তার উদারতার মহিমায় বিস্মিত হয়ে গেল।

তুমি যে সত্য কথা বলছো তার প্রমাণ? ঝন ঝন করে বেজে উঠল মহারাণীর কণ্ঠস্বর।

আমি আমাদের ঈশ্বর জীহোভার আশীর্বাদে যেসব অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী—সে সমস্ত বিনষ্ট হবে যদি আমার একটি কথা মিথ্যা হয়—আশ্চর্য একটা প্রেরণায় জলজল করতে লাগল জোসেফের বিশাল দুটো চোখ।

কি তোমার সেই অলৌকিক ক্ষমতা শুনি? কৌতূহলে, বিস্ময়ে আর উত্তেজনায় প্রায় ভেঙ্গে পড়লেন নেফাটারিয়া।

আমি সামান্ত মানুষ রাণী মা, সভার শেষপ্রান্ত থেকে বিনম্র আর সঙ্কুচিত একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এল, যদি অনুমতি করেন তাহলে বলি—

বিদ্যুৎবেগে সমবেত সভাসদরা ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, প্রাসাদের সেই সদ্য কারামুক্ত প্রধান পরিচারক।

মহারাণী হুকুম দিলেন। তার বক্তব্য তাঁর সামনে এসে বলতে—

প্রবীণ পরিচারক তার নিজের এবং রুটির কারিগরের স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলল। তারপরে সেই বলল, রাণীমা, এই ইস্রায়েলী তরুণের আশ্চর্য অলৌকিক শক্তি আছে—স্বপ্নের নির্ভুল ব্যাখ্যা—

কী? বলছো কী তুমি—সমস্ত মাণ্ডলিকবর্গকে বিস্ময়ে স্তব্ধ করে দিয়ে যেন মর্মতন্তু ছিঁড়ে চীৎকার করে উঠল নেফাটারিয়া। কেমন পাংশু হয়ে গেল তাঁর মুখাবয়ব। নিজেকে সংযত করে আস্তে আস্তে অস্পষ্ট গলায় বললেন, আপনারা কি অবগত আছেন, মহামান্ত ফারাও বিগত রজনীতে অদ্ভুত দুইটি স্বপ্ন দেখার পর থেকে অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করছেন—

আপনি কোন চিন্তা করবেন না রাণীমা, স্নিগ্ধ ও মৃদুকণ্ঠে বলল জোসেফ স্বপ্নের আড়ালে কিসের ইঙ্গিত আছে বলে দিলেই তিনি স্বস্তি বোধ করবেন—

ফারাওয়ের অসুস্থতাজনিত গুরুতর পরিস্থিতির জন্যে সভাভঙ্গ করে দিলেন মহামাত্য।

পরম সমাদরে নেফাটারিয়া স্বয়ং জোসেফকে নিয়ে এলেন মিশরের অধীশ্বর ফারাও দ্বিতীয় রামেসিসের নয়নাভিরাম শয়নকক্ষে।

দ্রুত অস্থির পদক্ষেপে পদচারণা করছেন ফারাও। মহারাণী জোসেফের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করতেই তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। প্রখর দৃষ্টিতে জোসেফের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, পারবে—তুমি পারবে আমার বিচিত্র স্বপ্নের অর্থ বলতে?

বলুন মহারাজ, জীহোভার অনুগ্রহে সক্ষম হবো—জোসেফের কথাগুলোর ভেতরে প্রত্যয় পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

শ্রবণ করো যুবক, একই রজনীতে আমি দুইটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি, দুঃসহ যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল তাঁর মুখে। অস্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, বীভৎস আর বিচিত্র দুইটি স্বপ্ন জানি না ভয়ানক কোন আসন্ন দুর্ঘটনার অশুভ সংকেত কি না, একটু

থেমে নিজের তীব্র আবেগকে সংযত করে বললেন, প্রথমে দেখলাম রুগ্ন একটি বৃষ হৃষ্টপুষ্ট একটা গাভীকে জীবন্ত ভক্ষণ করছে। আমি—আমি ভীত হয়ে আর্তনাদ করে উঠেছিলাম। পুনরায় রাত্রির শেষযামে দেখলাম, কীটদষ্ট একটি গমের দানা আর একটি সুপুষ্ট দানাকে গ্রাস করছে—

কোন কথা বলল না জোসেফ। দারুনির্মিত শয়নকক্ষের দেওয়ালগাত্রে শ্বেতশুভ্র হস্তীদন্তের ওপরে স্বর্ণসূত্রে মণ্ডিত অপরূপ কারুশোভার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কেমন তপস্বীর মত আত্মসমাহিত মুখ। ক্ষণকাল পরে অভিভূত একটা আচ্ছন্নতার ভেতরে মগ্ন হয়ে বলল, মহারাজ বিগত ছয় বৎসর আপনার রাজ্যে অপর্যাপ্ত ফসল হয়েছিল এবং বর্তমান বৎসরেও শস্যের ফলন আশাপ্রদ। কিন্তু এই সাত বৎসর ব্যাপী শস্যের বিপুল প্রাচুর্যের পরেই আগামী সাত বৎসর ধরে আপনার রাজ্য ভয়ানক দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হবে—অগণিত লোকক্ষয়—হাহাকার—

আমি—আমি আর শুনতে পারছি না যুবক, হৃদয়বিদারক কণ্ঠে বললেন ফারাও, প্রতিকার কি বলো?

আছে, মহারাজ যে কোন সমস্যারই সমাধান আছে, উদীপ্ত কণ্ঠে বলল জোসেফ, এখন থেকে প্রতিটি বড় বড় শহরে শস্যভাণ্ডার গড়ে তুলুন। আদেশ জারী করুন, প্রত্যেককে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত ফসল বাজেয়াপ্ত করা হবে। সেই ফসল সংগ্রহ করে ভাণ্ডারে মজুত করুন। দুর্ভিক্ষ শুরু হলে সেই শস্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রি—

বাঃ, আশ্চর্য সমাধান করেছো তো, উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ফারাও। হীব্রু যুবকের বিস্ময়কর দূরদর্শিতায়, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে মুগ্ধ হয়ে গেলেন দ্বিতীয় রামেসিস।

তারপর?

ভুবনবিখ্যাত নৃপতি ফারাও দ্বিতীয় রামেসিস কেমন করে দেশজুড়ে শস্য-ভাণ্ডার তৈরি করে ফসল সংগ্রহ অভিযানের অধিনায়ক নিযুক্ত করেছিলেন জোসেফকে; আর তার কর্মতৎপরতায় অসাধারণ সংগঠন ক্ষমতায় চমৎকৃত ও বিস্মিত হয়ে তাকে মিশরের একটি প্রদেশের ভিজির অর্থাৎ গভর্ণর (রাজ্যপাল) করেছিলেন—

জোসেফ ও ট্যামারের প্রেমের ইতিবৃত্তে সেসব অবান্তর।

যে সমস্ত সত্তা দিয়ে তাকে ভালবেসেছিল, যার দুর্বার প্রেমের বিচিত্র গতি প্রবাহেই সে দাসত্বের ঘৃণিত জীবনের অন্ধকার থেকে খ্যাতির এবং বিপুল

সম্মানের আলোকোজ্জ্বল রাজ্যে পৌঁছে গিয়েছিল, কলঙ্ক আর অপযশের কালিমা নিয়ে লোকচক্ষুর অগোচরে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল সেই দুর্ভাগিনী নারী ?

পুরাতন নিয়মের (ওল্ড টেস্টামেণ্ট) বাইবেলে, কিম্বা হীব্রুদের আদিপুরুষ ও ইস্রায়েলী নেতৃবৃন্দ অ্যাব্রাহাম, আইজ্যাক, জ্যাকব এবং জোসেফের অসাধারণ কৃতিত্বের বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসের কোথাও নেই সেই ভাগ্যবিড়ম্বিত রমনার উল্লেখ।

কিন্তু ইতিহাস যখন স্তব্ধ হয়, তখন মুখর হয়ে ওঠে কিংবদন্তী। আর কিংবদন্তীর ভেতরে থাকে ইতিহাসের সত্যের কিছু আভাস।

আজও মিশরের প্যালেস্তাইনের গ্রামাঞ্চলের আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে শোনা যায় ট্যামারের প্রেমের যে করুণ কাহিনী, যে বেদনাভিষিক্ত ইতিবৃত্ত বলতে বলতে তাদের চোখদুটো সজল হয়ে ওঠে, সেই কাহিনীই এখানে সংক্ষেপে বলা হল—

রাজসভা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে কোথায় চলে গিয়েছিল ট্যামার কেউ বলতে পারে না। রাজকার্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও জোসেফ এবং ফটিফার থীবসের দেবভূমি ডেহরী-এল-বাহরীর প্রতিটি মন্দিরের আনাচে কানাচে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পেল না তাকে। সমস্ত নগরে আর নীলনদের তীরবর্তী গ্রাম গ্রামান্তরে অন্বেষণ করেও যখন সন্ধান পাওয়া গেল না, তাদের তখন মনে হল হতভাগী নিশ্চয়ই খরস্রোতা নদীর গভীর জলে আত্মাহুতি দিয়ে কলঙ্কিত জীবনের জ্বালা জুড়িয়েছে।

কয়েকদিন পর জানা গেল ট্যামারের রহস্যময় অন্তর্ধানের কিছু সূত্র— থীবসের চারিদিকে পাষাণ প্রাচীরের উত্তরের তোরণদ্বারের প্রবীন প্রহরী জানালো—বিগত কয়েক দিবস আগে রাত্রির মধ্যযামে রথারূঢ়া হয়ে এক অবগুণ্ঠনবতী রমণী নগরের সীমানা অতিক্রম করে যায়। রথের সারথী ছিল এক নবীন যুবক।

কে মেন্না! তাই তো—মেন্নাকে-ও তো বেশ কয়েকদিন দেখে নি, দ্রুত অস্থির পদক্ষেপে ফটিফার গৃহে প্রত্যাবর্তন করে দেখল, না—তার কারুকার্য-খচিত রথ তো স্বস্থানে-ই আছে। তার মনে হল, তারা চাতুরির আশ্রয় নিয়েছে। অন্য কোন ব্যক্তির রথযান সংগ্রহ করেছে মেন্না। আর নৈশপ্রহরীদের তার পরিচয় দিয়ে তোরণদ্বার অনায়াসেই অতিক্রম করেছে!

কিন্তু রথ প্রশস্ত পথ ব্যতীত চলতে পারে না। ফটিফার তার অনুচরদের

পাঠিয়ে দিল মিশরের উত্তরে, দক্ষিণে দূরপ্রসারী বাণিজ্য পথের অভিমুখে। দামাস্কাস থেকে যে প্রধান বাণিজ্য সড়কটি মিশরের উত্তরাঞ্চল হয়ে চলে গিয়েছে প্যালেস্তাইনের দিকে, সেই পথের পাশে এক পাহাড়ের পাদদেশে পাওয়া গিয়েছিল সেই পরিত্যক্ত রথখান। কিন্তু মেয়াকে নিয়ে কোথায় কতদূরে কোন দেশে যেতে পারে ট্যামার ! অনেক চিন্তা করেও কোন কূলকিনারা পেল না ফটিফার।

যোদ্ধা মানুষ। শোকদুঃখের স্মৃতির ভেতরে মগ্ন হয়ে বসে থাকা নেই তার স্বভাবে। তাই নীলনদে সিন্ধুঘোটক শিকারের উল্লাসে আর মোয়ারের দ্রাক্ষা-রসের উত্তেজক মদিরার নেশায় বিভোর হয়ে গেল। আর সহস্র কাজের ভেতরেও জোসেফের মনে কাঁটার মত বিদ্ধ হতে লাগল ট্যামারের সুডৌল মুখখানা। তাকে ভালবেসেই গৃহহারা হয়ে, কে জানে, কোন অজানা দেশের পথে পথে ঘুরছে সে।

জোসেফের সেই অমোঘ ভবিষ্যৎবাণী সত্যে রূপায়িত হল। সারা দেশে নেমে এল দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। দেখতে দেখতে সেই ভয়াবহ মন্বন্তর ছড়িয়ে পড়ল মিশরের সীমানা পেরিয়ে প্যালেস্তাইনে, সিরিয়ায়, ইরাকে। দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ থেকে পঙ্গপালের মত লোক আসতে শুরু করল মিশরে। মিশরের বড় বড় নগরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত শস্যভাণ্ডারের তোরণের সম্মুখে দিবানিশি জমাট ভীড়।

একদিন গোসেনের (প্রদেশ) শস্যভাণ্ডার থেকে প্রাদেশিক শাসনকর্তা জোসেফের কাছে এল খবর—কয়েকজন বিদেশী লোক শস্য ক্রয় করতে এসেছিল। কিন্তু তাদের বিচিত্র পোশাক-আসাকে দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলা এবং সন্দেহজনক গতিবিধি দেখে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু তারা ব্যাকুল হয়ে বারে বারে মহামান্য ভিজিরের কথা বলছে—

সঙ্গে সঙ্গে জোসেফ রথে আরোহণ করে দ্রুতগতিতে চলল সেই শস্যের গোলায়। যেই প্রাঙ্গনে অবতরণ করল অমনি তার তার হাতদুটো শক্ত করে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল বড় ভাই সিমন, জোসেফ—ভাই—আমাদের তুই ক্ষমা কর—

তুই ভিজির হয়েছিস, ফারাও তোর ওপরে খুব প্রসন্ন, মেজভাই জুডাস তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমরা শুনেছি—তুই অনেক শস্যের গোলা—

কে-কে, বলল তোমাদের? কণ্ঠ বিদীর্ণ করে আর্তনাদ করে উঠল জোসেফ, উত্তেজনায় কম্পিত হতে লাগল।

কৃতকর্মের অনুশোচনায় আচ্ছন্ন ভ্রাতাদের চোখে শঙ্কার ছায়া পরিস্ফুট হয়ে উঠল। অস্ফুটকণ্ঠে সিমন বলল, আমরা তোর কাছে এসেছি বলে তোর খুব ক্রোধ—

না—না—আমি জানতে চাইছি তোমাদের কে বলেছে—

এক তরুণী সন্ন্যাসিনী, তিনি—

সিমনের কথা আর শেষ হল না, তার আগেই উন্মত্তের মত ছুটে বেরিয়ে গেল জোসেফ। সুদীর্ঘ কয়েকমাসব্যাপী নিরবিচ্ছিন্ন অন্বেষনের পর একদিন এক লতাগুল্মে আচ্ছন্ন গিরিগুহার সম্মুখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো সে—

এ কী! গুহার নীলাভ আবছায়া অন্ধকারে এক তপস্বিনীর ধ্যানমৌনা জ্যোতির্ময় মূর্তি জ্বলজ্বল করছে। তপশ্চর্যায়কৃশ সেই তপস্বিনীর ভেতরে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না সেই লাস্যময়ী বিলাসিনী তার প্রভুপত্নীকে।

ট্যামার—আমি জোসেফ—

ধ্যানমুদিত চক্ষু উন্মিলীত হল। শান্ত নির্বিকার ও বেদনাহীন দুই চোখের দৃষ্টি। মৃদু ও স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল ট্যামার, তোমার ভ্রাতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে? পরিতৃপ্তির হাসি পরিস্ফুট হয়ে উঠল তার মুখাবয়বে। আবার বলল, তোমার বৃদ্ধ পিতৃদেবকে নিয়ে এস আর ভ্রাতাদের ক্ষমা ক'রো—

কিন্তু এ তুমি কি করলে ট্যামার, অসহ্য যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে বলল জোসেফ, তোমার শোকে মাননীয় সেনানায়ক—

না—ওসব কথা আর বলো না জোসেফ যেন অনেক দূর থেকে ক্ষীণকণ্ঠে বলল ট্যামার, তুমি—তুমি আমার গুরু। তুমি আমাকে শিখিয়েছ ঈশ্বরে বিশ্বাস কত গভীর হলে দুঃখ শোক এমন কি মৃত্যুকেও কত সহজে তুচ্ছ করা যায়, হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল তপস্বিনী।

চারিদিকের নিথর স্তব্ধতার ভেতরে গিরিনির্ঝরের নিরবিচ্ছিন্ন সেই শব্দ—দূরাগত করুণ ক্রন্দন ধ্বনির মত বেজে যেতে লাগল।

শোন, জোসেফ ষোড়শপোচারে পূজা, বলিদান কি মহামূল্যবান অর্ঘের উপচারে নয়—দৃপ্ত কণ্ঠে বলল সন্ন্যাসিনী, আমি উপলব্ধি করেছি নিরাকার ঈশ্বরের ধ্যানেই মন মহৎ উদার অনুভূতির ভেতরে বিলীন—

এসব তুমি কি—কি বলছো ট্যামার? তোমার সাজানো সংসার, বিপুল ঐশ্বর্য, স্বামী সব-সব ছেড়ে তুমি কী দুঃখে সন্ন্যাসিনী হবে? এই কথাগুলোই চীৎকার করে বলতে চেয়েছিল জোসেফ কিন্তু—

পারল না। আর সেখানে স্থির হয়ে দাঁড়াতেই পারল না। ট্যামারের কথাগুলো যেন দারুণ অগ্নিবানের মত এক উদ্যত অভিশাপ নিয়ে ছুটে আসছে

তার দিকে। তার প্রতি দুর্বার প্রেমে, তার ধ্যানধারনায় প্রভাবিত হয়েই ঐশ্বর্যলালিতা এই রমণী দুশ্চর তপস্যার কণ্টাকীর্ণ পথে নেমে এল!

দাবানল-দগ্ধ মত্ত মাতঙ্গের মত দ্রুতপদে চলে যেতে যেতে করুণ কণ্ঠে বলল, তুমি আমাকে ক্ষমা করো ট্যামার—

চারিদিকের প্রগাঢ় নিস্তব্ধতায় ভেতরে তার কথাগুলো আর্তনাদের মত শোনালো।

সামসন ও খানুম

নিবিড় সবুজ বনদেহে তরল সোনার মত রোদ গলে গলে পড়ছে।

গাছে গাছে পাখিরা ডাকছে। মৃদু বাতাসে দুলছে জলপাই আর আঙুরের ফুল। যতদূর চোখ যায়, শুধু ঘন অরণ্যের এক শান্ত সবুজ সমুদ্র যেন নিথর হয়ে পড়ে আছে। জর্ডন উপত্যকার প্রান্তে এই বনের সীমানায় সে এসে দাঁড়াল।

দাঁড়াল একেবারে একা। নিঃসঙ্গ। নিরস্ত্র। একটু ভাল করে তার দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায়, কেন তার সঙ্গীর কোন প্রয়োজন নেই। কেন তার প্রয়োজন নেই অস্ত্রের। আশ্চর্য অটুট তার স্বাস্থ্য। যেমন শালতরুর মত দীর্ঘ তেমনি পেশীবহুল বলিষ্ঠ চেহারায় উদ্দীপ্ত যৌবন জেগে আছে প্রখর হয়ে। তার বড় বড় দুটো নীলাভ চোখে তীব্র কৌতূহল দৃষ্টি। তার চোখদুটো উৎসুক হয়ে কাকে যেন খুঁজছে। এই শ্বাপদ-সঙ্কুল বিজন অরণ্যে কার খোঁজ করছে সে?

কোন হিংস্র প্রাণীকেই ভয় পায় না সে—ভয় পায় না দৈত্যদানবকে। অমিত শক্তি আর সাহসের অধিকারী সে। তাই সে নির্ভয়ে বনের ভেতরে প্রবেশ করল।

গহন বন। দিনের বেলাতেই অন্ধকার। বাতাসে গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির মত শালের ফুল ঝরে ঝরে পড়ছে পথের পাশে, উড়ে আসছে তার গায়ে। বহু-বহুদূর থেকে বাতাসে ভেসে আসছে হাতীর গর্জন, শোনা যাচ্ছে ময়ূরের ডাক ওসব কোনদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে একটা বুনো মোষের মত বলিষ্ঠ দুটো পায়ের প্রবল চাপে জঙ্গল মাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। কাঁটাগাছে তার গা ছড়ে যাচ্ছে। বিন্দু বিন্দু রক্ত জমেছে ক্ষতস্থানে। দর দর করে ঘাম ঝরছে কপাল থেকে। কিছুই তার গতিকে রোধ করতে পারছে না। কিসের যেন দুর্নিবার একটা প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে সে চলেছে গভীর অরণ্যের প্রান্তে। তাই তার দুটো পায়ের ওপরে তার কোন বশ নেই—বশ নেই তার গতির ওপরে। তার মাথার ভেতরে যেন আগুনের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। কানের পিঠ দুটো গরম হয়ে উঠছে।

তার বিক্ষুব্ধ আর উত্তেজিত মনের ভেতরে শুধু ভেসে ভেসে উঠছে কালো ডাগর দুটো চোখের ছবি। নরম আর কমনীয় সুডৌল মুখ। মিশকালো গায়ের রঙ। কালো পাথর কুঁদে কুঁদে কেটে তৈরী করা হয়েছে যেন সেই বলিষ্ঠ যৌবনমূর্তি। একেবারে নিরাবরণ কঠিন দুটো পুষ্ট স্তন, সম্পূর্ণ নগ্ন সেই আশ্চর্য দেহশ্রী, কিন্তু সেই বিজন আরণ্যক পরিবেশে মোটেই বেমানান লাগছিল না।

হ্যাঁ—এইখানে ঠিক এই সময় এই পাথরটার ওপরই তো তাকে বসে থাকতে দেখেছিল সেদিন।

বনের ভেতরে একটু ফাঁকা জায়গায় পাথরের একটা চাঙড়ার সামনে দাঁড়াল সে। কেউ কোথাও নেই। শুধু ওক লরেল আর জলপাইগাছেরডালে ডালে সাঁ সাঁ বাতাসের কান্না শোনা যাচ্ছে।

পশ্চিমের আকাশ রাঙিয়ে দিয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। বনের ভেতরে একটু একটু করে অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। তবুও সে সেইখানে একটা স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে রইল। আর স্মৃতিব ভেতরে ঝাঝাফুলের মিষ্টি সৌরভের মত ছড়িয়ে পড়ল সেই অনাবৃত নারীদেহের অনির্বচনীয় সুষমা। আব কেমন আচ্ছন্ন ও বিবশ হযে এল তার চেতনা। সে ভুলে গেল সেই হিংস্র শ্বাপদ অধ্যুষিত অরণ্যের কথা—ভুলে গেল সেই ঘনায়মান আসন্ন রাত্রিব কথা।

ঝিঁ ঝিঁ ডাকতে শুরু করল বনের ভেতরে। গাছে গাছে জোনাকি জ্বলতে লাগল। থেকে থেকে ভেসে আসতে লাগল হায়েনার ডাক। কালো অন্ধকারে জেগে উঠল কালো অরণ্যের প্রাথমিক জীবন। হয়তো সেই নাম না জানা সুন্দরীর ধ্যানে আরও কিছু সময় মগ্ন হয়ে থাকতো। কিন্তু—

খস্—শুকনো পাতার ওপরে কার পায়ের শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন হয়ে গেল তার চিন্তাসূত্র। আর শক্ত হয়ে দাঁড়ালো সে। আর সেই বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহের ভাঁজে ভাঁজে পেশীগুলো পাথরের এক একটি ফুলের মত ফুটে উঠল।

ও কি! কার চোখ? দূরে অন্ধকার গুহার ভেতরে কি জ্বলজ্বল করছে। কি চিতাবাঘের চোখ! ইস্রায়েল আর ফিলিস্তাইনের সীমান্তের এই নিবিড় অরণ্যে কালো চিতাবাঘের আনাগোনা খুব বেশী।

না। ভয় পেল না সে। মাথার অপর্যাপ্ত সোনালী চুলের একটাও খাড়া হল না। সে সব তো হয় সাধারণ মানুষদের। সে সাধারণ নয়—অসাধারণ। সে—

সামসন।

সমগ্র ইস্রায়েল জুড়ে তার বলিষ্ঠতার বিপুল খ্যাতি। তার দুই হাতের বজ্র-মুঠিতে কত হাজারো বাঘের হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে। সিংহের সঙ্গেও সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে লড়াই করে তাকে করেছে জখম সেই লড়াইয়ের চিহ্নও রয়েছে তার দেহের এখানে সেখানে। একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া সে কাউকে কখনো ভয় করে না।

অমিতশক্তির অধিকারী এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য বলেই সে ড্যান উপজাতিদের অবিসম্বাদী নেতা। সে শুনেছে, সাবেকদিনের ইস্রায়েলের জননায়ক জোসুয়া কনান অধিকার করার পর জুডিয়ার পর্বতশ্রেণী ছাড়িয়ে সেই সুদূর পশ্চিমের নিম্নভূমিতে ফিলিস্তাইনের সীমান্তে একটি পাহাড়ের-ই পাদদেশে এক ফালি জমিতে তাদের স্বজাতি ড্যানীয়দের বসতি করিয়েছিল। কিন্তু এই ভূখণ্ডের অধিবাসীরা চিরশত্রু ফিলিস্তীয়দের নির্মম অত্যাচারে জর্জরিত। যখন তখন ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত অতর্কিতে তারা ড্যানীয়দের গ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর লুঠতরাজ করে বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে চলে যায়। ড্যানীয়রা অতিষ্ঠ হয়ে অধিকাংশ-ই সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে চলে গিয়েছে সেই উত্তর-পূর্বে হেরমন পাহাড়ের নীচে।

আর যারা এখনও জন্মভূমির মায়া কাটিয়ে যেতে পারে নি। বংশপরম্পরা সুখদুঃখের হাজারো স্মৃতিজড়িত মাটিতে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এখনও বাস করছে তাদের নিয়ে সে ইজীয়ান এবং ক্রীট দ্বীপপুঞ্জ থেকে বহিরাগত সমুদ্রসন্নিহিত দেশের মানুষ ফিলিস্তীয়দের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করে চলেছে। সারা ইস্রায়েলে ফিলিস্তীয়রা প্রভুত্ব করলেও তার দেশে কিন্তু ঘেঁসতে দেয়নি তাদের। গ্রামবৃদ্ধরা তার অসামান্য রণনৈপুণ্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলে, আরে আমাদের সামসন না থাকলে কবে ফিলিস্তীয়রা আমাদের জায়গাটা কেড়ে নিত! বলতে গেলে সামসন-ই তো একক সীমান্ত যুদ্ধ করে চলেছে। কিন্তু—

ওটা কি—কার চোখ—কিসের চোখ জ্বলছে গুহার ভেতরে? যেই সেই জ্বলন্ত চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে এক পা-দুই পা করে এগোতে যাবে অমনি জঙ্গলের ভেতরে প্রবল আলোড়ণ হল। আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে চারিদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলল শত শত বলিষ্ঠ সশস্ত্র যুবক। তাদের তীক্ষ্ণধার বিষাক্ত তীরের আর চকচকে বল্লমের ফলায় অব্যর্থ মৃত্যুর নিশানা ঝকমক করছিল।

কে তুমি—কী চাও এখানে ?

সামসন একটা কথা বলল না। তাদের কালো পাথরের মত মজবুত চেহারার দিকে তাকিয়েই সে বুঝতে পারল, সে সেই জন্মশত্রু ফিলিস্তীয়দের ভেতরে এসে পড়েছে—

কথা বলছো না কেন ? তাদের রক্তচোখে হিংস্রতা দপ দপ করতে লাগল। কিন্তু তারা এক পা এগিয়ে আসতে সাহস করল না। তারা লক্ষ্য করল, লোকটা উইলো গাছের মত দীর্ঘ। আগুনের মত গায়ের রঙ। বাতাসে উড়ছে এক মাথা ঝাঁকড়া সোনালী চুল। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন স্বর্গের চারিদিক থেকে অত্যুজ্জ্বল রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। অজানা এক আলোর রাজ্য থেকে নেমে এসেছে যেন কোন দেবদূত।

তুমি কি পথ ভুল করে এই বনে এসে পড়েছো, ফিলিস্তীয় তরুণরা সামসনের অটুট স্বাস্থ্যের অপরিমেয় সৌন্দর্যে প্রদীপ্ত চেহারাটা লক্ষ্য করে ভয়ে ভয়ে বলল।

সামসন এইবার মুখ খুলে নিঃসঙ্কোচে বলল, আচ্ছা গতকাল এইখানে ঠিক এই সময়ে একটা মেয়ে এসেছিল।

হো-হো করে হেসে উঠল ফিলিস্তীয়রা। তাদের সম্মিলিত কণ্ঠের অট্টহাসির শব্দ চারিদিকের প্রগাঢ় স্তব্ধতার বুক চিরে বয়ে গেল লহরে লহরে। হাসি থামলে তারা বলল, তুমি নিশ্চয়ই খামুয়ের কথা বলছ—এস, এস—আমাদের সঙ্গে এস।

তারা নিয়ে এল।

নিয়ে এল সামসনকে একটা উঁচু টিলার ওপরে। সেখান থেকে নীচে জলপাই আর কলাগাছে ছেয়ে থাকা একটা পাহাড়ী গ্রাম নজরে পড়ে। সামসন দেখল, রাণীর মত মহিমায় বসে আছে সেই কালোপাথরের দেবীমূর্তি। বসে আছে একটা বেদীর ওপরে। আর তার সামনে বিনম্র ভক্তের মত বসে রয়েছে কয়েকজন যুবক। তারা ফিলিস্তীয় নয় বলেই মনে হল।

ওই যে দেখছ লোকগুলো বসে, ওরা তোমাদের দেশের—হয়তো তোমাদেরই স্বজাতি—

ওরা এখানে কেন এসেছে ?

বুঝতে পারছ না, ওরা প্রত্যেকে খামুয়কে বিয়ে করতে চায় কিন্তু কেউ ধাঁধার উত্তর দিতে পারছে না—

ধাঁধা—মানে ? সামসনের কপালের মাঝখানটা কুঁচকে উঠল।

তার মনে হল, এখুনি এই মুহূর্তে মত্ত একটা মাতঙ্গের মত ওই সমবেত জনতার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে সে, পারে ওই জন্মশত্রু ফিলিস্তীয়দের প্রত্যেকের মাথাটা কবুতরের মত এক একটা হ্যাচকা টানে ছিঁড়ে নিয়ে ধড় থেকে আলাদা করে দিতে। এইরকম—ঠিক এইরকম একটা বিবাদ বা কলহের কিম্বা রক্তাক্ত সংঘর্ষের প্রত্যাশা নিয়েই এখানে এসেছে সে। কিন্তু কোন সূত্র না পেলে হঠাৎ খুন-জখম-রক্তপাত ঘটিয়ে কোন অনর্থ করা ঠিক নয়। এখন পর্যন্ত শান্ত সংযত ব্যবহার করছে ওই নরকের কীটগুলো। দেখা যাক না। ধাঁধার রহস্যটা কি! বলল, আমি ধাঁধার উত্তর দিতে পারলে থাম্নুম আমাকে বিয়ে করবে?

চেষ্টা করে দেখ—ধাঁধার উত্তর দিতে পারলে নিশ্চয়ই করবে—

সামসন সামনে এল। তার দিকে থাম্নুমের দৃষ্টি পড়তেই তার ডাগর দুটো কালো চোখে কেমন মুগ্ধ তন্ময়তা থম থম করতে লাগল। এত সুন্দর, বলিষ্ঠ আর এমন কন্দর্পকান্তি দেবতার মত চেহারা কোন মানুষের হয়, না হতে পারে!

তোমার ধাঁধা বল—

আকস্মিক এই প্রশ্নে থাম্নুম একটু অবাক হল। উঠে এসে তার দরজার কবাটের মত চওড়া বুকের কাছাকাছি ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে বলল, কেন, আমার ধাঁধার সমাধান করতে পারলে তুমি আমাকে—চুপ করে গেল থাম্নুম। কে যেন তার মুখে আবির ছিটিয়ে দিল। সে মাথা নীচু করল। কিন্তু তার চোখ দুটো অনুরাগের আভাসে কেমন গভীর আর স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। আর ঠিক সেই সময় হঠাৎ একটা শব্দ হল—

ঠক—

হঠাৎ তীক্ষ্ণধার একটা বর্শা তীরবেগে এসে বিঁধে গেল পাহাড়ের ওপরে একটা সরেল গাছের গায়ে। সামসনের মনে হল, অনার্যকন্যার প্রতি তার অনুরাগের বিরুদ্ধে ফিলিস্তীয়দের তীব্র আক্রোশই যেন পুঞ্জিভূত হয়ে আছে সেই গাছে বেঁধা বর্শার ভেতরে।

কিন্তু থাম্নুম সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করল না। মৃদু হেসে বহুদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত সামসনের হাতদুটো ধরে বলল, এস—এস—তুমি এখানে বসবে এস—

একটু থেমে হেঁকে ছেলেদের বলল, তোমরা কোনরকম গোলমাল করো না। আমি এইবার এঁকে প্রশ্ন করছি।

যুবকরা শান্ত হল। কিন্তু তাদের চোখে চোখে আক্রোশে ঝকমক করতে

লাগল, আর বুকের ভেতরে একটা যন্ত্রণা মাথা খুঁড়তে লাগল বিজাতীয় এই বলিষ্ঠ সুপুরুষ লোকটা যদি খামুমের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর ঠিক ঠিক দিয়ে দেন।

শোন—আমার প্রথম ধাঁধা—

যৌবনে যেন উদ্ধত রাজকর্মচারী,
শাসনে শোষনে কী তার দাপট
(কিন্তু) বৃদ্ধকালে শুকিয়ে হয়ে যায় আমসী ॥

ফিলিস্তীয় যুবতীর চোখে হাসি ঝিকমিক করে। এইরকম অসাধারণ বলিষ্ঠ আর রূপবান স্বামীর স্বপ্নই তো দিবানিশি তার চেতনার ভেতরে জলজল করে কিন্তু।

সামসনের চোখে চিন্তার ছায়া পড়ল। মাথা নীচু করে ভাবতে লাগল—

যৌবনে উদ্ধত রাজকর্মচারী? আশ্চর্য তো—অস্বস্তিতে জলে যায় তার মাথার ভেতরটা। এরা যদি বুদ্ধির না নিয়ে দৈহিক শক্তির পরীক্ষা নিত তাহলে—

সমবেত প্রত্যেকের স্থিরদৃষ্টি সামসনের মুখের দিকে নিবদ্ধ। কারো মুখে একটা কথা নেই। শুধু শাঁ শাঁ বাতাস দূরে পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঠোক্কর খেয়ে অব্যক্ত যন্ত্রণার মত গোঙাতে লাগল।

তুমি—তুমিও পারবে না,-খামুম কেমন শুকনো গলায় বলল, এই লোকগুলোর মত তুমিও পারবে না? তার বড় বড় ডাগর দুটো চোখে যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল।

কি—বুদ্ধু বনে গেলে তো,—হো হো করে হাসতে লাগল ফিলিস্তীয়রা। সামসনের কানদুটো লাল হয়ে উঠল। তীব্র একটা জ্বালা যেন তার স্নায়ুতে স্নায়ুতে তরঙ্গায়িত হয়ে যাচ্ছে। পেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠছে। নিদারুণ উত্তেজনায় সিংহের কেশরের মত চুলগুলো ঝুঁটি করে শক্ত একটা রঙীন দড়ি দিয়ে বেঁধে জলন্ত দৃষ্টিতে তাকালো সেই ফিলিস্তীয় ছোকরাদের দিকে।

তোমরা—তোমরা জানো না, আমার এই কেশরাশির কী অপরিসীম ও প্রলয়ঙ্করী শক্তি—আমি ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট, এই কথাগুলো বলতে চেয়েছিল। কিন্তু বলল না। তার অসামান্য শক্তির গোপন উৎস গোপন-ই থাক—

আরে বোবা হয়ে চুপ করে থাকলে কেন, ছেলেরা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস ফিস করে বলল, কি কত্তা—'পারবে না'—এই কথাটা বলতে বুঝি কষ্ট হচ্ছে—বলেই হাসিতে ভেঙে পড়ল তারা।

যখন পাহাড়ের দিকে দিকে বিদ্রূপের হাসির ঝড় বয়ে চলেছিল, ঠিক তখন থাম্নুম একটা কাণ্ড করে বসল।

সামসনের গায়ের ওপরে তার যৌবনপুষ্ট দেহটাকে এলিয়ে দিয়েই রক্তবর্ণ রেশমের কাঁচুলিতে আবদ্ধ তার উদ্ধত, নিটোল আর কঠিন দুটো স্তনের দিকে ইঙ্গিত করল। মুহূর্তে সামসনের মনের ভেতরে যেন তীক্ষ্ণ ও তীব্র বিদ্যুতের আলো ঝলসে উঠল। আর জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল সেই জটিল ধাঁধার উত্তর।

শোন—প্রথম ধাঁধার উত্তর পেয়েছি, সামসন উপস্থিত সবাইকে হেঁকে বলল, যৌবনে যেন উদ্ধত রাজকর্মচারী কিন্তু বৃদ্ধকালে শুকিয়ে আমসী—বলেই হঠাৎ চুপ করে গেল সামসন। সঙ্কোচের ছায়া নেমে এল তার চোখে। এত লোকের সামনে সে কেমন করে বলবে, সেই বস্তুটির নাম—

তুমি দেরী করছ কেন—বল—বল—বলে ফেলো—অসহ্য একটা আবেগে আর উত্তেজনায় থর থর করে কেঁপে উঠল থাম্নুম। সামসন মাথা নীচু করে বলল, এই ধাঁধার উত্তর হল—

পূর্ণযুবতী নারীর স্তন। বাঃ—দেখ এই বিদেশী লোকটা ঠিক বলেছে। হেঁকে বলল থাম্নুম—আচ্ছা এইবার ওকে আমি আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন করছি—

কালো গরুর দেহখানি।
দুধ দেয় সেরখানি॥
গরু যখন হাম্বায়।
লোকে তখন চমকায়॥

সামসনের চোখে দিশেহারা দৃষ্টি ফুটল। কালো গরুর দেহখানি…

পারবে না—পারবে না—এটার জবাব দিতে পারবে না—ফিলিস্তীয়দের উল্লসিত চীৎকার শোনা গেল।

সেই হট্টগোলের ভেতরে থাম্নুম আকাশের দিকে ইসারা করল।

সঙ্গে সঙ্গে সামসন বলে উঠল এই ধাঁধার উত্তর হল মেঘ—মেঘ।—কালো মেঘ মানে কালো গরু, দুধ অর্থাৎ জল, আর হাম্বায় মানে ডাকে—

ফিলিস্তীয়রা চুপ। তাদের চোখে একটা আশঙ্কার কালো ছায়া থর থর করে কাঁপে। তাদের চোখের মণি এই রূপধন্যা নারীকে জয় করে নেবে ওই বলিষ্ঠ যুবক। আর কোনদিন—আর কোনদিন তারা থাম্নুমকে দেখতে পাবে না।

আচ্ছা এইবার—এইবার আমার শেষ প্রশ্ন—থাম্নুমের চোখ দুটো জল জল

করছে। তার সারা মুখ প্রদীপের আলোর মতো উজ্জল হয়ে উঠল। সামসনের কাছে এসে বলল, বল—কিন্তু বলতে যেয়েই হঠাৎ থেমে গেল। মাথা নীচু করল খাসুম। ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে পাথর খুঁটতে লাগল।

বল—বল—থামলে যে—

বলছি গো বলছি, এত ব্যস্ত কেন? তোমার বুঝি আর তর সইছে না? খাসুমের মুখে লজ্জার ছায়া পড়ল। বলল, এই ধাঁধাটাকে অশ্লীল ভেব না—

তুমি বলই না শুনি—

তোমাদের এত ফিস ফিস করে কথা কিসের খাসুম? হুঙ্কার দিয়ে উঠল গ্রামপ্রধান কোঙা। সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে, এই বিদেশী যুবকের প্রতি খাসুম পক্ষপাতিত্ব করছে। আকারে-ইঙ্গিতে ধাঁধার উত্তরও বলে দিচ্ছে। তীব্র আক্রোশে জ্বলতে জ্বলতে সে ধারালো অস্ত্রে শান দিতে লাগল। দেখতে দেখতে ঘনিয়ে এল ভয়ঙ্কর দুর্যোগের আভাস।

কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে খাসুম বলল—আচ্ছা বল—

দেই তো পরপুরুষকে দেই।
দেই তো পথে ঘাটে দেই॥
দেই তো যাকে তাকে দেই।
তুমি আমার, আমি তোমার তোমায় দেব কি॥

পরপুরুষকে দেই, কথাগুলো আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল সামসন। একমনে ভাবে, পথে ঘাটে, পুরুষকে যাকে তাকে কি দেওয়া যায়—কি দেওয়া যেতে পারে? আবার মনে হল খাসুম ইঙ্গিত দিয়েছে, এটা অশ্লীল কিছু নয়। তার মাথার ভেতরে যেন ছুঁচ বিঁধতে লাগল। এই ধাঁধা-মাধার ঝামেলায় যাওয়ার দরকার কি—খাসুমের কবুতরের মত নরম দেহটাকে পিঠে বেঁধে নিয়ে এক্ষুনি এই মুহূর্তে ঝড়ের বেগে পাহাড়ের পর পাহাড়ের চড়াই উৎরাই ডিঙিয়ে চলে যেতে পারে জুডিয়ায় তার গ্রামে।

বল—বল—তুমি চুপ করে আছ কেন? ফিস ফিস করে বলল খাসুম—এই খাসুম—ও কি হচ্ছে—কেন তুই ওকে, এই ভিনদেশী মানুষটাকে ধাঁধার উত্তর বলে দিচ্ছিস, তাদের দুইজনের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ল গাঁওবুড়ো কোঙা। দাবদগ্ধ শিলাখণ্ডের মত মুখখানায় পৈশাচিক হিংস্রতা পরিস্ফুট হয়ে উঠল। কিন্তু সামসনের সুদৃঢ় চেহারাটার দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে সাহস হল না। শুধু বয়সের ভারে শিথিল দেহটা তীব্র উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে লাগল।

আর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, কেন—কেন তুই মাথায় হাত দিচ্ছিস বলতে বলতেই দুইহাতে, তার গলাটা টিপে ধরল।

বাঃ। আমার চুলের ভেতরটা যে বুর বুর করছিল, তার গলার ভেতর থেকে গোঁ গোঁ শব্দ উঠল।

খুন চেপে গেল সামসনের মাথায়। একটা তীক্ষ্ণ ও তীব্র উত্তেজনা ধীরে ধীরে তার স্নায়ুতে স্নায়ুতে আগুনের স্রোতের মত ছড়িয়ে পড়ছে। লোহার এক একটা বলের মত শক্ত হয়ে উঠছে পেশীগুলো। ওদিকে কোওার দুটো হাতের সরু সরু আঙুলগুলো একটু একটু করে সাঁড়াশীর মত চেপে বসছে খাসুমের গলায়।

ওই ভিনদেশী মস্তানটাকে বুঝি খুব মনে ধরেছে, না? ভয়ঙ্কর আক্রোশে তার চোখদুটো দগদগে ঘায়ের মত জ্বলছে। আবার চাপা ফিস ফিস গলায় বলল, তুই মাথার ওপরে কেন হাত দিচ্ছিস তা আমি বুঝিনি মনে করিস—কেন—কেন তুই আমাদের ছেড়ে—

এই, ওর গলা ছেড়ে দাও,ক্রুদ্ধ বাঘের মত গর্জন করে উঠল সামসন। এক ধাক্কায় বুড়োকে সরিয়ে দিল। বলল, এই হেঁয়ালির উত্তর হল—ঘোমটা!—পরপুরুষকে দেখেই তো মেয়েরা ঘোমটা দেয়—পথেঘাটে বেরিয়ে যে কোন উটকো লোককে দেখলেই মেয়েরা মাথায় ঘোমটা টেনে দেয়—

আর তোমরা বাধা দিও না, উত্তর ঠিক বলেছে—খাসুম বলল—আমি একেই বিয়ে করব—

না কিছুতেই না, তুমি তিনটি হেঁয়ালির উত্তরই বলে দিয়েছ, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল কোওা।

হঠাৎ সেই পাহাড় ঘেরা নিস্তব্ধ আরণ্যক পরিবেশে যেন একটা মহাপ্রলয় নেমে এল। কোওার ইঙ্গিতে ফিলিস্তীয় যুবকরা যেই সামসনকে লক্ষ্য করে বল্লম তুলল সঙ্গে সঙ্গে সামসনের মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল, আর সেই চুলের ভেতর থেকে জেগে উঠল দৈত্যের মত ভয়ঙ্কর একটা শক্তি। সে একটা বিশাল পাথর অবলীলাক্রমে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল তাদের দিকে। মুহূর্তে ফিলিস্তীয় জনাকয়েক থেঁতলে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। তাদের করুণ আর্তনাদে আর মৃত্যু-যন্ত্রণার গোঙানিতে মুহূর্তে চারিদিকের বাতাস ভারী হয়ে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের সারি সারি ওক আর জলপাইগাছের ফাঁকে ফাঁকে বাড়িগুলো থেকে কাতারে কাতারে বেরিয়ে এল যুবকরা। তাদের চোখে

ন্য হিংসা ধ্ ধ্ করছে। কারো হাতে টাঙ্গি, কারো হাতে রামদা, কারো হাতে বল্লম, কারো হাতে শড়কি। হুঙ্কার ছাড়ল সামসন—খবরদার, যদি বাঁচতে চাও—কেউ এক পা এগোবে না—

তার সেই সুন্দর মুখখানা কেমন বীভৎস আর অমানবিক হয়ে উঠেছে। ঁপিউবে উঠল কোণ্ডা। থমকে দাঁড়াল সশস্ত্র সেই ফিলিস্তীয় যুবকরা। কিন্তু তখন তাদের বন্য রক্তে আগুনের মত জ্বলছে প্রতিহিংসা।

তারা যেই সামসনকে লক্ষ্য করে তাদের ধারালো অস্ত্র উদ্যত করল অমনি সামসন একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। ঠিক যেমন করে কচুগাছ তোলে তেমনি করে একটানে একটা বিশাল নরেল গাছ তুলে ফেলল। আর একটা বৃকের মত সপাসপ করে সেই গাছ দিয়ে তাদের প্রচণ্ডজোরে ঘা দিতে লাগল। চারিদিকে পাহাড় কাঁপিয়ে আর্তনাদ উঠল। মুহূর্তে তারা কে কোথায় ছিটকে গেল। তাদের রক্তাক্ত দেহগুলো এক একটা মাংসপিণ্ডের মত পাহাড়ের ঢালু বয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। আবার কোনটা গাছের শিকড়ের সঙ্গে বেধে গিয়ে ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলতে লাগল। চোখের পলকে যেন একটা মহাপ্রলয় হয়ে গেল। তারপর—

তারপর যা হয়। ঝড়ের পর সব শান্ত। মৃত্যুর মত নিথর স্তব্ধতা নেমে এল ফিলিস্তীয়দের গ্রামে।

ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে কাঠ হয়ে থাম্নুম এতক্ষণ একটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। এইবার ধীর পায়ে বেরিয়ে এল। এল সামসনের সামনে। আর তার দুটো চোখে মুগ্ধ বিস্ময় থমথম করতে লাগল।

তোমার গায়ে এত শক্তি, বলতে বলতে আরও কাছে এল থাম্নুম। আর সামসনের অসাধারণ বলিষ্ঠ দেহটাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরার তীব্র লোলুপ লালসে তার রক্তে যেন আগুন ধরে গেল।

কয়েকমুহূর্ত স্থির অপলক চোখে যেন সামসনের পেশীবহুল দেহটাকে লেহন করল। আর তারপরেই তার বড় বড় সোনালী চুলে ভরা মাথাটা বুকের ভেতরে চেপে ধরে ফিস ফিস করে বলল, চল—আমার ঘরে যাবে না?

কয়েকমুহূর্ত পরই তৃষ্ণার্ত একটা মাছরাঙ্গা পাখির মত তার ঠোঁটদুটো ও উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সামসনের মুখের ওপরে। আর উদ্দাম ও তপ্ত চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করে দিল তার মুখখানা। তাতেও পরিতৃপ্ত না হয়ে সামসনের মিহি ও রক্তাভ ঠোঁটদুটোকে তার মুখের ভেতরে গ্রাস করে নিয়ে কেমন বিহ্বল আর নিশ্চল হয়ে বসে রইল।

একদিন এই বিজন আরণ্যক পরিবেশে যার নগ্ন নিরাবরণ মূর্তি তার বুকে কামনার আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিল তার উন্মত্ত চুম্বন যেন তিলে তিলে গ্রাস করতে থাকে সামসনের প্রাণ। সারা শরীরের কঠিন পেশীস্তবকের প্রতিটি কণিকা যেন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে, গলে গলে তরল হয়ে যায়। আর শিথিল ও অবসন্ন বিশাল দেহটা খানুমের গায়ে এলিয়ে দিয়ে তার বুকের ওপরে নদী হয়ে মিশে যায় সামসন।

আর—তারপর—

মধুর আবেশে ছন্দোসুরভিত হয়ে ওঠে নিস্তব্ধ নিবিড় বনভূমি।

সামসনের বন্যঅশ্বের মত দীর্ঘ সময়ব্যাপী রমননৈপুণ্যে পরিতৃপ্ত সুখী খানুম অস্ফুটকণ্ঠে বলে, আমি তোমাকে চিনি না। কিন্তু আমি—আমি—তোমার মত এক পুরুষের জন্যই অপেক্ষা করে ছিলাম, তীব্র আবেগে অবরুদ্ধ হয়ে গেল তার কণ্ঠস্বর।

কিন্তু—তোমার জন্য তোমাদের কতগুলো মানুষ খুন করে ফেললাম। দূরে—বহুদূরে আসন্ন রাত্রির রঙে মলিন হয়ে আসা পাহাড়ের চূড়োর দিকে তাকিয়ে ছাড়া ছাড়া গলায় বলল সামসন, তোমার বাবা কি আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে রাজী হবেন—

বাবা! বলো কী—তোমাকে আপত্তি করবে কে, চোখদুটো বিস্ফারিত করে খানুম বলে, তার ঘাড়ে কয়টা মাথা আছে।

কোন কথা বলল না সামসন।

তার মনে হল চিরশত্রু ফিলিস্তীয়দের এই মেয়েটিকে তার চাই-ই চাই। ওর জন্য সে, যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত আছে! ওকে কেন্দ্র করেই আবার একটা সংঘাত শুরু হোক না—

কী এত ভাবছ বলো তো? অধৈর্য হয়ে ওঠে খানুম, কি তোমার পরিচয়, কোথায় তোমার দেশ—

তার কথা যেন শুনতেই পেল না সামসন। তাকে পরমস্নেহে বুকের ভেতরে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি আমার সঙ্গে যাবে খানুম—

পালিয়ে? যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল খানুমের মুখে। বলল তোমার মত অমন শক্তিমান পুরুষকে বিয়ে করবো, চোরের মত লুকিয়ে—

শোন খানুম—আমার পরিচয় জানলে, তোমার বাবা, আত্মীয়-পরিজন কিছুতেই আমার হাতে তোমাকে দেবে না—দিতে পারে না—

কেন?—তুমি কে—

আমার নাম সামসন—আমি তোমাদের শত্রু ইস্রায়েলীদের ড্যানীয় সম্প্রদায়ের নেতা, সামসনের কথাগুলোর ভেতরে গর্বের সুর পরিস্ফুট হয়ে উঠল, আমার পিতার নাম ম্যাগোয়া—তোমাদের দেশের সীমান্তে জুডিয়ার পাহাড়ের নীচে বেথসেমিসের অন্তর্গত জারোযাহ গ্রামে আমার বাড়ি, একটু থেমে আবার বলল, তোমাদের গ্রাম এই টিমনাথ থেকে আমার বাড়ি মাত্র চার মাইল দূরে—

তুমি—তুমি সামসন। খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল খান্নুম। তার মাথার দীর্ঘ অপর্যাপ্ত চুলে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আবার বলল, তুমিই তো শুধু হাতে একটা সিংহকে—

হ্যাঁ—হ্যাঁ। খান্নুম, তার যৌবনপুষ্ট নরম দেহটাকে বুকের ভেতরে চেপে ধরে একতাল ময়দার মত ঠেসে ঠেসে বলল সামসন, আমি-ই সেই সামসন। তুমি আমাদের শত্রুপক্ষের মেয়ে হলেও—আমি—আমি যে তোমাকে—ভালবেসেছি বাদবাকী তোমাকে না পেলে তীব্র আবেগে কথাগুলো আর বলতে পারল না বিপুল দৈহিক শক্তির অধিকারী সেই মানুষটার মুখে ব্যাথার ছায়া ফুটে ওঠে।

শোন এত ভেঙ্গে পড়ছ কেন, বেশ বর্ষীয়ান কোন বুদ্ধিমতী রমণীর মতই খান্নুম বলল, একটু অপেক্ষা করো—আমি বাবাকে বলি। বাবার মত থাকলেও হবে না। গাঁও বুড়ো কোণ্ডা যদি রাজী হয় তবেই বিয়ে হবে—

ওরে বাবা—সে তো অগাধ জল—

আরে এদের রাজী করানো তো আমার দায়িত্ব, খান্নুমের চোখদুটো জ্বলজ্বল করে। চারিদিকের নিবিড় জঙ্গলে রাত্রির ঘনায়মান জমাট অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, অনেক রাত্রি হয়ে গেল—এই বনে জন্তুজানোয়ারের ভয় আছে—তুমি—

জানোয়ার। হা—হা—হা—চারিদিকের নিস্তব্ধতাকে শিউরে দিয়ে হো হো করে হেসে উঠল সামসন। মাথার সোনালী চুলের গোছাটা শক্ত করে হাতের মুঠোয় ধরে উদীপ্ত হয়ে বলল, এই যে দেখছ—এইগুলো যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না, বলেই ধক করে উঠল তার বুকের ভেতরটা। সর্বনাশ হাজার হোক চিরশত্রুদের মেয়ে—

কেন গো—তোমার চুলে কি আছে—ছোটমেয়ের মত আব্দারের সুরে বলতে বলতে-ই সামসনের গায়ে নিজেকে এলিয়ে দিল।

না—কিছু না—চুলে আবার কি থাকবে—

না—তুমি গোপন করছ, অভিমানে ভারী হয়ে উঠল খান্নুমের মুখখানা। এই তুমি আমাকে ভালবাসো—

তুমি বলছ কি থানুম, তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল সামসন। দেখলে না একটু আগে—তোমাদের গাঁওবুড়ো শুধু তোমার গলাটা টিপে ধরেছিল বলে কী কাণ্ড—ক্ষণকাল থেমে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে আবার বলল, তাহলে শোন—তুমি কবে তোমার বাবাকে, গাঁওবুড়োকে বলবে—আমি কবে জানবো—

কোন কথা বলল না থানুম।

সামসন চলে যাবে। যেতে দিতে হবে বলে বুকটা ভারী হয়ে উঠল। অস্ফুটস্বরে বলল, তিনচার দিন পরে এস —কেমন? বন্ধু বিদায়ের হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

ম্লান হাসি!

দূরে অন্ধকারে অপসৃয়মান সামসনের ওকগাছের মত দীর্ঘ বলিষ্ঠ ছায়া দেহটার দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে ডাকল—সা—ম—স—ন—নিজেই মত্ত একটা হস্তিনীর মত বনবাদাড় ভেঙে ছুটে এল সামসনের কাছে। ছুটে আসার ক্লান্তিতে বড় বড় নিশ্বাস পড়ছে। তীব্র উত্তেজনায় চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে।

তোমাকে একটা কথা বলতে এলাম, হাঁফাতে হাঁফাতে বলল থানুম. বাবা—আব গাঁওবুড়ো যদি মত দেয় আর তোমার সঙ্গে আমাব বিয়ে হয়ে যায়—তারপরেও কি তুমি তোমরা ড্যানীয়রা আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করবে? একটু থেমে বলল আবার, মারামারি, কাটাকাটি না করে আমরা দুটো জাত মিলেমিশে—

সেসব পরের কথা থানুম, কেমন গম্ভীর আর কঠিন শোনালো সামসনের কণ্ঠস্বর, তুমি আগে তোমার লোকদের রাজী করাও তো—

বলেই ঘন অন্ধকারে অদৃশ্য থানুমকে একটা রহস্যের ভেতরে রেখে দিয়ে আবার হন হন করে হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু—

যেতে পারল না সামসন। যাওয়া হল না। আর থানুমের পক্ষের মতামতের জন্য উদ্বেগের যন্ত্রণার ভেতরেও থাকতে হল না!

সেই নিবিড় অন্ধকারকে যেন ফালা ফালা করে দিয়ে সামসনের চারিদিক থেকে নিশ্চিত মৃত্যুর ইঙ্গিত দিয়ে শত শত তীক্ষ্ণধার বল্লম এগিয়ে এল। আর ছায়াবাজীর খেলার মত ঝোপঝাড়ের জঙ্গল থেকে দলে দলে বেরিয়ে এল ফিলিস্তীয়রা।

কি রে শয়তান, গ্রামবৃদ্ধ কোগুা কর্কশকণ্ঠে চীৎকার করে বলল, আমাদের মেয়েটাকে নষ্ট করে দিয়ে তুই প্রাণ নিয়ে ফিরে যাবি ভেবেছিস—

মধু খেয়ে ভোমরা এবার মানে মানে সরে পড়বে ভেবেছিল-রে, এক রসিক আবার ঘুরপাক খেয়ে নেচে নেচে বলল।

কিরে হারামজাদী, খামুমের বুড়ো বাবা জনতার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে মেয়ের চুলের মুঠি ধরে বলল, ভিনদেশী ওই খুনে দানোটার সঙ্গে এই জঙ্গলের ভেতরে তোর কিসের এত গুজুর গুজুর—

বাবা—গাঁওবুড়ো—তোমরা শোন—উচ্চকিত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল খামুম, এই লোকটার নাম—সামসন—

সামসন!

বনে যেন বাজ পড়ল। সশস্ত্র ক্ষিপ্ত জনতা স্তব্ধ হয়ে গেল। খামুম তার পিতা এবং গ্রামবৃদ্ধ কোওাকে ফিসফিস করে বলল কতগুলো কথা।

কোওার ক্ষণকালে আগের সেই আক্রোশে কঠিন মুখখানায় হাসি ফুটে উঠল। খুশীতে উচ্ছসিত হয়ে এল সামসনের কাছে। সস্নেহে তার পিঠে হাত রেখে বলল, তোমার মত শক্তিধর মানুষ আমাদের আপনার জন হলে খুব খুশী হবো বাবা—কয়েকমুহূর্ত পরে কি ভেবে আবার বলল, বিয়ে হলে আর তোমরা ড্যানীয়রা বাজপাখির মত আমাদের এলাকায় ঝাঁপিয়ে পড়বে না তো—

তার মনে হল খামুমকে একবার নিয়ে যেয়ে ঘরে তো তুলি তারপর দেখা যাবে।

না—না বলছেন কি, কপট হাসি মুখে ঝুলিয়ে সামসন বলল, নিজেদের আত্মীয়ের সঙ্গে বুঝি কেউ যুদ্ধ করে?

বাহবা—বাহবা—উল্লসিত জনতা সমবেত কণ্ঠে বলল, আমরাও খুশী এই প্রস্তাবে—

খামুমের বুকের ভেতরে অদৃশ্য সেতারের রাগিনী বাজতে লাগল। আমি আমার বাবা-মা-কে জানিয়ে আসছি, বলেই সামসন দ্রুতপায়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পুরাতন পদ্ধতির বাইবেল বা ওল্ড টেস্টামেন্টে আছে পিতা-মাতার ওপরে সামসনের ভক্তি ছিল অসাধারণ। তাঁরা প্রথমে অসম্মতি জানিয়ে বলেছিলেন তোমার স্বজাতীয় কোন ড্যানীয় মেয়েকে বিয়ে করলেই পারতে—

কিন্তু সামসনের তীব্র আগ্রহ লক্ষ্য করে বলেছিলেন, তুমি তো জানো—তুমি আমার—ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট সন্তান—

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল ম্যানোয়া। তার চোখের পাতায় ঘন হয়ে নেমে এল সাবেক দিনের স্মৃতি—

অ্যাবলন---সামসনের মা কত বার জীহোভার থানে গিয়ে প্রার্থনা করে আর শিকড়-বাকড় জড়িবুটি, যে যা বলে তাই খায়। কিছুতেই কিন্তু তার সন্তান আর হয় না। যখন হতাশায় দুঃখে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে অ্যাবলন এমন সময় একদিন আকাশ আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে এলেন এক দেবদূত—

শোন অ্যাবলন, তোমার গর্ভে এক অমিত শক্তিধর পুত্র জন্ম নেবে, আকাশ থেকে সুমধুর কণ্ঠে তিনি দৈববাণী করলেন, সে বড় হয়ে ইস্রায়েলকে ফিলিস্তীয়দের কবল থেকে মুক্ত করবে—ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে তিনি আরও বললেন, তুমি গর্ভাবস্থায় কখনো মদ্য পান করবে না এবং স্পর্শ করবে না কোন অপবিত্র আহার্য—আবার আকাশজুড়ে ছড়ানো পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘের ভেতরে মিলিয়ে যেতে যেতে বললেন, ঈশ্বরের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যই তোমার পুত্রের জন্ম তাই ওর মাথার চুল কখনো কাটবে না—ওর চুলের ভেতরে থাকবে ঈশ্বরপ্রদত্ত বিপুল শক্তি···আর দেখ কখনো যেন সে উত্তেজক মদ্যপান না করে—দূরাগত সেই কথাগুলো ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে বিপুলব্যাপ্ত আকাশের নিথর নৈশব্দে বিলীন হয়ে গেল।

তবে দেখ তোমার যে মনে যখন বাসনা জেগেছে, আস্তে আস্তে ম্যানোয়া বলল সে-টাও তো ঈশ্বরেরই ইচ্ছায়। একটু থেমে আবার বলল, কে জানে তোমার এই বিবাহকে উপলক্ষ্য করেই হয়তো ড্যানীয়রা পরিত্রাণের পথ খুঁজে পেয়ে যাবে—ফিলিস্তীয়দের অত্যাচার থেকে—

সামসনের উজ্জ্বল চোখের কৃষ্ণতারা দুটো যেন ঝিক করে হেসে উঠল।

প্রাচ্যদেশীয় প্রথা অনুসারে বরবেশে সামসন তার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব এবং পিতাকে নিয়ে কনের গৃহের অভিমুখে যাত্রা করল।

গভীর রাত্রি। নিস্তব্ধ বনভূমি। চারিদিকের নিথর স্তব্ধতাকে সচকিত করে চলেছে বরযাত্রীরা। তাদের প্রত্যেকের হাতে দাউ দাউ করে জ্বলছে মশাল। সেই আলোয় তাদের বর্ণাঢ্য পোশাক ঝকমক করছে।

ওদিকে থাম্নুমের গৃহপ্রাঙ্গনজুড়ে শোভা পাচ্ছে এক বহুবর্ণে চিত্র-বিচিত্র বিশাল চন্দ্রাতপ! তার নীচে বসে আছেন গ্রামের প্রবীন রাব্বি বা পুরোহিত। ঠিক তার সম্মুখে কনের বেশে থাম্নুম!

তার মাথায় রক্তবর্ণ উষ্ণা অর্থাৎ মুকুট। সেই মুকুট থেকে তার মুখাবয়ব

আচ্ছন্ন করে তার পদযুগল পর্যন্ত লম্বিত হয়ে রয়েছে প্রায় আসচ্ছ শ্বেতবর্ণ রেশমের ওড়না। তার আড়াল থেকে দেখা যায় তার চোখদুটো সন্ধ্যাপ্রদীপের মত জ্বলছে। উল্লাসের কলধ্বনি বাজছে তার বুকের রক্তে। ফুল এক সুখের আবেশে আচ্ছন্ন চেতনার ভেতরে এক অপরূপ ইন্দ্রজালের মত খেলা করছে শালপ্রাংশু মহাভুজ একটি অসাধারণ শক্তিমান পুরুষের প্রতিকৃতি।

কখন-কতক্ষণ পরে সে এসে পৌছবে—উৎকণ্ঠায় ভেঙ্গে পড়ছে তার বুক। কা যে ছাই নিয়ম, রাত্রির মধ্যযাম উত্তীর্ণ না হলে বরযাত্রী রওনা হবে না—

গ্রামের সীমান্তে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে কুমারী মেয়েদের দল। তাদের প্রত্যেকের হাতে চর্বির তেলের প্রদীপ জ্বলছে। দূর থেকে হঠাৎ দেখলে মনে হয় নিবিড় অন্ধকারে কারা যেন অগ্নিবর্ণ ফুলের মালা নিয়ে বরকে সাদর অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে।

বর এসেছে—বর—এসেছে—নারীকণ্ঠের উল্লসিত ধ্বনিতে বিদীর্ণ হয়ে গেল নিশিরাতের জমাট শুব্ধতা।

বর এল।

ভোঁ—ও—ও সারা গ্রাম সচকিত করে মেষশৃঙ্গের শিঙ্গা বেজে উঠল। রাব্বি নিতান্ত অনাড়ম্বর ভাবে সামসনের হাতখানা টেনে থাম্নুমের হাতে রেখে রঙ্গীন সুতো দিয়ে বেঁধে দিল। আর উচ্চকণ্ঠে মন্ত্র বলতে লাগল।

এক সময়ে স্তব্ধ হল রাব্বি।

এইবার শুভবিবাহের মঙ্গলঘটের প্রতীক স্ফটিক নির্মিত সুদৃশ্য পাত্র এগিয়ে দিয়ে রাব্বি বলল সামসনকে—বাবা, এই মন্ত্রপাত্রটিকে একটি আঘাতে ভেঙ্গে ফেলতে হবে—

কেন?

একটি ঘায়ে ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করতে পারলে বুঝতে হবে, সারা জীবন তুমি থাম্নুম মায়ের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবে—

হাসল সামসন।

সুরাধারটিকে একটি আঘাতে ধুলোর মত গুঁড়ো করে ফেলল। শুভবিবাহের অনুষ্ঠান শেষ হল।

সত্যে রূপায়িত হল সামসন আর থাম্নুমের স্বপ্ন।

বিবদমান দুইটি দেশের দুইটি ভিন্ন ভিন্ন জাতির এই দুইটি নরনারীর

সার্থক এই মিলনের মাধ্যমেই মৈত্রীর সেতুবন্ধন রচিত হতে পারতো কিন্তু—

তা হয় নি সামসনের, স্বপ্ন যে ছিল আরও অনেক বড়। ঈশ্বর যে তাকে দিয়েছেন মহৎ দায়িত্ব ফিলিস্তীয় শাসনের অভিশাপ থেকে তার জন্মভূমি-জুডিয়ার মুক্তি।

ফিলিস্তাইনের প্রথা অনুযায়ী বিয়ের পর বর কনেকে পুরো একটা সপ্তাহ মেয়ের গৃহে একত্র বাস করতে হয়। সপ্তাহন্তে প্রীতিভোজের আয়োজন করতে হয় বরকেই।

দিনের পর দিন থামুমকে নিয়ে মত্ত উচ্ছ্বাসে প্রমত্ত নিশিযাপন করে সামসন। কিন্তু থেকে থেকে কেমন আনমনা হয়ে যায়। উদভ্রান্তের মত কখনো আস্কেলনের নিবিড় অরণ্যে কখনো কোন গিরি নির্ঝরের ধারে গিয়ে স্তব্ধ একটা পাথুরে মূর্তির মত বসে থাকে—

কি হয়েছে গো—তোমার, আমাকে বলবে না—ভয়ে দুরু দুরু কাঁপে থামুমের বুক। আবার বুঝি কোন সংঘর্ষ। কোন রক্তাক্ত যুদ্ধের দুরভিসন্ধি ওর মাথায় ধূমায়িত হয়ে উঠেছে—

শোন থামুম, আমি ভেবেছি বলেই কতগুলো কথা ফিসফিস করে বলল।

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল থামুমের মুখ। আর অপসারিত হয়ে গেল দুর্ভাবনার মেঘ। বলল, ওদের জব্দ করার খুব চমৎকার ফন্দী বের করেছো-একটু থেমে আবার বলল, দেখ—আবার ঝগড়াঝাঁটি করে কোন অনর্থ করো না-

শোন, তুমি কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না—

নিশ্চয়—তুমি বলছো কি—বলেই সামসনের গালে তপ্ত একটা চুম্বন এঁকে দিয়ে আব্দারের সুরে বলল, কিন্তু তুমি আমাকে উত্তরগুলো বলবে তো?

সামসন স্ত্রীর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে চাপা গলায় বলল, তাদের আসন্ন প্রীতিভোজের অনুষ্ঠানে কৌতুককর পরিকল্পনার আসল চাবিকাঠি।

আস্কেলন পাহাড়ের পাদদেশে নানা বর্ণের ফুলের সমারোহে ভরা এক বিস্তীর্ণ উদ্যানে সাতদিন ধরে চলেছে প্রীতিভোজের কলরব মুখরিত বর্ণাঢ্য উৎসব।

শেষদিনে সামসন ত্রিশজন ফিলিস্তীয় তরুণ যোদ্ধাকে বিশেষ আমন্ত্রণ জানিয়ে বলল, শোন—তোমরা ফিলিস্তীয়রা ধাঁধা আর হেঁয়ালীতে খুব পটু, একটু থামল। প্রথমদিন তাকে ধাঁধা ধরে যে বিপর্যয়ের ভেতরে ফেলেছিল সেই

দুঃসহ দুঃস্মৃতি বুকের ভেতরে চিন চিন করে জ্বলতে লাগল। বলল, এইবার আমি তোমাদের দুইটি হেঁয়ালী ধরবো—যদি পারো—একটু থেমে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, আমি বাজী রাখছি—তোমাদের প্রত্যেককে অর্থাৎ ত্রিশখণ্ড মহার্ঘ বস্ত্র এবং ত্রিশটি মূল্যবান পোশাক দেব। ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে আবার বলল, কিন্তু যদি তোমরা না পারো—

স্তব্ধ হয়ে থাকল ফিলিস্তীয় যুবকরা।

কয়েকমুহূর্ত পরে তাদের ভেতরে এক দুঃসাহসী বলল, বেশ আমরাও দেব আপনাকে ওই জিনিসগুলো—আপনি আপনার হেঁয়ালী বলুন—

সামসন হেঁকে বলতে শুরু করল তার প্রথম হেঁয়ালী—

জলজন্তু নহে কিন্তু জলমধ্যে রয়।
মনুষ্য প্রভৃতি সবে বক্ষে করি লয়॥
পদ নাই কিন্তু ধায় পবনের গতি।
কানে ধরি বলে যেই, সেই তার পতি॥

ফিলিস্তীয় যুবকরা ভাবে, তারা তো জলের দেশের মানুষ। ইজিয়ান সাগর সন্নিহিত দেশ থেকে এসেছে—কৈ তারা তো দেখেনি এমন কোন বস্তু যা জলজন্তু নয়—অথচ জলে থাকে—আবার মানুষ প্রভৃতি বহন করে—না—

ধীরে ধীরে তাদের চোখে হতাশার ছায়া নেমে আসে।

ঘর পোড়া গরু যেমন তেমনি সিঁদুরে মেঘের আভাস পেয়ে ভীত হয়ে ওঠে থামুম। সামসনের বুকে মাথা রেখে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে—বলো—গো—বলে দাও উত্তরটা—

থামুম, তুই আমাদের স্বজাতির মেয়ে—তোর জাতের—তোর দেশের সম্মান—ফিলিস্তীয়রা থামুমের কানের কাছে তারস্বরে চীৎকার করে।

তোমরা পারলে না—পারো নি, সামসন ঘোষণা করল। যেন কোন বিচারক মৃত্যুদণ্ডের রায় দিচ্ছেন। তেমনি শীতল, নিষ্প্রাণ আর নির্বিকার কণ্ঠস্বর!

শোন—আর একটা হেঁয়ালী, সামসন আবার হেঁকে বলল, চেষ্টা করে দেখ-যদি পারো—

চারটি ঘড়া, রসেভরা।
আ ঢাকা তার উপুর করা॥
কহে সামসন।
ভাব বসে দিয়া মন॥

ব্যর্থ হতাশ ফিলিস্তীয় যুবকদের মনের ভেতরে আবার—তুরপুনের মত বিধে গেল এই ধাঁধার রহস্যটা—উপুড় করা ঘড়া রসে ভরা হবে কি করে—

ওরা পারবে না গো, তুমি—তুমি—সামসনের চওড়া বুকে মাথা ঘসতে ঘসতে বলল খাম্নুম, তুমি বলে দাও—তার বুকের ভেতর থেকে একটা কান্নার ঢেউ পাক দিয়ে উঠল।

ফিলিস্তীয় ছেলেরা পারবে না—পারবে না বাজীর ত্রিশটা বস্ত্রখণ্ড—আর ত্রিশটি পোশাক দিতে। আর তখুনি শুরু হয়ে যাবে সেই রক্তারক্তি—উঃ না—আর সে ভাবতে পারছে না। মনে হল, তার মাথার ভেতরটা টলছে।

তুমি অত ঘাবড়াচ্ছো কেন? কেমন পাথরের মত কঠিন আর শীতল শোনায় সামসনের কণ্ঠস্বর। পিঁপড়ার কামড়ের মত কুটুস করে বলে চেষ্টা করুক না—হুঁ হুঁ বাবা—এই ধাঁধা নিয়ে তো আমাকে কম নাজেহাল করেনি এরা—

তুমিও তো ছেড়ে কথা কও নি গো, যেন অতল একটা অন্ধকার গহবরে ডুবে যেতে যেতে ক্ষীণ অস্ফুটকণ্ঠে বলল, তুমি সেদিন দশজনকে যমের দুয়ারে পাঠিয়েছিলে—

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল। ফিলিস্তীয়রা খাম্নুমকে একটু আড়ালে নিয়ে যেয়ে শাসিয়ে বলল, তোর বরের কাছ থেকে শীগগীর হেঁয়ালীর উত্তর জেনে আয়—তা না করলে—

তোকে আর তোর বুড়ো বাপটাকে আমরা জীবন্ত পুড়িয়ে—

না—না—দুহাতে বুক চেপে ধরে আর্তনাদ করে উঠল খাম্নুম। আর মৃত্যু হবে জেনেও যেমন মানুষ বিষের পাত্র মুখের কাছে তুলে ধরে ঠিক তেমনি করে দুটো উত্তর বলে দিল। বলতে বাধ্য হল।

ওহে শোন, তোমার প্রথম হেঁয়ালীটার উত্তর হল নৌকো—ফিলিস্তীয়রা সামসনকে চক্রাকারে ঘেরাও করে উল্লসিত কণ্ঠে বলতে লাগল, আর তোমার পরেরটার উত্তর—হল গরুর বাঁট—তাই না?

নিস্তব্ধ কয়েকমুহূর্ত পেরিয়ে গেল। ঝড়ের আগের মত থমথম করতে লাগল সেই সর্বনাশা হেঁয়ালীর আসর। ভীরু হরিণীর মত ভয়ে থরথর করে কাঁপছে খাম্নুম।

আরে আমার ওই বকনা বাছুরটা না বলে দিলে তোরা আমার একটা হেঁয়ালীরও উত্তর দিতে পারতিস না—

কী! শয়তানী করার আর জায়গা পাওনি ক্ষিপ্ত আক্রোশে চীৎকার করে

উঠল ফিলিস্তীয়রা, তুমি নিশ্চয় বাজীর জিনিসগুলো দিতে হবে বলে যা-তা—

বাজীর জিনিস—না—বাজীর মিহি বস্ত্র আর পোশাকের খুব শখ—না? হিংস্র একটা হাসি ছোরার ধারের মত ফুটে উঠল তার ঠোঁটের রেখায় রেখায়। আর দেখতে দেখতেই তার মাথার সোনালী চুলগুলো এক একটা শানিত তরবারির মত উদ্যত হয়ে উঠল। দীর্ঘ দেহের এক একটা পেশী ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। তার ভেতরে জেগে উঠল আসুরিক শক্তি। নিরস্ত্র অসতর্ক ফিলিস্তীয়দের এক একজনকে ধরে পাথরে আছড়ে খুন করে ফেলল। তাজা রক্ত মৃত্যু যন্ত্রণার তীব্র আর্তনাদে সারা গ্রাম যেন আড়ষ্ঠ ব্যথায় শিউরে উঠল।

কি হয়েছে—কি হয়েছে আতঙ্কিত হয়ে ছুটে যেই আসতে লাগল গ্রামবাসীরা অমনি শক্ত করে থামুমের হাতটা মুঠোর ভেতরে নিয়ে দ্রুত উত্তেজিত কণ্ঠে বলল সামসন চলো থামুম—ফিলিস্তীয়রা আমার শত্রু—কিন্তু তোমাকে ভালবাসি—চলো—

নিষ্প্রাণ পুতুলের মত থামুম তাকে অনুসরণ করল। কিন্তু যাওয়ার আগে ত্রিশটি মৃতদেহকে বিবস্ত্র করে ত্রিশটি পোশাক নিয়ে তার বাজীর জিনিস হস্তগত করল। থামুমকে পিঠে বেঁধে নিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে যেতেই হঠাৎ হাত ফসকে মাটিতে পড়ে গেল তার অনেক সংঘর্ষ অনেক রক্তে রঞ্জিত প্রাণের প্রতিমা—

থামুম।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল সশস্ত্র জনতা। আক্রোশে ক্ষিপ্ত হয়ে থামুমের বাবা বলল, খবরদার ওই খুনে দৈত্যটার সঙ্গে যাবি তো তোকে কেটে দু'টুকরো করে ফেলব—

থা—মু—ম—একটা বড় গাছের লতা ধরে দোল খেয়ে পাহাড়ের উঁচু চূড়ায় বাতাস কেটে চলে যেতে যেতে চীৎকার করে বলল সামসন—তোমার জন্যই আমি আবার আ—স—বো—

বাতাসে গোঁ গোঁ শব্দ তুলে ঝাঁকে ঝাঁকে বিষাক্ত তীর ছুটে গেল তার দিকে অনিবার্য মৃত্যুর নিশানা নিয়ে ছুটল সড়কি, বল্লম—আরও কত কি—কিন্তু—

সব ব্যর্থ। নিস্ফল। প্রতিটি অস্ত্র পাহাড়ের শক্ত পাথরের খানিকটা চটিয়ে দিয়ে টং—টং শব্দ করে মাটিতে পড়ে যেতে লাগল।

আর—সামসন!

দেবতার প্রসাদে অজেয়, দুর্ধর্ষ সামসন। ফিলিস্তীয় নিধনের জন্য ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ সামসন তারপর কি করল?

পুরাতন পদ্ধতির বাইবেলে আছে তার চমকপ্রদ ইতিবৃত্ত—

আশ্কেলন পাহাড় ডিঙিয়ে স্বগৃহ অভিমুখে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সামসন। পর্বতের শীর্ষদেশ থেকে তার নজরে পড়ল, ফিলিস্তীয়দের রক্তে আর ঘামে পুষ্ট ঘণ সবুজের ছবির মত গমের ক্ষেত। হাজারো শত্রুর অন্ন ওই আহার্যে তারা পুষ্ট হবে।

না—যেমন করে হোক বিনষ্ট করতে হবে ওই অপর্যাপ্ত ফসল। নেমে এল পাহাড়ের গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করল। ধরে নিয়ে এল তিনশো খেঁকশিয়া তাদের জোড়ায় জোড়ায় লেজ দিয়ে বেঁধে তার মাঝখানে বসিয়ে দিল এক একটা ছোট ছোট জ্বলন্ত মশাল। আর ফসলের ঐশ্বর্যে ভরা বিস্তীর্ণ প্রান্তরে নিষ্ঠু অভিশাপের মত ঝাঁপিয়ে নেমে এল দেড়শত লেলিহান আগুনের শিখা। দেখতে দেখতে জ্বলে পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেল বিশাল ক্ষেত।

মর্মান্তিক আক্ষেপে ফুঁসে উঠল সমগ্র ফিলিস্তাইন। জ্বলে উঠল আগুন আস্কালনে, গাজায় ইত্যাদি শহরে-জনপদে গ্রামে-গঞ্জে লক্ষ মানুষের সমবে কণ্ঠে গর্জে উঠল—

সামসনের মুণ্ডু চাই—

ফিলিস্তাইনের সশস্ত্র এক বিশাল সেনাবাহিনী সমগ্র জুডিয়া অবরোধ কর জুডিয়ার বিশিষ্ট জননায়করা ব্যাকুল হয়ে বলল, আমরা তো ফিলিস্তাইনে অধীনতা স্বীকার করেছি–তবুও এই—

ফিলিস্তাইনের প্রধান সেনানায়ক বলল, গোটা জুডিয়া আমাদের অধিকা থাকলেও ড্যানীয় উপজাতিরা আমাদের বশ্যতা স্বীকার করেনি—তা নিশ্চ জানেন আপনারা। ড্যানীয়রা প্রায়ই আমাদের এলাকায় চড়াও হয়ে লুঠতর করে থাকে—আমরা কিছু বলি নি। কিন্তু তাদের নেতা সামসন—উ উত্তেজনায় স্তব্ধ হয়ে গেল সেনানায়ক। ধীরে ধীরে সামসনের সঙ্গে খাম্ন বিয়ে থেকে শুরু করে যাবতীয় বৃত্তান্ত জানালো—

চলুন—আমাদের সঙ্গে—জুডিয়ার জনপ্রতিনিধিরা বলল, একজ কুকীর্তির জন্য গোটা দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে—তা হতে পারে না—আ সামসনকে আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে বলবো—

তারা ফিলিস্তাইনের সেনাপতি এবং আরও কয়েকজনকে নিয়ে জুডিয়ার পর্বত শ্রেণীর পাদদেশে সেই জারোয়া গ্রামে সামসনের গৃহে। কি

সেখানে নেই সামসন। তার পিতা ম্যানোয়া ধার্মিক মানুষ। জীহো নামে শপথ করে জানালো টিমনাথে বিয়ে করতে গিয়ে শ্বশুর গৃহ থেকে স্বগৃহে ফিরে আসে নি সামসন।

কিন্তু সামসনকে না পেলে গোটা জুডিয়ার প্রতিটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করবো—হিংস্র ব্যাঘ্রের মত গর্জন করে উঠল ফিলিস্তাইন সেনানায়ক।

জুডিয়ার নেতারা সারা জুডিয়ার বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে পেল না তার সন্ধান। এটনের গিরিগুহায় আত্মগোপন করে ছিল সামসন।

সামসন, তুমি জুডিয়াকে রক্ষা কর—ব্যাকুল হয়ে বলল জুডিয়ার নেতারা, নিরীহ অধিবাসীরা কোন অপরাধ করে নি—

আমার খানুম—খানুমকে ফিরিয়ে দিতে হবে শপথ করুক ফিলিস্তীয়রা বলল সামসন। দূরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ফিলিস্তাইনের বিশাল সৈন্যসমাবেশের দিকে তাকিয়ে আবার বলল আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—আমি নিজে ক্রীতদাসের মত খেটে তাদের ক্ষতিপূরণ করে দেব—

দেব—আমরা খানুমকে ফিরিয়ে দেব ফিলিস্তীয়রা সমবেত কণ্ঠে শপথ করল। কিন্তু তাদের সেনানায়ক বলল, তোমার অসামান্য শক্তিকে আমরা বিশ্বাস করি না—তোমাকে কিন্তু আমরা বেঁধে নিয়ে যাবো—

কোন কথা বলল না সামসন। খানুমের সুডৌল মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল। গভীর মমতায় ভরা তার দুটো চোখ। পাথর কেটে কেটে কুঁদে গড়া তন্বী রমণী মূর্তির মত তার সেই দীর্ঘ উদ্ধত দেহছন্দের অপূর্ব আস্বাদ, সব সব মধুর স্মৃতি যেন বিষাক্ত সরীসৃপের মত তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরল। তাই ঈশ্বরের অনুগ্রহে অমিত শক্তিধর হয়েও দুর্বল ও কাপুরুষের মত নতিস্বীকার করল। অবসন্ন কণ্ঠে অস্ফুটস্বরে বলল, বেশ তাই হবে—

গাছের মজবুত লতা দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে তাকে বেঁধে ফিলিস্তীয়রা যাত্রা করল টিমনাথে। যেতে যেতে বলল, সামসন, খানুমকে ফিরিয়ে দিলে আমি আর কখনো তোমাদের ক্ষতি করবো না—একটু থেমে আবার বলল, তোমাদের দেশেই ঘর বেঁধে থাকবো—আমি চাষীর ছেলে দুহাতে খেটে তোমাদের ক্ষেতে সোনা ফলিয়ে দেব—হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। সেনানায়কের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে অসহায় একটা শিশুর মত বলল, তোমরা খানুমকে দেবে তো, কেমন করুণ কান্নার মত শোনালো তার কথাগুলো।

জুডিয়ার নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ পর্বতশ্রেণী পেরিয়ে তারা এল ফিলিস্তাইনে। কিন্তু টিমনাথের কাছাকাছি যেতেই তারা দেখল, লেলিহান আগুনের আভায় রক্তিম হয়ে উঠেছে আকাশ। কানে এল উল্লসিত কলরব—আগুন—আগুন—

আগুন লাগিয়ে দিয়েছি ওই সর্বনাশী কুলটা মাগীটার বাড়িতে—

এ কী! খানুমদের বাড়িতে আগুন মনে হচ্ছে! তীব্র উত্তেজনায় আর্তনাদ

করে উঠল সামসন। মুহূর্তে দীর্ঘ সোনালী কেশরাশি স্ফীত হয়ে উঠল। দেহে জেগে উঠল আসুরিক শক্তি। অগ্নিদগ্ধ রশির মত লতার বাঁধন ছিন্ন হয়ে গেল। বদ্ধ উন্মাদের মত চীৎকার করতে করতে ছুটল সামসন।

থা—মু—ম—থা—মু—ম—

কিন্তু—

যেই দেখল সামসন, থাম্নুমের বাড়িতে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন আর জানতে পারল টিমনাথের ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকরা আক্রোশে বিক্ষুব্ধ হয়ে তার থাম্নুমের গৃহে অগ্নিসংযোগ করেছে, থাম্নুম আর তার পিতা এবং পরিবারের প্রত্যেকে সেই জ্বলন্ত গৃহের ভেতরে জীবন্ত দগ্ধ হচ্ছে অমনি—

অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে বসল সামসন। মাঠে ঘুরছিল একটি গাধা। তাকে হত্যা করে তার চোয়ালের শক্ত হাড় দিয়ে ধারালো অস্ত্র তৈরী করে ফেলল চোখের পলকে। আর তীক্ষ্ণধার চক্রের মত সেই অস্ত্র ছুঁড়ে দিয়ে মত্ত আক্রোশে হত্যা করতে লাগল ফিলিস্তীয়দের। দৈবশক্তির প্রভাবেই নিমেষে বিশাল সেনাবাহিনীর হাজার হাজার সৈনিকের প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

পুরাতন নিয়মের বাইবেলের অগ্রগণ্য মহানায়ক, অমিত শক্তিধর সামসনের ইতিবৃত্ত কেমন অবাস্তব আর অসম্ভব বলে মনে হয়, মনে হয় তার অসাধারণ বীরত্বের কাহিনীও যেন অতিরঞ্জিত। কিন্তু—

মিথ্যা নয়—কল্পনা নয়, সুগঠিত স্বাস্থ্যের সৌন্দর্যে রূপবতী খরযৌবনা ফিলিস্তীয় রমণীদের প্রতি তার তীব্র আকর্ষণ। ইস্রায়েলের ইতিহাসে আছে—He (Samson) menifested courage against men and weakness in regard to women. অর্থাৎ ফিলিস্তীয় পুরুষদের বিরুদ্ধে প্রতিভাত হয়েছিল তার অসামান্য বীরত্ব আর নারীদের প্রতি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল তার দুর্বলতা—তার নিবিড় সহানুভূতি যা প্রণয়েরই নামান্তর মাত্র।

আর এক ফিলিস্তীয় রূপসী ডিলায়লার সঙ্গেও তার গভীর প্রণয়ের সেই চমকপ্রদ ইতিবৃত্ত কারো অজানা নেই। আর ডিলায়লার বিশ্বাসঘাতকায় তার সোনার মত অত্যুজ্জ্বল কেশরাশির কোষে কোষে সঞ্চিত বিপুল শক্তি, এবং তার মদ্য পানের বিষময় পরিণাম ইত্যাদি গুপ্তরহস্যগুলো শত্রুপক্ষ জানতে পারায় সামসনের করুণ শোকাবহ পরিণতি আর শেষপর্যন্ত বীরের মত মৃত্যুবরণের কাহিনীও বহুল প্রচারিত। কিন্তু—

মনে প্রশ্ন জাগে, সত্যিই কি সামসনের অস্তিত্ব ছিল? বাইবেল বিশেষজ্ঞ

এবং প্রাচীন ইতিহাসের পণ্ডিতরা জানিয়েছেন—সামসনের বিপুল দৈহিকশক্তি এবং চমকপ্রদ রণনৈপুণ্যের নানা বর্ণাঢ্য বিভিন্ন কাহিনীতে বর্ণিত স্থান ও কালের ওপরে দীর্ঘ গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে—সামসন ছিলেন এক ঐতিহাসিক ব্যক্তি। হীব্রুদের 'হারকিউলিস'!

সামসনকে হীব্রু ভাষায় বলে সিমসন অর্থাৎ সূর্য। সামসনের মাথায় সূর্যের প্রদীপ্ত রশ্মির মত অত্যুজ্জ্বল দীর্ঘ কেশরাশির বর্ণনায় মনে হয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পৌরাণিককালের দেবতার মতই সামসনকেও সূর্যদেবতা বলে কল্পনা করা হয়েছে।

আজ সামসন নেই। কিন্তু আজও আছে ভূমধ্যসাগর সন্নিহিত তার দেশ। সম্প্রতি প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে পাওয়া গিয়েছে বাইবেলের সেই মহানায়কের অস্তিত্বের নানা নিদর্শন আর জানা গিয়েছে সেই রামেথ লেহি পাঁহাড়ের সঠিক অবস্থান যেখানে সামসন হনুস্থির (গর্দভের চোয়ালের হাড়) দিয়ে নিহত করেছিল সহস্র শত্রু।

রামেথ লেহী এই হীব্রু শব্দটির অর্থ হল গাধার চোয়াল। হাজার হাজার বছরের ব্যবধান এড়িয়ে সামসনের ব্যর্থ প্রেমের বেদনাদীর্ণ স্মৃতি নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে সেই--

রামেথ লেহী পাহাড়।

বোয়াজ ও রুথ

বাইবেলের এই প্রেমকাহিনীটির একটু গৌরচন্দ্রিকা দরকার।

এই গল্পের নায়ক ও নায়িকার যে প্রেম লোকচক্ষুর অগোচরে দিগন্তবিসারী সবুজ গমের ক্ষেতে, ওক গাছের নিবিড় নীলাভ ছায়ায় একটি বন্যলতার মতই ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছিল, তাদের যে গভীর প্রণয়ের ছন্দোসুরভিত মুহূর্তগুলির সাক্ষী ছিল বিপুলব্যাপ্ত নীল আকাশ; তার ইতিবৃত্ত জানতে হলে যেতে হবে—চলে যেতে হবে হাজার হাজার বছর আগে যখন ইস্রায়েলীরা বহু যুগ-যুগান্তর ধরে বনে-প্রান্তরে মরুভূমিতে যাযাবর জীবনযাপন করে সন্থ প্যালেস্তাইনে বসতি করেছে, যখন তারা জানতো না চাষবাসের কৌশল, জানতো না ভূমিলক্ষ্মীর অপার ঐশ্বর্যের সন্ধান। কিন্তু—

ঘনসন্নিবদ্ধ তরুশ্রেণীতে আচ্ছন্ন ছায়াসুনিবিড় গ্যালিলির সুউচ্চ ভূমিতে বসত করে তারা দেখল, ভূমি কর্ষণ করে শস্য উৎপাদন করছে সেখানকার আদিবাসী কনানীরা। তারাও ধীরে ধীরে জানল গম উৎপাদনের কলাকৌশল। শিখল জলপাই নিষ্কাষণ করে তৈল তৈরী করতে, তৈরী করতে শিখল সুপক্ক দ্রাক্ষা নিষ্পেষিত করে উৎকৃষ্ট মদ্য।

যে সময়ে তারা রুটি মদ্য আর তৈল্য প্যালেস্তাইনের প্রধান তিনটি খাদ্য-সামগ্রী উৎপাদন করতে সুদক্ষ হয়ে উঠেছিল, আর ক্রমশ নিবিড় হয়ে উঠেছিল মাটির ওপরে তাদের মমতা, এই কাহিনী সেই সময়ের—

সে আসছে।

আসছে যেন হাওয়ার ওপর পা ফেলে রঙীন প্রজাপতির মত। পরণে ঘন সবুজ রঙের কুর্তা। মাথায় রক্তবর্ণ রেশমী রুমাল ওর আঁটোসাঁটো চেহারা। পাতলা জামার আড়ালে সুডৌল বুকের ছায়াময় আভাস গমের ক্ষেতের কৃষাণ-দের চঞ্চল করে তুলল।

রুথ এদিকে এস—এই যে এদিকে—

এখানে অনেক শীষ পাবে—

সেই সকাল থেকে তোমার জন্য শীষ জমিয়ে রেখেছি—চারিদিক থেকে উচ্ছ্বসিত আর সরব অভ্যর্থনার ঝড় বয়ে গেল।

রুথ কিন্তু কারো কথার কোন উত্তর দিল না। কারো দিকে তাকিয়েও দেখল না। শুধু সবুজ সমুদ্রের মত দিগবিকীর্ণ সেই গমের ক্ষেতের মাঝখানে বনদেবীর মত দাঁড়িয়ে রইল!

সাঁ সাঁ বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে বুক সমান উঁচু গমের গাছ। রুথ কয়েক-মুহূর্ত কি যেন ভাবল। পায়ের গোড়ালী উঁচু করে দূরে রাস্তার দিকে উৎসুক চোখে তাকালো। নাঃ কাউকে দেখা যাচ্ছে না!

শুধু দুপাশে ঘন সবুজ ক্ষেতের মাঝখানে লাল মাটির রাস্তাটা মেটে সাপের মত গা এলিয়ে পড়ে রয়েছে। হতাশার ছায়া নামল রুথের কালো ডাগর চোখে।

সে ধীর পায়ে এল। এল ওক গাছের নীচে উত্তরদিকের জমিতে। তার শ্বশুর এলিমেলিচের জমি। কিন্তু যেই সেই ক্ষেতে পা দিল অমনি সুগন্ধী ধূপের মত তাকে জড়িয়ে ধরল সাবেক দিনের-স্মৃতি।

শাশুড়ীর কাছে শুনেছে—বহুদিন আগে নাকি এই বেথলেহামে একবার দারুণ আকাল হয়েছিল। সেই সময় শ্বশুরমশাই সপরিবারে চলে গিয়েছিল ইস্রায়াইল আর জর্ডনের সীমানার মাঝখানে মরুসাগর ছাড়িয়ে আরও দূরে মাওবে।

মাওব তার জন্মভূমি। তারা হীব্রু ভাষায় কথা বলে না। মূর্তিপূজা করে। আরও অনেক অমিল থাকা সত্ত্বেও তার রূপে মুগ্ধ হয়েই শ্বশুরমশাই ছোট ছেলে চিলিয়নের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিল। মাওবের উর্বর মাটিতে সোনা ফলে। মাঠে মাঠে অপর্যাপ্ত ফসলে ভূমিলক্ষ্মীর হাসি ছড়িয়ে পড়ে দিক্‌দিগন্তে। চাষবাস করে বেশ সুখেই দিন কাটছিল।

কিন্তু সুখ সইল না। মাত্র ছয়মাসের ব্যবধানে সামান্য অসুখে তার স্বামী, তার ভাসুর ও শ্বশুর মারা গেল। এই বিপর্যয়ের পরই তার শাশুড়ী নাওমি তার হাত ধরে চলে এল বেথলেহামে।

পিছনে পড়ে রইল মাওব। পড়ে রইল সেখানকার মাটিতে ঝরা ফুলের বিবর্ণ এক একটা পাঁপড়ির মত তার সাবেক জীবনের কত সুখ-দুঃখ দিয়ে ঘেরা দিনগুলোর স্মৃতি।

সেই মাওবেই তার স্বামী চিলিয়ন এবং শ্বশুরের মৃত্যুর কয়েক দিন পরেই তার বড় ভাই গিলিয়নও মারা গেল। দুই জওয়ান ছেলেকে আর স্বামীকে হারিয়ে তার বৃদ্ধা শাশুড়ী নাওমি শোকে ভেঙে পড়ল। তার মনে পড়ে গেল তার নিজের দেশ সেই মরুসাগর ছাড়িয়ে বেথলে-

হামের কথা। মাওব তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। যেদিকে চোখ পড়ে সেদিকে স্বামী আর পুত্রদের অজস্র স্মৃতি তীক্ষ্ণ কাঁটার মত তাকে বিদ্ধ করতে লাগল। একদিন তিনি তাকে এবং গিলিয়নের বিধবা স্ত্রী অরফাকে ডেকে বললেন, শোন মেয়েরা আমি দেশে ফিরে যেতে চাইছি, একটু থামলেন। ব্যথাব ছায়া ফুটে উঠল তার মুখে। কেমন করুণ দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে বললেন, তোমাদের দুইজনকেই আমি ভালবাসতাম মেয়ের মত। কিন্তু—

আমাদেরও নিয়ে চলুন মা, শাশুড়ীর হাত দুটো ধরে বলেছিল অরফা। তার চোখ ফেটে জল এসে পড়েছিল!

আপনাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না মা—সেও নাওমিকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল।

তা হয় না বাছা, তোমাদের বয়স কম। এখনও দীর্ঘজীবন সামনে পড়ে রয়েছে, একটু থেমে ছাড়া ছাড়া গলায় বলেছিলেন তিনি, আমি আর কয়বছর বাঁচবো—অসহ্য একটা যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে প্রবলভাবে মাথা নেড়ে আবার বলেছিলেন না-না—আমার সঙ্গে তোমাদের জীবন জড়িও না—বিদায়ের দিন এল। নাওমিকে এগিয়ে দিতে এল।

নাওমিকে এগিয়ে দিতে গেল তারা। তাদের মনে হল—মনে হল যেন তাদের বুকটা ভেঙ্গে যাচ্ছে। দিগন্তবিসারী গমের ক্ষেতের ভেতর দিয়ে তারা দুজনেই এল বেথলেহামের রাস্তায় শাশুড়ী বললেন তোমরা ফিরে যাও অনেক-অনেক দূর এসে পড়েছো—

অরফা শাশুড়ীর গলা জড়িয়ে ধরে চুমুতে চুমুতে তার মুখখানা আচ্ছন্ন করে দিয়ে ফিরে গেল। সে গেল না। কোথায় যাবে—কার কাছে যাবে—অরফার মা-বাবা আছে। তার যে তিনকুলে আপন বলতে কেউ নেই।

একা আমাকে রেখে যেও না মা, কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে বলেছিল তুমি যেখানে থাকবে, আমি তারই পাশে এক কোণে পড়ে থাকবো—মা, তুমি খুদ গুঁড়ো যা খাবে—আমিও তাই খাবো মা—গলার ভেতরে পুঞ্জীভূত ব্যথার উজায় আর কিছু বলতে পারল না সে।

তার কান্না ধরো ধরো মূর্তিটাকে জড়িয়ে ধরে শাশুড়ী বললেন, তুই যখন এত করে বলছিস—চল—একটু থেমে আবার আস্তে আস্তে বলেছিলেন, আমারও তো বয়স হয়েছে—চল—আমার হাত-নড়ি হয়ে থাকবি—

বেথলেহামের বাজারে এসে যখন তারা পৌঁছল তখন পূবের আকাশ ফরসা

চয়ে এসেছে। বেনিয়াদের মিশরগামা কাফিলা তাদের বাজারে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। নতুন দেশেব মাটিতে পা দিয়ে আনন্দে উত্তেজনায় তার বুকের ভেতবটা গুব গুব কবে উঠেছিল।

এখানে আমাদেব বাডি কোথায় ছিল মা?

কোন কথা বলল নাওমি। বিষণ্ণ হয়ে উঠল তার মুখখানা। অদূরে ঘন সবুজ গাছপালায় আচ্ছন্ন একটি পাহাডেব দিকে ইঙ্গিত করে বলল, ওই কর্মিল পাহাড়েব নীচে আমাদের বাড়ি ছিল মা,—ভার ভার হয়ে উঠল তার কণ্ঠস্বর। আবার অস্ফুটস্বরে যেন নিজের মনেই বলল, বিশ বছর পরে কি আর ঘর-বাড়ির কোন চিহ্ন থাকে না—

বেলা বাড়ে। একটি দুটি করে দোকান খুলতে থাকে। আর দূর গ্রাম গ্রামান্তর থেকে খরিদ্দারও আসতে শুরু করে। ভিড় জমে। আর তাদের কৌতূহলী চোখের দৃষ্টি যেন তাকে সূঁচের মত বিদ্ধ করতে থাকে।

সে যে জানে, তার দীঘল দেহে বন্যাব নদীর মত উত্তাল যৌবন। আগুনের মত রূপ। কপালটাই না হয় ভেঙেছে। সেই সর্বনাশা ভাঙনের কোন ছাপ তো পডেনি তার রূপযৌবনে। তাকে দেখে কে বলবে, তিন বছব আগে স্বামীকে খুইয়েছে। আর দুর্বহ নিঃসঙ্গ জীবনের বোঝা বহন করছে—

আবে—নাওমি যে। একটা উল্লসিত চীৎকার যেন ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ল বাজারে।

এক বৃদ্ধ এগিয়ে এল। আর ঠিক যেমন ক্ষীণ আলোয় পুঁথি পড়ে তেমনি করে শাশুড়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি ইলিমেলেচের বৌ—

হ্যাঁ-হ্যাঁ—মোড়লমশাই, খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন শাশুড়ী, চিনতে পেরেছেন? সব শেষ করে দিয়ে দেশের মাটিতে ফিরে এলাম, আকুল কান্নায় তাব বাদবাকী কথাগুলো ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

আবার হাতের চেটো দিয়ে চোখদুটো মুছে নিয়ে, নিজেকে সংযত করে বললেন শাশুড়ী, আপনারা আর আমাকে নাওমি বলে ডাকবেন না—

কেন—কেন?

নাওমি মানে আমাদের হীব্রু ভাষায় আনন্দময়ী, একটু থেমে আবার বললেন আমি তো তা নই—আমি হতভাগী—ডাকবেন 'মারা বলে—

কি পাগলামো করছো? গ্রামবৃদ্ধের কথায় যেন ভর্ৎসনার সুর ফুটে উঠল। বলল শোন আমাদের দেশের নিয়ম জানো তো? বিদেশ থেকে কেউ এলে

তার যদি ঘরবাড়ি না থাকে, তাহলে তাকে মোড়লকেই দেখাশুনা করতে হয়—চলো আমার ওখানে—

বাবা—আজ কি গমের বীজ জমিতে ফেলব, একটি যুবক তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। দরজার কবাটের মত চওড়া বুক। থ্যাবড়া নাকটার দুপাশে ছোট ছোট চোখদুটোর তীব্র দৃষ্টি যেন তার সর্বাঙ্গ লেহন করছে।

আমার বড়ছেলে মেহলন, গ্রামপ্রধান সানবাল্লাত নাওমিকে বলল তারপর তার দিকে তাকিয়ে আবার বলল, আরে, এই মেয়েটা কে তা তো বললে না?

আর বলেন—কেন-গোদের ওপরে বিষফোড়া, নাওমি বললেন আমার ছোট ছেলের বিধবা বৌ রুথ—

বা! সুশ্রী চেহারা তো! স্থির অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল। বেশ বুঝতে পারলাম বৃদ্ধের মনের ভেতরে কিসের যেন নাড়াচাড়া চলছে! বলল কোন দেশের মেয়ে?

কেন—মাওবের। একটু থামলেন শাশুড়ী। কেন,কে জানে চাপা হাসির আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখখানা। অস্পষ্ট গলায় বললেন, অনেকদিন আমাদের সংসারে এসেছে তো হীব্রু ভাষা আমাদেব সমাজের আদব কায়দা—

প্রাচ্য দেশের প্রথা অনুযায়ী সানবাল্লাতের আতিথ্যেই তারা বেশ কিছুদিন ছিল। কিন্তু লোকের দয়াদাক্ষিণ্য নিতে তার বড় বাধে। তাই গ্রামেব বিভিন্ন বাসিন্দাদের জমিতে জনমজুরী করে বেশ দু পয়সা রোজগার করতে শুরু করল। আর শাশুড়ীকে নিয়ে আলাদা বাড়িতে উঠে এল। ভাগ্যের হাতে ঠোক্কর খাওয়া জীবনটাকে মোটামুটি গুছিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু মনে হচ্ছে প্রচণ্ড একটা আলোড়নে সব ওলটপালট হয়ে যাবে।

নিশিদিন তার চেতনার ভেতরে জলজ্বল করে যে একটি মুখের ছবি—

মেহলন।

গ্রামবৃদ্ধ সানবাল্লাতের বড় ছেলে মেহলন! দীর্ঘদিন একই বাড়িতে পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকতে থাকতে যা হয়, যা হয়ে থাকে। তার ত্রিশ বছরের বুভুক্ষ উথলি পাথাল যৌবন আর মেহলন—

শি—ষ্—স—স—তীক্ষ্ণ শিষের শব্দে বাতাস শিউরে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হাতের থাবায় আটকে গেল তার চোখদুটো।

আঃ কি করছো মেহলন, কে কোথায় থেকে দেখে ফেলবে—

কিন্তু মেহলন যেন তার কথা শুনতেই পেল না। চোখদুটো ছেড়ে তার সুগন্ধী চুলে ভরা মাথাটা নিজের বুকের ভেতরে চেপে ধরল। পুরুষের স্পর্শে

রুথের সারা শরীর কদমফুলের মত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। —তীব্র উত্তেজনায় সে থর থর করে কাঁপতে লাগল। আগুনের হলকার মত গরম নিশ্বাস পড়ছে মেহলনের। ফিস ফিস করে বলল আর তোমাকে ছাড়ছি না। তাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে এল গমের ক্ষেতের পাশেই পাহাড়ী বাঁশবনের নীলাভ অন্ধকারে। আর কাঁপা কাঁপা হাতে দ্রুত খুলে ফেলল রুথের কুর্তার ফিতে। অনাবৃত বক্ষদেশের সেই অপরূপ সম্ভারের অনির্বচনীয় সৌন্দর্য উন্মত্ত করে তুলল মেহলনকে। তার মনে হল—মনে হল যেন মহাসিন্ধুর অতল থেকে উঠে এসেছে ধরিত্রীর আদিমতম মানবী! এসেছে দেহে যৌবনের আশ্চর্য পসরা সাজিয়ে তারই সম্ভোগের জন্য।

মেহলনের রোমকূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে পড়ল। আর বন্ধ উন্মাদের মত কামনার সেই উত্তাল সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেহলন। লুপ্ত হয়ে গেল বাইরের অবারিত পৃথিবী। হারিয়ে গেল নীলাভ ছায়া ছায়া অন্ধকারে আচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ বাঁশবন।

আশ্লেষ ক্লান্ত রুথ দুর্বল আর অবসন্ন দেহটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তীব্র অনুশোচনায় ছেয়ে গিয়েছে তার মন। উপোষী যৌবনের জ্বালায় এ সে কি করে চলেছে। চোখ ফেটে জল এসে পড়ল তার।

তার মনে হল, তার শ্বশুর এলিমেলেচের সুদীর্ঘ অনুপস্থিতি তার জমির তদারক করার দায়িত্ব, গ্রাম প্রধান সানবাল্লাতের ওপরে ছিল। বলা-বাহুল্য ভোগ করতো তারা। এখন এদেশের জমিসংক্রান্ত আইন অনুযায়ী যদি সানবাল্লাত তথা মেহলন সে জমির সত্ব দাবী করে, তাহলে এলিমেলেচের ন্যায্য উত্তরাধিকারী অর্থাৎ আইন মতাবেক বর্তমান মালিক বলেই তাকে বিয়ে করতেই হবে!

মেহলন তার জমির মালিকানা চায়। তাকেও চায়। কিন্তু কেন যে পঞ্চায়েতের কাছে যেয়ে সান বাল্লাত বা তার ছেলে পাকা বিলি ব্যবস্থা করছে না, অনেক চিন্তা করেও, তা বুঝতে পারছে না। তার শাশুড়ীরও খুব ইচ্ছা মেহলনের সঙ্গেই তার বিয়েটা হয়।

মেহলন। তার সমস্ত অন্তর জুড়ে যে রয়েছে মেহলন। তার সুগঠিত স্বাস্থ্যে লীলায়িত পেশীপুঞ্জ বিশৃঙ্খল করে দিয়েছে তার চেতনা। সে যে সর্বস্ব দিয়ে তাকে ভালোবেসেছে।

হঠাৎ একটা আশঙ্কায় দুরু দুরু কেঁপে উঠল তার বুকের ভেতরটা।

ত্রিশটি শীত-গ্রীষ্ম-বসন্ত দিয়ে ঘেরা ক্ষুধার্ত যৌবনের জ্বালা জুড়াতে গিয়ে সে কি একটা ভয়ঙ্কর অজগরের মুখে এসে পড়েছে? তাকে যেন পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে—কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না—

দিদিমণি গমের শীষগুলো নিয়ে যাও—অচেনা এক কিষাণের হাতে এক-গুচ্ছ সবুজ শীষ। তার ডগাগুলো গমের এক একটা নধর ও পুষ্ট দানার ভারে নুয়ে পড়েছে।

কিন্তু রুথের চোখে অস্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠল। কে পাঠিয়েছে বুঝতে বাকী নেই তার। কিন্তু—

কেন কেন এত খাতির করে!

নিশ্চয়ই ওই খেজুর গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। বয়স হতে পারে পঞ্চাশ কি ষাট। বোঝা যায় না। মাথায় কাঁচাপাকা কদমছাঁট চুল। কাঁচা মাটির রাস্তার মত এবড়ো-খেবড়ো আর কেমন ভাবলেশহীন নির্বিকার মুখ।

রোয়াজ। তার শ্বশুর এলিমেলেচের এক জ্ঞাতি ভাই। এই লোকটার জমিতে সে মজুর খাটে।

সেই প্রথমদিন থেকে-ই তার ওপরে যেন বড় বেশি সদয়। গরীব ঘরের তরুণী বিধবা। তাই সহজলভ্যা। এই বৃদ্ধ কি আজ থেকে তার দিকে ছোঁক ছোঁক করছে। কিন্তু—

আশ্চর্য প্রথমদিন কিন্তু মানুষটাকে খুব উদার আর মহৎ মনে হয়েছিল। সেদিন ঠিক এইরকম সোনার মত রোদ ঝলমল করছিল দিগ্‌বিকীর্ণ সবুজ গমের ক্ষেত। মজুরদের সর্দারকে অনুরোধ করতেই তাকে কাজে নিয়েছিল। জ্ঞাতি-ভাইয়ের স্ত্রী তাই অবশ্যই শাশুড়ীকে চিনতো। নিশ্চয়ই জানতো তার দুর্ভাগ্যের কথা।

ভর দুপুরে বেথলেহাম থেকে বোয়াজ এল। ক্ষেতের দিকে তার চোখদুটো ছড়িয়ে দিয়ে যেই দেখল, মেয়ে পুরুষ মজুরদের সঙ্গে একটা অজানা সুন্দরী মেয়ে, সারি বেঁধে গমের শীষ কুড়িয়ে আঁটি বাঁধছে। আর কারো সঙ্গে একটা কথা বলছে না। মাথা নীচু করে কাজ করে চলেছে, অমনি সর্দারকে ডেকে বলল, ওই—খাপসুরৎ মেয়েটা কে রে—

প্রভু! বুড়ি নাওমির ব্যাটার বৌ মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে বলল মজুরদের প্রধান, বিধবা মানুষ। তাই—

—ও! চিলিয়নের বৌ, আহা বেচারী, বলেছিল বোয়াজ, বেশ করেছিস-

খুব ভালো করেছিস—বলতে বলতে তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। আর কেমন বিচিত্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। শির শির করে উঠেছিল তার বুকের ভেতরটা।

শোন মেয়ে, আমি তোমার শ্বশুরমশাইয়ের ছোটভাই, থেমে থেমে নরম গলায় বলেছিল বোয়াজ, তুমি কিন্তু আর কারো ক্ষেতে কাজ করতে যেও না কেমন কাঁচামাটির রাস্তার মত এবড়ো খেবড়ো আর কেমন ধোঁয়াটে মুখখানা হাসি ঝিকমিক করতে লাগল। আবার বলল, শোন বাছা, তোমার কাজ হবে কি জানো—কিষাণরা গম কেটে চলে যাবে এগিয়ে আর তুমি যাবে তাদের পিছে পিছে দেখবে এক একটি গোছা ধরে গমের দানা-ভর্তি বহু শীষ মাটিতে পড়ে রয়েছে—সেইগুলো তুমি কুড়িয়ে এক একটি আঁটি বাঁধবে, কি পারবে না?

পারবো—মাথা ঝাঁকিয়ে ভাঙা ভাঙা হীব্রুতে বলেছিল। তখন এ দেশের ভাষা ভালো বলতে পারতো না।

শোন—তোমার কোন অসুবিধা হলেই আমাকে বলবে। আর আমার ক্ষেতে যে মেয়েরা কাজ করছে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বেশ ভাব জমিয়ে নেবে, একটু থেমে অদূরে জোয়ান জনমজুরদের দিকে ইঙ্গিত করে গলা নামিয়ে বলেছিল। এদের সঙ্গে কিন্তু মেলামেশা করতে যেও না—কেমন? চলে যেতে যেতে আবার ফিরে এসে বলেছিল, দেখ জল তেষ্টা পেলে ক্ষেতের ওই কুয়োতে যাবে, আমার কিষাণরা জল তুলে দেবে—

অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এ দেশী কায়দায় তাকে অভিবাদন করে বলেছিল সে বিদেশী মেয়ে! দুর্ভাগ্য তাকে তাড়া করে নিয়ে এসেছে এখানে। তার এই উপকারের কথা সে কখনো ভুলতে পারবে না—

সেই বোয়াজ।

দিনে দিনে তার দিকে ওর মনযোগটা যেন বেড়ে যেতে লাগল। আগে ক্ষেতে আসতো দুপুরে একবার। এখন সময় নেই অসময় নেই যখন তখন হুট করে চলে আসে জমিতে এসেই শুরু করে তার সঙ্গে আবোল তাবোল কথা। তার কথা যেন শেষ হতেই চায় না। মেয়ে মজুররা মুখ টিপে টিপে হাসে। অস্বস্তিতে জলে যায় তার মাথার ভেতরটা।

সেই মহত্ব সেই উদারতা আর সহৃদয়তার মুখোশের আড়ালে যেন সেই হিংস্র পশুটা উকিঝুঁকি দিচ্ছে। যে কোন সময় যে কোন মুহূর্তে তার লোলুপ উল্লাসের হিংস্র থাবা এসে পড়বে। আর তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

কি গো—কি এত ভাবছো সুন্দরী, বোয়াজের কথায় যেন চমকে জেগে উঠল

আশ্চর্য! ক্ষেতের মালিক হয়েও তার সঙ্গে কেমন ধরা পড়া চোরে মত আচরণ করে।

অদ্ভুত সেই লোকটা তার আরও কাছে ঘন হয়ে এসে দূ আকাশের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, শাশুড়ীর কাছে শুধু হাতে যাবে?—নিয়ে যাও—কুকুরের কান্নার মত অদ্ভুত শব্দ করে হাসল সে। অস্পষ্ট গলায় বলল, আমি দিতে চাইলে, তুমি আপত্তি করো কেন, বলেই বুক সমান উঁচু গমের ক্ষেতের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নেব না—নেব না—করেও গমের শীষগুলো নিয়ে বাড়ি যায় রুথ।

নাওমি পুষ্ট ও সতেজ শীষগুলো দেখে খুশি হয়ে বলে,, বোয়াজ তোমা আবার দিয়েছি বুঝি? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাঙা ভাঙা গলায় বলে, বেচারীর বৌটা মরে যেতেই কেমন যেন হয়ে গেছে—মানুষ বড় ভাল—

দিন কাটে। নিবিড় বাঁশবনের কালো আদিম অন্ধকারে সরীসৃপের ম এগিয়ে আসে মেহলন। সাপিনীর মত ফুঁসে ওঠে রুথ খবরদার বলছি— আমাকে ছোঁবে না—একেবারে কাছে আসবে না—

কেন বলো তো মুহূর্তের জন্য ভ্যাবাচাকা হয়ে যায় মেহলন। কি পরক্ষণেই মুখে অনাবিল হাসি ছড়িয়ে বলল কেন রাগ করছো বলো তো সবই তো ঠিক হয়েই আছে রুথ, ধীর পায়ে কাছে এল আর রুথের জেলী মত কোমল রক্তাভ ঠোটে আলতো করে একটা চুম্বন এঁকে দিয়ে বলল, বাব শুধু অপেক্ষা করছেন এই ফসল তোলা পর্যন্ত—

সত্যি বলছো! প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোর মত জ্বলে উঠল তার চোখদুটো

তোমাকে কখন মিছে কথা বলতে পারি রুথ, গভীর বেদনায় কেমন মে হয়ে এল মেহলনের কণ্ঠস্বর। পরম আদরে তাকে বুকের ভেতরে জড়িয়ে ধ অস্পষ্ট গলায় বলল, তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমার-ই কি ভাল লাগছে রু বলতে বলতেই তাকে ঘন সবুজ ঘাসের শয্যায় শুইয়ে দিল। আর ম কোন বাগিনীর দূরাগত ঝঙ্কারে চারিদিক আচ্ছন্ন ও বিবশ করে দেওয় আগে কোন নিপুণ শিল্পী যেমন দক্ষ ও দৃঢ় হাতে তার তারযন্ত্রের ঘাটে ঘা সুর বেঁধে নেয় ঠিক তেমনি করে তার রূপরম্যা দীর্ঘতন্বী দেহের উ যৌবনচিহ্নগুলোকে নিপিষ্ট করতে লাগল মেহলন। পরম আবেশে রুথে চোখদুটো বুজে এল।

ধীরে ধীরে কেমন ঝাপসা আর অস্পষ্ট হয়ে এল তার চেতনা। আর তার মনে হল, সে নিবিড় প্রশান্তির এক গভীর সমুদ্রে একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছে। আর ডুবন্ত মানুষের মত শেষ দৃষ্টি মেলে দেখল মেহলন—তার মেহলনের প্রেম ভালবাসা আর সন্তানের কলকণ্ঠ দিয়ে ঘেরা এক সম্পন্ন ও সুখী সংসারের ছবি। কিন্তু সে ছবিও ক্রমশ বিলীন হয়ে এল।

বেথলেহামের সেই পাহাড়ের গায়ে নিবিড় বাঁশবনের আদিম অন্ধকারে দুইটি নবনারীর জীবনের ভবিষ্যত ক্রমশ যেমন জটিল হয়ে উঠছিল, তেমনি গ্রাম বৃদ্ধ সানবাল্লাতের প্ররোচনায় নাওমির স্বামী এলিমেলেচের জমিকে কেন্দ্র করে গ্রামের সব প্রবীণ মানুষের বৈষয়িকমস্তিষ্কে আবিল হয়ে উঠল সরীসৃপের মত কুটিল দুরভিসন্ধি। কিন্তু—

তার আগে নাওমির প্রতি সানবাল্লাতের চাপা আক্রোশের কারণটা বলা দরকার।

একদিন নাওমি এসেছিল সানবাল্লাতের বাড়িতে। বলল দেখুন দারুণ দুঃসময়ে আমাদের আশ্রয় দিয়ে অনেক উপকার করেছেন, জীহোভা আপনার মঙ্গল—

কি বলতে এসেছো, বলো না—একটু যেন বিরক্ত হয়ে বলল, আমি আমার কর্তব্য করেছি।

আমার স্বামীর জমিটা যদি আমাকে ছেড়ে দিতেন ভয়ে ভয়ে বলল নাওমি, আমি অনাথা বিধবা মানুষ—একটু থামল আর ওই উঠতি বয়সের মেয়েটারও তো একটা ভবিষ্যৎ—

কোন কথা বলল না সানবাল্লাত। শুধু রেখাজটিল মুখখানা কঠিন হয়ে উঠল। কোঁচকানো চোখের কোণা দিয়ে একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন ঘ্যাসঘেসে গলায় বলল, জমিটা ছেড়ে দিলে তুমি কি করবে শুনি ?

কেন—বিক্রি করে দেব, উৎসাহে নাওমির চোখদুটো জলজল করতে লাগল, আর যে কিনবে, সে রুথকে বিয়ে করবে একটু থেমে আবার বলল, শুনেছি—এইরকমই তো জমিজমার আইনে আছে—তাই না ?

আইন-টাইন তো সব জেনে ফেলেছো দেখছি। কিন্তু আমি যে বিশবছর ধরে তোমার জমিটা দেখাশোনা করলাম—আমার সত্বটা—

সে কী, জমি আমার নয়, আপনার ? কেমন আর্তনাদের মত শোনালো নাওমির কথাগুলো।

আপনিই কিনে নিন না। মেহলনের সঙ্গে রুথের বেশ মাখামাখি আছেই—এসব কথা বলতে চেয়েছিল। কিন্তু বলল না। সানবাল্লাতের মতিগতি সুবিধার নয়। আর বিদেশী, পৌত্তলিকদের মেয়ে। বিয়ের প্রস্তাব দিলে হয়তো রুষ্ট হবে—

কি এত ভাবছো—গাঁয়ের পঞ্চায়েতে এসো। সেখানে বলবে তোমার বক্তব্য, একটু থামল সানবাল্লাত। কেমন গুজগুজ করে হাসল। ঝাপসা গলায় বলল, পাঁচজন যা বলবে—তাই হবে—

সেইদিনই মেহলনও ভয়ে ভয়ে সানবাল্লাতের কাছে বলেছিল, বাবা—আমি রুথকে—ওই যে চিলিয়নের বৌ—

কী! ওই বিধর্মী মেয়েটাকে তুই ধরে নিয়ে আসতে চাস? বৃদ্ধের কুঞ্চিত চোখে আগুন ঝিকিয়ে উঠেছিল। তীব্র ঘৃণায় মাটিতে একদলা থুথু ফেলে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিল, জানিস ওরা শুধু পাথরের তৈরি দেবতা—চেমস না, কি যেন বলে তার পূজাই করে না, ওদের মেয়েরা দেবতার সামনে নাচে—গান গায়—বেশ্যাবৃত্তি করে—ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে মেহলনের বিহ্বল মুখের দিকে জলন্তদৃষ্টিতে তাকিয়ে কঠোর কণ্ঠে বলেছিল, ওসব মতলব করলে তোমাকে কেটে দু-টুকরো করে জর্ডনের জলে ভাসিয়ে দেব—

কিন্তু আরও বড় বিপদ, নিয়তির আরও নিদারুণ চক্রান্ত প্রতীক্ষা করছিল অসহায় বিধবা নাওমির।

দেখতে দেখতে রুথের দীর্ঘ ছিপ ছিপে শরীরটা ভাদ্রের ভরা নদীর মত ভারী আর কেমন দলমলে হয়ে উঠেছিল। আতঙ্কের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল নাওমির চোখে। সস্নেহে পিঠে হাত রেখে বলল, এ তুই কী সর্বনাশ করেছিস মা!

রুথ কোন কথা বলল না। নাওমির বুকের ভেতরে মাথা গুঁজে অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ল।

হতভাগী, দেহের এত জ্বালা নিয়ে তুই গলায় দড়ি দিতে পারলি না, এসব কথা অন্য যে কোন শাশুড়ী হলে বলতো। কিন্তু রুথকে সে ভালবাসে নিজের গর্ভজাত কন্যার মত। তাই শুধু বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, কে—মেহলন—

হ্যাঁ মা আমাকে বিয়ে করবে বলেছে—কান্নায় ভাঙা ভাঙা গলায় বলল রুথ, এবার ফসল তোলা শেষ হলেই—

বিদ্যুতচমকের মতো তার মনের ভেতরে একবার সানবাল্লাতের সেই ধূর্ত জটিল মুখখানা উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল। গ্রামপ্রধান যে তার জমি নিয়ে ষড়যন্ত্র

করেছে, সেসব কথা কিছুই বলল না। শুধু মৃদুকণ্ঠে বলল, তোর এই অবস্থা মেহলন জানে—

না—বলিনি—মাথা নীচু করে বলল রুথ।

তারপরে যা হয়। তাই হল। বেথলেহামের সেই পাহাড়ের বাঁশবনে আর দেখা গেল না মেহলনকে। দেখা গেল না গমের ক্ষেতেও। তবুও অধীর আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রুথ। আর নিজেরই কৃতকর্মের অনুশোচনায় বুকের ভিতরে পাক দিয়ে ওঠে কান্না। তার নিজেকে মনে হয় 'সিনার'। 'পাপী ঘৃণ্য ও অশুচি একটা জীব' কিন্তু—

যত কষ্টই হোক। তবুও টলতে টলতে সে কাজ করতে আসে বোয়াজের ক্ষেতে। আসতেই হয়। দুটো পেট চলবে কি করে।

কি হয়েছে তোমার।

মেয়ে মজুররা তাকে চক্রাকারে ঘিরে ধরে। এক প্রগলভা প্রৌঢ়া রুথের ঈষৎ স্ফীত উদরে আলতো করে হাত বুলিয়ে বলল এটা তোকে কে উপহার দিয়েছে—শুনি?

হাসির রোল পড়ে গেল মেয়েদের ভেতরে। সেই সম্মিলিত কণ্ঠের উচ্চকিত হাসির শব্দে যেন আড়ষ্ঠ হয়ে গেল ফাঁকা মাঠের শাঁ—শাঁ বাতাস। লজ্জায় আর অপমানের জ্বালায় দগ্ধ হতে হতে ঝড়ের বেগে ছুটে চলল বাড়ির দিকে—

চলে যাচ্ছো, কাজ করবে না আজ, গমের জমির ভেতর থেকে যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এল বোয়াজ। তার হাতে অন্যান্য দিনের মত-ই নধর পুষ্ট দানায় নুয়ে পড়া এক গুচ্ছ গমের শীষ।

বুড়ো শয়তান! আক্রোশে বলে ওঠে রুথ। একজন তার দেহটাকে খুবলে খেয়েছে। আর একজন সেই উচ্ছিষ্ট দেহটার মাংস খাওয়ার জন্য ছোঁক ছোঁক করছে।

কিন্তু কিছুই বলল না। যাই হোক, দুদিনে দেখেছে! প্রতিদিন নিয়মিত কাজের শেষে মজুরী দিয়েছে। তাই মাথা নীচু করে ক্ষীণ অস্ফুটস্বরে বলল মাপ করবেন—আমি কাজ করতে পারবো না—বলেই দাবদগ্ধ একটা হরিণীর মত ছুটে চলে গেল রুথ।

কিন্তু রুথের অবস্থা দেখে নাওমি আর চুপ করে থাকতে পারল না। যাবো না, যাবো না করেও এবং গিয়ে কোন লাভ নেই জেনেও সে মেহলনের সঙ্গে দেখা করল তাদের ক্ষেতে। চারিদিকে একবার সর্তক চোখে তাকিয়ে বলল, তুমি ওকে বিয়ে করছ না কেন?

আমি কোন বিধর্মী মেয়েকে বিয়ে করতে পারি না, একটু থেমে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল মেহলন, রুথ মাওবের মেয়ে সে আমাদের হীব্রু ভাষায় কথা পর্যন্ত ভালো করে বলতে পারে না। মূর্তিপূজা করে—

শয়তান! বিধর্মী মেয়েটার সর্বনাশ করার সময় মনে ছিল না, তার টুঁটি টিপে ধরে চীৎকার করে এই কথাগুলো বলতে চেয়েছিল নাওমি।

কিন্তু সেসব কিছুই বলল না। শুধু তার ভারী মাংসল মুখখানার দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ করুণ কণ্ঠে বলল, বাবা তুমি কি হতভাগীর অবস্থাটা জানো?

কেন—কি হয়েছে? একটু যেন আতঙ্কিত মনে হল তার কণ্ঠস্বর। নাওমি তার হাতদুটো পরম যত্নে জড়িয়ে ধরে বলল, তার গর্ভে যে তোমার সন্তান—

কী! থ্যাবড়া নাকের দুইপাশে ক্ষুদে চোখদুটো দপ করে জ্বলে উঠল। ক্ষিপ্ত আক্রোশে দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল, তোমার ওই ব্যাটার বৌ-টার স্বভাবচরিত্তির তুমি জানো—একটু থেমে কুটিল করে আবার বলল বুড়ো বোয়াজের সঙ্গে ওই মাগীকে ফষ্টিনষ্টি করতে আমি কতদিন নিজের চোখে দেখেছি—

বাড়িতে ফিরে এসে রুথকে সব বলতেই যেন পাথর হয়ে গেল সে। সেই যে দরজায় খিল দিল নাওমির বহু ডাকাডাকি এবং খাওয়ার জন্য সাধ্যসাধনা সত্ত্বেও আর খুলল না কপাট।

পঞ্চায়েত বসেছে—আপনাকে ডাকছে—সানবাল্লাতের এক ক্রীতদাস ছুটে এসে খবর দিয়ে চলে গেল।

নির্জন উঠানে দাঁড়িয়ে রুথের রুদ্ধ ঘরটার দিকে তাকিয়ে ভাবল, এই অবস্থায় খা'ল বাড়িতে মেয়েটাকে ফেলে রেখে যাবে—ধীর পায়ে এল সেই ঘরের বারান্দায়। দরজায় কান পাততেই শুনতে পেল, রুথের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ—

কাঁদিস না মা—কাঁদিস না, ব্যাকুল হয়ে বলল নাওমি, জীহোভা-কে স্মরণ কর—দেখবি বিপদের মেঘ কেটে যাবে. একটু থেমে আবার বলল, আমি পঞ্চায়েতে যাচ্ছ—আমি না আসা পর্যন্ত কোথাও যাস না কিন্তু—

শকুনের মত ডানা মেলে নেমে আসছে সন্ধ্যার অন্ধকার। নাওমির মাথার ভেতরে যেন আগুনের ঝড় বয়ে চলেছে। আর তার মনের ভেতরে গরম জলের মত টগবগ করে ফুটতে লাগল রাশি রাশি তার চিন্তাগুলো গাঁও বুড়োর সেই শয়তানী চক্রান্তের কথা ফাঁস করে দেবে সবাইকে; ওর পাষণ্ড ছেলেটার কুকীর্তির কথা বলে হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেবে—

বেথলেহামের বাজারের মাঝখানে সেই প্রাচীন ওক গাছের নীচে পাথরে বাঁধানো চাতালে পঞ্চায়েতের নির্দিষ্ট জায়গাতেই মজলিস বসেছে। গাছের ডালে ডালে বাঁধা মশালের ছায়াকাঁপা আলোয় মানুষগুলোর তামাটে মুখের দিকে তাকিয়ে নাওমির মনে হল, তার বিরুদ্ধে একটা সর্বনাশা চক্রান্ত; একটা অদৃশ্য সরীসৃপের মতো তাকে বিষাক্ত দংশনের জন্য নিস্তব্ধ প্রতীক্ষায় বসে আছে।

প্রথমে নাওমি তার বক্তব্য বলুক, সানবাল্লাতের এক সাগরেদ প্রস্তাব করল।

আমার বলার কি-ই বা আছে মৃদুকণ্ঠে নাওমি বলতে শুরু করল, আমার যে জমিটা গ্রামপ্রধান চাষ করছেন এবং দীর্ঘকাল ভোগদখল করছেন সেই জমি আমাকে দেওয়া হোক—

বারো বছরের বেশি ভোগ করলে যে সত্ব জন্মে যায়—

তোমাকে জমি ফিরিয়ে দিয়ে গ্রামপ্রধান কি আঙুল চুষবে?

আমরা দেখেছি জমিটা ছিল পাথরের টুকরো আর কাঁকরে ভরা—সেই মাটিকে যে পরিষ্কার করে সার দিয়ে উর্বরাশক্তি বাড়িয়েছে ওই জমি তার—সানবাল্লাতের সমর্থনে মুখর হয়ে উঠল সভা।

সানবাল্লাতে কিন্তু তখন উদাস চোখে সন্ধ্যার ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। যেন কিছুই জানে না। আর এই অর্বাচীন মূর্খদের সভার কলরবের সঙ্গে যেন কোন যোগ-ই নেই তার। কিন্তু নাওমি যেই বলল, বেশ তাই হোক—আমার জমির সত্ব চাই না—জমিটা গ্রামপ্রধানই নিয়ে নিন আর তাঁর বড় ছেলের সঙ্গে আমার অভাগী মেয়ে রুথের বিয়ে দিয়ে দিন—

কি—কি বললে, এইবার সেই ধ্যানস্থ মূর্তিটা আক্রোশে গর্জন করে উঠল, আমার ছেলে একটা বিধর্মী পৌত্তলিকদের মেয়েকে বিয়ে করতে যাবে কোন দুঃখে?

কিন্তু আপনার ছেলে মেহলন যে আমার মেয়েটার চরম সর্বনাশ করেছে—

এসব কথা চীৎকার করে বলতে চেয়েছিল নাওমি। কিন্তু স্ত্রীলোক হয়ে কোন মেয়ের এই গোপন কলঙ্কের কথা পাঁচজনের সামনে চেঁচিয়ে বলা যায় না—বলা যেতে পারে না। তাই চুপ করে থাকল। আর ভেতরে ভেতরে নিদারুণ যন্ত্রণায় জ্বলে যেতে লাগল।

খুব-ই অন্যায় কথা, আপনি এই অসহায় বিধবার জমিটা ছাড়বেন না—সভার শেষপ্রান্ত থেকে একটি ছায়া দেহ প্রথম প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠল, আর তার দুর্ভাগিনী বিধবা পুত্রবধূর কোনও ব্যবস্থা করতে দিচ্ছেন না—

ভীমরুলের চাকে যেন ঢিল পড়ল।

সানবাল্লাত আর তার সমর্থকরা মারমুখী হয়ে ছুটে গেল সেই দুঃসাহসী প্রৌঢ় বোয়াজের দিকে। জমিজমার আইন-কানুন নিয়ে অনেক তর্ক অনেক কটু কথাব ঝড়ের পর হঠাৎ বোয়াজ বলে বসল, কোন সর্ত্তে আপনি এই বিধবার জমিটা ছাড়তে পারেন?

কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থাকল সানবাল্লাত।

অবস্থাপন্ন এই মানুষটাকে পুরোপুরি নিঃস্ব করার এক নিদারুণ দুরভিসন্ধি মনের ভেতরে ঘনীভূত হয়ে উঠল। বলল, আমি ছেড়ে দিতে পারি যদি তুমি তোমার গমের ক্ষেত এবং আঙুরের বাগান আমাকে লিখে দিয়ে দাও—

বেশ তাই হবে—

শুধু জমিজমা দিলেই হবে না, তোমাব বসতবাটীও দিতে হবে। কারণ— এলিমেলিচের জমি তোমার জমির চেয়ে মাপে অনেক-অনেক বড় আর—

আর কিছু বলতে হবে না। আমার বাড়িও লিখে দেব—

বা! সাধু—সাধু—জীহোভা তোমার মঙ্গল করবেন বোয়াজ, খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সানবাল্লাত। আর নিজের পাদুকা খুলে বোয়াজের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, আমার চপ্পল পরে নিয়ে তোমারটা আমাকে দাও—

বোয়াজ কোন কথা না বলে দ্রুত তার পাদুকা খুলে দিয়ে পায়ে পরল সানবাল্লাতের চপ্পল। বিবদমান দুইপক্ষের ভেতরে আপোষ হল। পাকা হয়ে গেল বিলিব্যবস্থা।*

মজলিসে যেন বাজ পড়েছে। কারো মুখে একটা কথা নেই। প্রত্যেকের চোখে চোখে নিঃশব্দে ঘুরছে শুধু একটি প্রশ্ন, বোয়াজ কোন আকর্ষণে, কিসের মোহে সর্বস্ব ত্যাগ করে পথের ধুলোয় নেমে আসছে। নাওমির চোখের সামনে ভেসে উঠল, সেই এক ভোরের, শিশিরে ভেজা গমের শীষ। বোয়াজের সাদর উপহার হাতে নিয়ে রুথের ক্ষেত থেকে ফিরেআসা সেই হাস্যোচ্ছল সুঠাম মূর্তি। কিন্তু কি বলবে কেমন করে বলবে—তোমার পরম স্নেহের সেই তাজা ফুলের মত সেই সুন্দর পবিত্র মেয়েটি সর্বস্ব খুইয়ে বসে আছে—

মজলিসে তখন বোয়াজকে কেন্দ্র করে চলেছে নানা মুখরোচক আলোচনা। কিন্তু সেই গাঢ় অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে বোয়াজ কে জানে। কোথাও তাকে দেখা গেল না।

---

* Milman Henry. History of the Jews.

ঝড়ের বেগে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল নাওমি।

তার জন্যে—তাদের জন্যে বোয়াজের এই অদ্ভুত আত্মত্যাগের কথা বলতে হবে রুথকে। সে খুশি হবে। বোয়াজ সম্বন্ধে তার ধারণাটা পাল্টে যাবে—কিন্তু—

উঠানে পা দিয়ে ধক করে উঠল তার বুকের ভেতরটা। রুথের ঘরের দরজা হাট করে খোলা। চীৎকার করে ডাকল—রু—থ—দূরে ফাঁকা মাঠে শাঁ-শাঁ—বাতাসের অব্যক্ত যন্ত্রণার গোঙানির মত আর্তনাদের ভেতরে বিলীন হয়ে গেল তার কণ্ঠস্বর। বাড়ির চারিদিকে, আশেপাশের বাড়িতে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও যখন রুথকে পাওয়া গেল না তখন একটা শিশুর মত অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল নাওমি। আসন্ন লজ্জা থেকে পরিত্রাণের জন্য হতভাগী নিশ্চয়ই আত্মঘাতী হয়েছে!

বেথলেহামের চারিদিকে যখন রুথকে খোঁজা হচ্ছে তখন গ্যালিলির রুক্ষ পাথুরে পথ ধরে জিওবোঝা আর কর্মিল পাহাড়ের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ঝড়ের বেগে চলেছিল এক তরুণী। শুকনো মুখ। গালের ঠেলে ওঠা দুটো হাড়ের ওপরে অশ্রুর বিন্দু চিক চিক করছে। দুচোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি! কোথায়—কত দূরে—আর কতদূরে জর্ডন! ওই নদীর জলে সে—

আগুন-আগুন! হু হু বাতাসের সওয়ার হয়ে বেথলেহামের দিক থেকে ভেসে এল দূরাগত ক্ষীণ আর্তকলরব। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রুথ। সেই বুড়ো শয়তান বোয়াজের-ই ক্ষেতের ওপরের আকাশটা আগুনের আভায় লাল হয়ে উঠেছে!

যাক পুড়ে যাক—তার সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাক—! শুধু বোয়াজ কেন, গ্রামের মোড়ল আর তার সুযোগ্য পুত্রের মস্ত বড় বাড়িটাতেও আগুন ধরল না কেন? তাহলে সে শান্তি পেতো। এক অভিশপ্ত প্রেতিনীর মত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মর্মান্তিক আক্ষেপে সেই হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ দিয়ে ঘেরা মানুষের সেই গোটা গ্রামটিরই ধ্বংস কামনা করে আবার চলতে শুরু করল। কিন্তু—

ধপ-ধপ-ধপ-নির্জন জনহীন পথে কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল। কিন্তু নিচ্ছিদ্র কালিঢালা অন্ধকারে কাউকে দেখা গেল না। ভয়ে মেয়েটির বুকের ভেতরে ঢিব ঢিব করতে লাগল। আরও দ্রুত—আরো জোরে হাঁটতে শুরু করল। নুড়ি পাথরে ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে খালি পাদুটো থেকে রক্ত ঝরছে।

বুনো কাঁটাগাছের ঝোপে লেগে ঘাঘরা ছিঁড়ে ফালা হয়ে মরাসাপের মত ঝুলছে! কোনদিকে তার ভ্রুক্ষেপ নেই। নিশি পাওয়া মানুষের মত আচ্ছন্ন হয়ে সে ছুটে চলেছে।

কর্মিল পাহাড় পেরিয়ে যেতেই চাঁদ উঠল। চারিদিকে ফুট ফুট করছে জ্যোৎস্না। যেই জর্ডনের রাস্তার পাশে ঝাপড়া বার্চ গাছটার নীচে জমাট অন্ধকারে এসে দাঁড়ালো অমনি যেন আকাশ থেকে যমদূতের মত নেমে এল সেই রহস্যময় মানুষটি—

কে আপনি—কি চান, তীব্র যন্ত্রণায় যেন ককিয়ে উঠল রুথ, কেন পিছু নিয়েছেন—

আমি—আমি তোমাকে ভালবাসি রুথ—ভাঙ্গা ভাঙ্গা অস্পষ্ট আর কেমন করুণ-করুণ কণ্ঠে বলল বোয়াজ, তোমাদের জমির সঙ্গে তোমার জন্য আমি আমার সর্বস্ব-স্থাবর—অস্থাবর সব সম্পত্তি মোড়লকে লিখে দিয়ে দিয়েছি—শুধু তোমাকে পাবো বলে। ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে দূরে বেথলেহামের আগুনের আভায় রক্তিম আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, ওই দেখ—আক্রোশে ওরা আমার বাড়িটাতেও আগুন ধরিয়ে দিয়েছে যাতে আমি তোমাদের জমিটা আর নিতে না পারি—তোমাকে-ও না পাই—চারিদিকের অন্ধকারে বোয়াজের কথাগুলো কেমন কাতর কান্নার মত শোনালো।

কোন কথা বলল না রুথ।

তার মনের ভেতরে যেন বাতাসে মাথা দোলাতে লাগল নধর পুষ্ট দানায় ভরা এক গুচ্ছ ঘন সবুজ গমের শীষ! ধীর পায়ে বোয়াজের কাছে এল। তার রিক্ত অবসন্ন মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। তার হাতদুটো জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রেখে উত্তাল কান্নায় আকুল হয়ে উঠতে বাসনা জাগল। কিন্তু পারল না।

অশুচি। বিষাক্ত কীটের দংশনে দূষিত আর এই ঘৃণ্য দেহটা নিয়ে সে তাকে স্পর্শ করবে কি করে! শুধু দূরে দাঁড়িয়ে অস্ফুট স্বরে বলল, আমি তো একটা নষ্ট মেয়ে মানুষ।—আমার পেটে মেহলনের—

সেটাই তো সব নয় রুথ—

সব নয়! তুমি—তুমি বলছো কি? যেন মর্মতন্তু ছিঁড়ে চীৎকার করে উঠল রুথ। আর—

চাঁদের আলোয় বোয়াজের সেই এবড়ো খেবড়ো হতকুচ্ছিৎ মুখখানাকেই কেমন এক অপার্থিব সৌন্দর্যে অসামান্য সুন্দর বলে মনে হল।

ডেভিড ও বাথসেবা

দুরন্ত একটা ঝড় ছুটে আসছে।

একটার পর একটা যুদ্ধ জয় করতে করতে আসছে তরুণ এক নৃপতি ডেভিড। ধ্বংস হয়েছে আম্মন। চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে সমৃদ্ধ জনপদ রাব্বাহ, আগুন জ্বলছে হারানে। মৃত্যুর হাহাকার শোনা যাচ্ছে ক্যানানে। দীর্ঘদিন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে জয় করেছে ফিলিস্তাইন। রণনিপুণ এক একটি সেনানায়ককে হত্যা করেছে আর সাধারণ সৈনিকদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসেছে। তার সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেছে স্মরণাতীতকাল থেকে ফিলিস্তীয়-দের বংশপরম্পরায় প্রবহমান রণনৈপুণ্যকে করে দিয়েছে নির্মূল। ভূমধ্যসাগর সন্নিহিত দক্ষিণ-পশ্চিমের এই সমৃদ্ধ দেশটিকে তার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছে। যুদ্ধবাজ ফিলিস্তীয়রা এখন মাথা নীচু করে এসে কর দিয়ে যায়।

মোয়াবের নৃপতি বেথলেহামে তার অসহায় বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে নির্মম ভাবে করেছিল হত্যা। পৈশাচিক প্রতিহিংসায় ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে ভস্মীভূত করে দিয়েছে সমৃদ্ধ জনপদ মোয়াব। দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসীকে হত্যা করেছে পশুর মত আর অবশিষ্টদের বন্দী করে নিয়ে এসে করেছে ক্রীতদাস।

জোবাহ বা সিরিয়ার উচ্চাভিলাষী অধীশ্বর হাডাডেজার তার সন্নিহিত হিটিটিজ রাজ্যটিকে অধিকার করার বাসনা করেছিল। দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ করে পরাস্ত করেছে হাডাডেজারকে। তার স্বপ্নকে দূর দিগন্তের কুয়াশার মতই মিলিয়ে দিয়েছে। সমগ্র সিরিয়া এবং হিটিটিজ এখন তার রাজ্যের সীমানাভুক্ত হয়েছে।

কী দুঃসাহস মরুসাগরের দেশের অধিবাসী এডোমাইটদের। তারা দক্ষিণ দিক থেকে এসে অতর্কিতে আক্রমণ করেছিল জুডিয়া। তার রণকুশলী প্রধান সেনাপতি জোয়াব পর্যদস্ত করে দিয়েছে তাদের বিশাল সেনাবাহিনীকে। মরুসাগরের দক্ষিণে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন করে তাদের অনেকে প্রাণ রক্ষা করেছে। এখন সেই এডোমাইটরাই তার সবচাইতে শান্ত ও নির্বিরোধ প্রজা।

আমালেক এবং প্যালেস্তাইনের আরও বহু ছোট ছোট রাজ্য বিনা বাধায় তার বশ্যতা স্বীকার করেছে।

এসব যে হবে, তা সে জানতো, জানতো তার অনাগত আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা। সে যে জীহোভার আশীর্বাদ ধন্য—জেরুজ্যালেমের প্রাসাদ শীর্ষে দাঁড়িয়ে নিজের অসাধারণ কৃতিত্বের কথা ভাবতে ভাবতে সাবেকদিনের স্মৃতির ভেতরে মগ্ন হয়ে গেল।

সেদিনও ঠিক এখনকার মতই অস্তমান সূর্যের আলোয় রাঙা হয়ে উঠেছিল বেথলেহামের পশ্চিমের আকাশ। ন্যাড়া পাহাড়ের মাথায় মাথায় রক্তচন্দনের মত আলো ঝরে ঝরে পড়েছিল। সে তার পিতার মেষগুলোকে জলার ধারে ঘাস খাওয়াতে খাওয়াতে দুচোখ ভরে দেখছিল প্রকৃতির সেই দিকপ্লাবী শোভা। দূরে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে গুঁড়ি গুঁড়ি তুষারের মত নেমে আসছিল আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার। এমন সময় তীব্র আলোর ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল পূবের আকাশ। আর একটানা সাঁ সাঁ বাতাসের গর্জনকেও ছাপিয়ে তার কানে এল এক মধুস্রাবী কণ্ঠস্বরের বাণী : উত্তরে-দক্ষিণে, পূর্বে-পশ্চিমে যেদিকে তুমি যাবে সেইদিকেই তোমার বিজয় পতাকা শোভা পাবে—জেনে রেখ আমি তোমার ভেতরে বিরাজ করছি—

সদাপ্রভু সেই অনন্ত শক্তিমান জীহোভার-ই আশীর্বাদে কোথায় থেকে যে কি হয়ে গেল! মনে হয়, যেন একটা দীর্ঘ সুখস্বপ্নের মত! বেথলেহামের গরীব এক কৃষক জেসীর ছেলে হয়ে কি না—সে আজ হয়ে গিয়েছে ইস্রায়েলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতি!

আরও আশ্চর্য! কোন কালে তার মনের কোন কোণে ছিল না কোন উচ্চাভিলাষ, ছিল না কোন বড় স্বপ্ন। তবুও—তবুও—জীহোভা তারই মাথায় পরিয়ে দিয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের মুকুট। কিন্তু—

বেথলেহামের সেই নড়বড়ে কুঁড়েঘরের অন্ধকার থেকে জেরুজ্যালেমের এই আলোকোজ্জ্বল বিশাল প্রাসাদের পথ ছিল যেমন দুর্গম তেমনি দুরুহ! সেখানে ছিল অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা ছিল অনেক-অনেক দুঃখ-দুর্যোগের ঘন অন্ধকার। তার মনের ভেতরে সাবেকদিনের বহু দুঃস্মৃতি আর অনেক অস্পষ্ট মুখের মিছিলে ফুটে উঠল হাসি হাসি সরলতা মাখানো চাঁদের মত একটি গোল মুখ। তাকে দেখে মনে হত যেন আদিবাসী আম্মোনীয়দের প্রতিমার লক্ষণ মিলিয়ে পাথর কেটে কুঁদে গড়া হয়েছে এক নিটোল ও উৎফুল্ল মূর্তি আর চাঁদের আলো যেমন পরম আবেশে পৃথিবীকে পরিব্যপ্ত করে থাকে তেমনি ওর গভীর

প্রেম, প্রগাঢ় মায়া-মমতা প্রতিটি মুহূর্তে তাকে আচ্ছন্ন করে রাখতো।

যখন রাজপ্রাসাদের মন্ত্রণাকক্ষে নিভৃতে তাকে নিহত করার ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র ঘনীভূত হয়েছিল আর সেই গভীর রাত্রে রাজবেশের খড়্গ তার মাথার ওপরে অনিবার্য মৃত্যুর মত ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল তখন সেই রমণী—

প্রভু দ্রুত আর অস্থির পদক্ষেপে ছাদে এল তার ব্যক্তিগত রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক বেনাই, আম্মোনীয়রা জানিয়েছে তারা কর দেবে না—

কী! ফুঁসে উঠল ডেভিড। বিশ্রাম সুখ উপভোগের মুহূর্তটিতে অশুভ বার্তা পেয়ে বিরক্ত হল। বলল, আমার কাছে কেন, জোয়াব কোথায়—তাকে জানিয়েছো?

হ্যাঁ প্রভু! করজোড়ে বলল বেনাই, তিনি বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আম্মোনের রাজধানী রাব্বাহ অভিমুখে রণযাত্রা করেছেন—

কোন কথা বলল না ডেভিড।

তার মুখের কঠোরতা মিলিয়ে গিয়ে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল।

আমি তাহলে আসছি প্রভু, শ্বেত পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে ধাপে ধাপে নেমে আসছিল বেনাই—

বেনাই—শোন, হঠাৎ মহারাজের আহ্বান শুনে ছুটে এল।

বেনাই এই মুহূর্তে তোমার কোন বিশ্বস্ত অনুচরকে পাঠাও রাব্বাহতে জোয়াবের কাছে। তাকে বলবে, যুদ্ধ নয়, রাব্বাহ শহরটিকে চারিদিক থেকে শুধু অবরোধ করে অবস্থান করুক—

বেনাই চলে গেল।

রণক্ষেত্রে নির্দেশ পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হল ডেভিড। চোখদুটো ছড়িয়ে দিল পূবের আকাশে। পাহাড়ের অনেক ওপরে এই পুণ্যনগরী জেরুজ্যালেমের নীচেই জর্ডন উপত্যকার চিড়া ধরা মাটি ধাপে ধাপে নেমে মিশে গিয়েছে বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে। মরুপ্রান্তরের পরেই ঝিকমিক করছে জর্ডন নদীর রূপালী আভাস। নদীর পূর্বতীরে বিশাল প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে সারি সারি পাহাড়। এই পর্বত শ্রেণীর ওপারেই ধনেজনে সমৃদ্ধ জনপদ আম্মোনের রাজধানী রাব্বাহ। জেরুজ্যালেম সন্নিহিত অসুর মুণ্ডের মত ঢিবি ছড়ানো জর্ডনের উপত্যকার প্রান্তর যেখানে মরুভূমিতে বিলীন হয়ে গিয়েছে ঠিক সেইখানে চারিদিক আলো করে রাশি রাশি রঙ বেরঙের ফুল ফুটে রয়েছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন দিগন্তবিসারী মরুপ্রান্তর জুড়ে কে যেন নানারঙের

চিত্রবিচিত্র একটা কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে। শীতকালীন বিলম্বিত বৃষ্টির আশীর্বাদ সেই রঙীন ফুলের সমারোহের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল, খুব শীগগীরই-গ্রীষ্ম আসবে আর খর রোদের প্রচণ্ড দাবদাহে দগ্ধ হয়ে যাবে এই সজীব ফুলগুলি। গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে তার পাপড়িগুলি মিশে যাবে ধুলোর সঙ্গে। তখন এই বহুবর্ণ ফুলের রঙ্গীন শোভায় মনোহর ওই উদ্যানের ছবি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে সেখানে শুধু ধু ধু করবে অভিশপ্ত বালির বিস্তার!

এইবার ধীর পদক্ষেপে ডেভিড এল প্রাসাদ শীর্ষের পশ্চিমে। এইদিকেই নীচে বহু নীচে পাহাড়ের ধাপে ধাপে শ্বেতকপোতের মত সুদৃশ্য এক একটি সৌধ আসন্ন সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে ক্রমশ ঝাপসা এবং অবয়বহীন হয়ে আসছে। হঠাৎ একটা বাড়ির ছাদে সঞ্চরমান এক ছায়ামূর্তির দিকে ডেভিডের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। মনে হল কোন পরিচারিকা সুদৃশ্য ও বিশাল টবে স্নানের জল দিয়ে চলে গেল।

কয়েক মুহূর্ত পরেই সেই ম্লান অন্ধকারে যেন ঝলসে উঠল বিদ্যুতের উগ্র সাদা আলোর রেখা! এক যুবতীর দীর্ঘ তনুর আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠল। ডেভিডের মতই সেই রমণীও গোধুলির আলো আঁধারিতে আচ্ছন্ন পবিত্র নগরীর দিকে কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে রইল। কিন্তু তাকেও যে বাজপাখির মত তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করছে ইস্রায়েলের শ্রেষ্ঠ এবং অনন্য সাধারণ পুরুষ, তা সে জানতে পারল না।

এইবার সেই রূপসী তরুণী গর্বিত পদক্ষেপে এগিয়ে এল সেই বিশাল জলাধারের দিকে। ডেভিডের বুকের রক্তে মৃদঙ্গ বাজতে লাগল। এইবার— এইবার ওই যৌবনবতী নিজেকে নিঃসঙ্কোচে অবারিত করবে। তার বিপুল-ব্যাপ্ত এই আকাশের নীচে ম্লানায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে আদিম মানবীর মত তার অনাবৃত যৌবনশ্রীর অনির্বচনীয় রূপের সুধা শুধু সে একা সে আকণ্ঠ পান করবে।

কিন্তু—না। সেরকম কিছুই হল না। ডেভিডের মনের কোণে কোণে কামনার অগ্নিগোলক উগ্র ক্ষুধায় জ্বলে যেতে লাগল।

অভিজাত সেই যুবতী শুধু শান্ত ও সংযত হাতে মৃদু টান দিয়ে খুলে ফেলল সযত্নে রচিত কালো গম্বুজের মত বিশাল কবরী। আর তার অপর্যাপ্ত কালো চুল তরঙ্গায়িত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল পিঠের নীচে। তারপরে বিনম্র শালীনতায় মার্জনা করল তার মুখাবয়ব! প্রায় স্বচ্ছ আর অপ্রতুল পোশাকের আবরণ সরিয়ে অনাবৃত করল তার সুপুষ্ট জঙ্ঘাদেশ! আর পরমযত্নে রঙীন বস্ত্রখণ্ড

দিয়ে প্রক্ষালন করতে শুরু করল তার দেহের অধোভুবন। তার নিটোল দুটো পা, বলিষ্ঠ উরুযুগল ঘনায়মান অন্ধকারে শ্বেতশুভ্র গজদন্ত নির্মিত ভাস্কর্যের মত শোভা পেতে লাগল।

এইবার তীব্র একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল ডেভিডের স্নায়ুতে। বক্ষোদেশের পরিচ্ছদ শিথিল করল সেই রমণী। মুখ ঘুরিয়ে অনাবৃত দুইটি স্কন্ধ মার্জনা করতে লাগল। অস্বস্তীতে জ্বলে উঠল ডেভিড। তার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে শুধু সেই তরুণীর পিঠের বলিষ্ঠ ও সূক্ষ্ম রেখার ছায়াভাস; আর অন্ধকারে অদৃশ্য দুই উত্তুঙ্গ স্তনভাণ্ডের আভাস দিয়ে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত উদ্দাম ঢেউয়ের মত উন্নত বক্ষোদেশ। কিন্তু—

যে মুহূর্তে রাজহংসীর মত দীর্ঘ গ্রীবা, সমুন্নত বক্ষকে বারিসিক্ত করার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো অমনি প্রসারিত দুইটি বাহুর মাঝখানে আন্দোলিত সেই দুরন্ত গ্রহ দুইটির অপরূপ শোভার দিকে তাকিয়ে ডেভিডের চেতনা বিশৃঙ্খল হয়ে গেল।

ঘন কালো চুলে ভরা মাথায় স্বল্প পরিমানে জল ঢেলে স্নান পর্ব সমাপ্ত করল সেই সুযৌবনা। তারপর সন্ধ্যার মৃদুমন্দ বাতাসে তার জলসিক্ত দীর্ঘ তনুটিকে শুষ্ক করার উদ্দেশ্যেই হয়তো ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ প্রাসাদশীর্ষের প্রান্তে গম্বুজের নীচে জমাট অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

একমুহূর্ত বিলম্ব না করে ডেভিড তার বিশ্বস্ত এক পরিচারককে ডাকল। অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই জনশূন্য ছাদের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, ওই বাড়িতে যে সুন্দরী স্ত্রীলোকটি বাস করে তাকে তুমি জানো?

হ্যাঁ প্রভু, তাঁর নাম বাথসেবা। ইলিয়মের কন্যা, আর আপনারই সেনা-নায়ক ওই হিটিট উরিয়ার পত্নী—

ইলিয়ম। উরিয়া। মনের ভেতরে ডুব দিয়ে খুঁটিয়ে খুটিয়ে ভাবতে চেষ্টা করল ডেভিড। ইলিয়ম কী তার সেই বিচক্ষণ সভাসদ জেরুজ্যালেম সন্নিহিত গিলোর বিশিষ্ট প্রবীন জননেতা আহিথোপেলের পুত্র? আর মনের অন্ধকারে উরিয়া সেই দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ মূর্তিটাও যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

মাথায় ব্রোঞ্জ নির্মিত শিরোস্ত্রানের দুইদিকে দুটো শিং (রণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক)। পরিধানে লৌহজালিকার বর্ম, এক হাতে তীক্ষ্ণধার ভল্ল আর এক হাতে কোষমুক্ত তলোয়ার। আর বড় বড় দুটো সরল চোখে, খাড়া নাকে উত্তর দেশীয় সহজাত সেই সততা আর গভীর নিষ্ঠার আভাস। আরও মনে পড়ে

গেল, এই রণকুশলী হিটিটি যুবক তার কাছে এসেছিল সেই দারুণ দুঃসময়ে যখন ইস্রায়েলের ভূতপূর্ব নৃপতি সলের তীব্র আক্রোশ একটা দুঃসহ অভিশাপের মত তাকে বনে জঙ্গলে জন্তুর মত তাড়া করে ফিরছে! সেই সময়ে গিবেহের রাজপ্রাসাদ থেকে চার মাইল দক্ষিণ-পূর্বে সেই দুর্ভেদ্য গর্তের মত অ্যাডাল্লাম পাহাড়ের অন্ধকারে গুহায় আত্মগোপন করে দিন যাপন করছিল।

একদিন এল একদল হিটিটি যুবক। তারা প্রত্যেকে রণনিপুণ যোদ্ধা। শুধু তাই নয়, ইস্রায়েলীদের চিরশত্রু ফিলিস্তীয়দের সঙ্গে তারা দীর্ঘ মেয়াদী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত থেকেছে। এরা এক একজন সহস্র মৃত ফিলিস্তীয়ার হাড়ের ওপরে ঘর্ষণ করে শানিত করে নিয়েছে ওদের অস্ত্র। আবার সেই ফিলিস্তীয়ার ওপরে যখন বর্বর উপজাতি আমেলকাইটরা হিংস্র নেকড়ের মত লাফিয়ে পড়েছে তখন সেই রণনিপুণ হিটিটি সেই যুবকদেরই ভাড়া করে নিয়ে গিয়েছে ফিলিস্তীয়রাই।

শুধু যুদ্ধ নয়। ফিলিস্তীয়দের সঙ্গে দীর্ঘ সান্নিধ্যের জন্য তারা অর্জন করেছে আরও একটি অসামান্য সুফল—শিখেছে লৌহনির্মিত অস্ত্র তৈরির কলাকৌশল। এই হিটিটি তরুণদেরই নেতৃস্থানীয় ছিল—উরিয়া।

উরিয়া বলেছিল আমরা আপনার নেতৃত্ব, আপনার সৈন্যদলভুক্ত হয়ে যুদ্ধ করতে চাই—ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে আবার থেমে থেমে বলেছিল, প্যালেস্তাইনের সমস্ত উপজাতিদের একমাত্র আপনিই একতাবদ্ধ করতে পারেন—

বলাবাহুল্য প্রশস্তি শুনে খুশি হয়েছিল সে আর তার অধীনে থেকে যুদ্ধ করার অনুমতিও দিয়েছিল। ত্রিশজন তরুণ যোদ্ধার এই দলের নামকরণ করেছিল ত্রিংশতিবাহিনী।

সেই উরিয়া! সেই উরিয়ার পত্নী—ওই রমণী! কেন যেন তার বুকের পাঁজর বিদীর্ণ করে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

রাত্রির অন্ধকার নেমে এল পুণ্যনগরীতে।

কিন্তু তখনো ইস্রায়েলের জনগণবন্দিত প্রতাপশালী নৃপতি সেই ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, নির্জন প্রাসাদ শীর্ষে একটা দুরভিসন্ধির মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল।

সে জানে ওই গৃহের অসামান্য সুন্দরী রমণীর স্বামী উরিয়া রাব্বাহের রণক্ষেত্রে। আর তার পিতা ইলিয়ম তার সামরিক বিভাগের বহুদর্শী প্রবীন চিকিৎসক। অতএব তিনিও রাব্বাহতে। তাই—

সেই রূপরম্যা, খরযৌবনবতী রমণী এখন গৃহে একেবারে একা। কিন্তু—

বাথসেবার পিতা এবং স্বামী যে তার রাজকীয় শাসনযন্ত্র তথা সামরিক বিভাগের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত তা হোক—

তন্বী সুন্দরী যে নারী তার মনকে একবার চঞ্চল করেছে, বুকের ভেতরে জ্বালিয়ে দিয়েছে কামনার আগুন তাকে ছলে বলে কৌশলে যেমন করে হোক অঙ্কশায়িনী করেছে। এই সুতীব্র নারীমাংসলোলুপতা তার রক্তের ভেতরে একটা ভয়ঙ্কর উগ্র বিষের মত মিশে রয়েছে।

সে জানে পরস্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সংসর্গ—পাপ—মহাপাপ। কিন্তু কিছুতেই কখনো সংযত করতে পারে নি নিজের ভেতরের সেই হিংস্র দৈত্যটাকে। সেই অক্ষমতার জন্যেই কেমন একটা হীনমন্যতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় তার মন। কতবার, কত সময় সে ভেবেছে সে ঈশ্বরের স্নেহধন্য। রাজসভার প্রধান ঋত্বিক স্যামুয়েল তার মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, বৎস আমি মনশ্চক্ষুতে দেখতে পাচ্ছি ইস্রায়েলের সিংহাসন থেকে অপসারিত হয়ে গিয়েছে অসুস্থ বিকৃত মস্তিষ্ক নৃপতি সল। তারপরে তুমিই হবে হীব্রু বংশীয় অন্যান্য নরপতিদের ভেতরে শ্রেষ্ঠ নৃপতি। পুরোহিত প্রধান থেকে শুরু করে দেশের প্রতিটি মানুষের মনে যে বিপুল মহিমার আসনে প্রতিষ্ঠিত সে কখনো পাপের পঙ্কে নামতে পারে না। —না, আর সে নারীঘটিত কোন ক্লেদপঙ্কিলতার সঙ্গে জড়াবে না। কিন্তু—

পারে নি। যখুনি কোন উদ্ভিন্ন যৌবনা তার অসামান্য রূপের ঐশ্বর্য নিয়ে তাঁর সম্মুখে এসেছে তখুনি কর্পূরের মত উবে গিয়েছে তার সৎ ও সুস্থ সেই সঙ্কল্পটা!

তার মনের অন্ধকারে জলজল করে উঠল একটি বিষণ্ণ আর করুণ মুখ!

অহিনোয়াম!

সলের চতুর্থ মহিষী! মিশরের মেয়ে। তুষারের মত শুভ্র তার গায়ের রঙ। হঠাৎ দেখলে মনে হতো মুঠো মুঠো জ্যোৎস্না দিয়ে যেন গড়া হয়েছে তার সুঠামতনু যে কোন মুহূর্তে আলোয় দূরদিগন্তের অন্ধকারে স্বপ্নের মত মিলিয়ে যেতে পারে।

এই অহিনোয়াম ছিল এক সময় সলের নয়নের মণি। হারেমের আর কোন মহিষীর নিশিযাপনের আমন্ত্রণ কখনো আসতো না। সলের শয়নকক্ষে মাসের পর মাস কখনো জর্ডনের বিজন নদীতীরে তার প্রমোদভবনে কখনো বা গিয়েভা প্রাসাদেরই শীর্ষে দারু নির্মিত সুদৃশ্য ক্ষুদ্র কক্ষে অহিনোয়ামকে নিয়ে ও প্রমত্ত উচ্ছৃঙ্খল রাত্রি যাপন করতো সল। কিন্তু—

যখন থেকে সলের মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা গেল, তখন কেন যেন

অহিনোয়ামকে দেখলেই নিরুদ্ধ আক্রোশে জ্বলে উঠতো। কে জানে, তার বিকারগ্রস্ত মনের কুয়াশার ভেতরে হয়তো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তার প্রতি অহিনোয়ামের গভীর অনুরাগের সম্পর্ক।

এক একদিন সল উদ্দাম হয়ে উঠতো। ক্ষিপ্ত আক্রোশে নিজের মাথার চুল দুহাত দিয়ে টেনে টেনে ছিঁড়তো। কে বলবে কিসের মর্মান্তিক আক্ষেপে চীৎকার করে কাঁদতো। তখুনি অহিনোয়াম সেনানিবাস থেকে তাকে ডেকে নিয়ে আসতো।

ডেভিড, তোমার বীণা বাজাও—বাজনা না শুনলে শান্ত হবে না, অহিনোয়ামের কথাগুলোর ভেতরে কান্নার আভাস ফুটে উঠতো।

সে বীণায় ঝঙ্কার তুলতো। ললিতঅঙ্গুলি বিন্যাসে বীণার তারে যেন এক মধুর প্রশান্তির দূরাগত রাগিনী বিকসিত হয়ে যেত। ধীরে ধীরে কেমন স্তিমিত হয়ে আসতো সলের উদ্দামতা।

প্রহরে প্রহরে রাত্রি গভীর হয়ে আসতো। সেই গভীর নিশীথের নিথর স্তব্ধতায় তার বীণার মৃদু করুণ মীড়ে যেন সুদূর কোন লোকান্তপারের এক অজানা জগতের আহ্বান প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠতো আর ধীরে ধীরে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে যেত মহামান্য নৃপতি। আর ঠিক তখুনি—

কেমন সম্মোহিতের মত ধীর পায়ে এগিয়ে আসতো অহিনোয়াম। তার বুকে মাথা রেখে যেন সুখস্বপ্নের ঘোরে বিড় বিড় করে বলতো, কী সুন্দর তুমি বাজাও ডেভিড—তুমি না থাকলে—তার বাদবাকী কথাগুলো আর বলা হতো না। বলতে পারতো না। অহিনোয়ামের রক্তগোলাপের পাঁপড়ির মত দুটো ঠোঁটের ওপরে লোলুপ উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়তো তার মুখখানা আর মধুর এক অনুভবের সুখে আবিষ্ট হয়ে যেত রাত্রির মধ্যযামের স্তব্ধতা।

না। রমণীর নিবিড় অনুরাগকে ব্যর্থ হতে দেয়নি সে। কোন ভয়, ভবিষ্যতের কোন বিপদের আশঙ্কা কিছুই তাকে নিরস্ত করতে পারে নি।

নিদ্রামগ্ন নৃপতির পালঙ্কের অদূরে সেই ঘরেরই প্রান্তে আর একটি শয্যায় তারই মহীষীর সঙ্গে মত্ত মাতঙ্গের মত সম্ভোগে লিপ্ত হতে এতটুকু দ্বিধা করতো না। সে ভুলে যেত সে অতি দরিদ্র এক কৃষকের ছেলে, ভুলে যেত শুধু বীণা বাজাতে পারে বলেই তাকে ডেকে নিয়ে এসে অনুকম্প করে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল রাজপ্রাসাদে। কিন্তু অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ। তাই সেনাবাহিনীতে তাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল সে অতি—অতি সাধারণ আর নগন্য এক বেতনভুক

সৈনিক! এইসব, দীনতা কখনো তার নারীসম্ভোগসুখে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়াতে পারে নি।

তবে হ্যাঁ, রমণীসঙ্গ বিলাসী অন্যান্য নৃপতিদের মত তাদের সুখসহচরীদের নিশি শেষের বাসি ফুলের মত পরিত্যাগ করেনি। প্রত্যেককে দিয়েছে মর্যাদা। সম্রাজ্ঞীর মহিমায় তাদের প্রত্যেককে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তারা তার হারেমের অপরূপ শোভা হয়ে আজও বিরাজ করছে। অহিনোয়াম—

এখন তার প্রধানা মহিষী—

ভোঁ—ও—ও—রাত্রির প্রথম প্রহর ঘোষণা করে শিঙা বেজে উঠল। ছিন্ন হয়ে গেল ডেভিডের চিন্তাসূত্র। আবার গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন সেই গৃহের শূন্য ছাদের দিকে কয়েকমুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আবার—আবার তার মনের ভেতরে ভেসে উঠল সেই স্নানরতা রূপসীর হস্তীদন্তের মত অসাধারণ শুভ্র সুপুষ্ট জঙ্ঘাযুগল, অন্ধকারে অদৃশ্য সেই উদ্ধত কঠিন দুটো স্তনের আভাসে উন্নত বক্ষোদেশ!

না। যেমন করে হোক—প্রথমে সাদরে আমন্ত্রণ করে, স্বেচ্ছায় না এলে বলপ্রয়োগ করে·· তাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসতে হবে। প্রচণ্ড একটা বিধ্বংসী বারুদের স্তূপের মত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল ডেভিড। অসহ্য আর তীব্র একটা অস্থিরতায় তার হাতদুটো নিসপিস করতে লাগল। মনের যন্ত্রণাতেই যেন চীৎকার করে ডাকল, বেনাই—

প্রভু—সঙ্গে সঙ্গে যেন সিঁড়ির অন্ধকার থেকেই বেরিয়ে এল বেনাই।

শোন, চারজন বিশ্বস্ত নুবিয়া ক্রীতদাসদের দিয়ে একটি লিটার (পালকি) পাঠাও উরিয়ার গৃহে, কয়েক মুহূর্ত কি ভেবে আবার বলল, তুমি নিজে যাও। বাথসেবাকে আমার আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রাসাদে আমার শয়নকক্ষে নিয়ে আসবে—

আকস্মিক এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সাদর আহ্বান পেয়ে শিহরিত হয়ে উঠল বাথসেবা। তীব্র একটা ভয়ে, উত্তেজনায় আর অজানিত এক পুলকানুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল সে। কিন্তু—

তার মত সামান্য এক রমণীকে সমগ্র ইস্রায়েলের অধীশ্বরের এমন কি প্রয়োজন হতে পারে? হঠাৎ তার বুকের ভেতরে সাপের মত ছোবল দিয়ে উঠল একটি অশুভ আশঙ্কা—তার পিতা এবং স্বামী, দুজনেই রাব্বাহের রণক্ষেত্রে। কে জানে, হয়তো তাঁদেরই কেউ আহত হয়েছেন। সে বিচলিত হবে, শোকে ভেঙে পড়বে বলেই হয়তো স্বয়ং তিনি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে,

বুঝিয়ে তবে দুঃসংবাদটা দেবেন বলেই ডেকে পাঠিয়েছেন। তীব্র আশঙ্কায় তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। কিন্তু—

তা যদি না হয়—তাহলে—বসন্তকালের এই নিশিতে যখন ম্যাগনেটে গোলাপের গন্ধ বহন করে ছুটে আসছে দখিনা বাতাস তখন তাঁর সাদর আমন্ত্রণ—না, আর সে ভাবতে পারে না, বিচিত্র এক লজ্জার শিহরণে আড়ষ্ঠ হয়ে যায় তার চেতনা!

যাই হোক, যেতে তাকে হবে। তাঁর আহ্বান তো উপেক্ষা করা যায় না। তাই অজানা একটা আশঙ্কা, উত্তেজনা আর আনন্দ সব মিলিয়ে বিচিত্র অনুভূতি নিয়ে প্রসাধনে মনোনিবেশ করল বাথসেবা।

অপর্যাপ্ত ঘন কালো চুলে অগুরুর নির্যাস মিশ্রিত জলপাই তেল ছড়িয়ে দিয়ে সুরভিত করে তুলল। সেই চুলগুলো টেনে বেঁধে চুড়ো করে রচনা করল বিশাল কালো গম্বুজের মত করবী। তার চারিদিকে পেঁচিয়ে দিল রক্তপ্রবাল খচিত নানাবর্ণের পুঁতির মালা। কিন্তু—

হঠাৎ থেমে গেল সে। কারুকার্য খচিত রৌপ্যপাত্রের জলে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে তার মনে অস্বস্তির কাঁটা বিঁধতে লাগল, এই সাজসজ্জা পছন্দ করবেন তো মহামান্য সেই নৃপতি।

তার চোখের সামনে ভেসে উঠল, সাবেকদিনের একটি দৃশ্য—পুণ্যনগরীর পথে পথে উৎসুক জনতা। প্রত্যেকের চোখে চোখে ঘুরছে একটি প্রশ্ন—কখন—আর কতক্ষণ পরে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করবেন সেই মহাবীর যুবক। যিনি গুলতি দিয়ে পাথর নিক্ষেপ করে নিহত করেছেন ফিলিস্তীয়দের সেই প্রায় নয় ফিট দীর্ঘ, ভীষণাকায় যোদ্ধা গোলিয়েথকে!

ক্ষণকাল পরেই উদ্বেল হয়ে উঠল জনতা। দৃষ্টিগোচর হল, বিশাল এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার পুরোভাগে সেই অসামান্য নির্ভীক তরুণ! একখণ্ড পাথর কেটে কুঁদে যেন গড়া হয়েছে তার দেবদূতের মত সুন্দর ও বলিষ্ঠ মূর্তি।

ডেভিড—ডেভিড—সমবেত দর্শকদের গুঞ্জন শোনা গেল। সম্রাট সলের সেনাবাহিনীর এক সৈনিক—

সেদিন পবিত্র নগরীর আকাশ বাতাস মুখর হয়ে উঠেছিল ডেভিডের প্রশংসায়। তখন তার বয়স কতই বা হবে, পাঁচ কি ছয়।

কিন্তু সুদূর সেই শৈশবের বোধরাজ্যের কুয়াশার ভেতরে তরুণ বীরের যে মূর্তি অপরূপ ইন্দ্রজালের মত খেলা করতো, তাঁরই আরও বহু যুদ্ধে অসাধারণ

সাফল্য এবং চমকপ্রদ রণনৈপুণ্যের কথা স্বামীর মুখে শুনে শুনে দিনে দিনে সেই মূর্তি আরও উজ্জ্বল—আরও প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে!

তার বহু বিনিদ্র রাত্রির স্বপ্ন যিনি, তার চেতনার ভেতরে আকাশের দুরধিগম্য সুদূর নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোর মত—সেই তিনি-ই তাকে একান্ত করে আহ্বান জানিয়েছেন!

ধীর পদক্ষেপে আলোকোজ্জ্বল প্রমোদকক্ষে প্রবেশ করল বাথসেবা। চমকে উঠল ডেভিডের চোখের দৃষ্টি। সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে বহু—বহু দূরের দৃশ্যের মত অস্পষ্ট আর ঝাপসা দেখেছিল যাকে, ম্লান অন্ধকারের আবরণেও যার রূপের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়েছিল, সেই তাকে-ই সুগন্ধী জলপাই তেলের সহস্র প্রদীপের উজ্জ্বল আলোয় দেখে ডেভিডের দুটো অপলক চোখে নেমে এল মুগ্ধ তন্ময়তা। অভিভূত আচ্ছন্নতার ঘোর কাটিয়ে কয়েকমুহূর্ত পরে মৃদুকণ্ঠে বলল, এস সুন্দরী, একা একা আছো। তাই ডেকে পাঠালাম—

কোন কথা বলল না বাথসেবা। শুধু বিনম্র ভঙ্গীতে অভিবাদন জানালো। কিন্তু তার স্বপ্নের সেই মানুষটি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেও তার দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারল না। হিংস্র বাঘের সামনে যেমন মেষশাবক তেমনি তীব্র আতঙ্কে, উত্তেজনায় কম্পিত হতে লাগল সে।

তোমার কি হয়েছে বলো তো, বহুকালের অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত বলল ডেভিড। তার কোমল পেলব হাতটি নিজের হাতে নিয়ে আবার বলল, এস আমার সঙ্গে—

সুদৃশ্য একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে এল ডেভিড। দারুনির্মিত সেই কক্ষের চার কোণে চারটি হেমদণ্ডে খরদ্যুতি প্রদীপ জ্বলছে। সেই আলোয় ঝলমল করছে কোথাও কাঠের দেওয়ালে খোদিত নানাবর্ণের ফুল কোথাও বা নিঃসঙ্গ একটি তালগাছ বা সবুজ কুঞ্জবনের স্নিগ্ধ ছায়াভাস। প্রতিটি নকসার ভেতরে হয় অত্যুজ্জ্বল গজদন্ত, না হয় স্বর্ণের চুমকি ঝিকমিক করছে।

কি দেখছো রূপসী, তার মুগ্ধ দৃষ্টিকে অনুসরণ করে বলল ডেভিড, এই যে নকসাগুলি দেখছো—সব ফিনিসীয় শৈলীর কারুকার্য! ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে আবার বলল, জানো—আমি যখন একটার পর একটা দেশ জয় করছি তখন ফিনিসীয়ার রাজা ভীত হয়ে প্রচুর উপঢৌকন সঙ্গে পাঠিয়েছিল দশটি ক্রীতদাস। তারা ছিল কারুশিল্পী। আমার এই প্রমোদ ভবনের প্রতিটি প্রকোষ্ঠ তাদের তৈরি—

দোর্দণ্ড প্রতাপশালী নৃপতির সহজ সুর ঘনিষ্ঠ কথাবার্তায় আড়ষ্টতা কেটে

গেল বাথসেবার। মৃদু কণ্ঠে বলল, আপনি জীবনে বহু যুদ্ধ করেছেন,—তাই না? গভীর শ্রদ্ধায় অগাধ হয়ে উঠল তার কাজল টানা ডাগর চোখদুটো।

ও, সে আর বলো না, বুক উজাড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডেভিড যেন অনেক—অনেক দূর থেকে বলল, পশ্চিমে ফিলিস্তাইন থেকে, পূর্বে মরুসাগর পেরিয়ে মোয়াব আবার কখনো উত্তরে হিটিটি থেকে দক্ষিণে সিমন ঝড়ের মত ছুটে বেড়িয়েছি আর যুদ্ধ করেছি বাথসেবা, থামল ডেভিড। আবার ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলল, আর ভালো লাগে না—নিজেকে বড় ক্লান্ত মনে হয়—

স্বামীর কাছে শুনেছি, সলও নাকি অনেক কষ্ট দিয়েছিল, সহানুভূতিতে কেমন ভিজে ভিজে মনে হল বাথসেবার কণ্ঠস্বর।

হ্যাঁ, বাথসেবা নির্যাতন করেছিলেন বলেই কিন্তু আমি আজ সারা ইস্রায়েলের রাজা হতে পেরেছি, একটু থেমে আবার ভরাট গলায় বলল, আমি তাঁর কাছে ঋণী বাথসেবা, আবার দূরে দেওয়ালের গায়ে খোদাই করা ভীষণাকায় সিংহীর অবয়ববিশিষ্ট রমণীমূর্তি বা স্ফিংসের দিকে কয়েকমুহূর্ত স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজের ভেতরে ডুব দিয়ে আস্তে আস্তে বলেছিল। রাজা কেন, সামান্য একটা সৈনিক হওয়ার পর্যন্ত আমার মনে বাসনা ছিল না বাথসেবা। বেথলেহামের চারিদিকের পাহাড়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বাবার ভেড়ার পাল চরাতাম আর পাখিদের গান, ঝরণার শব্দ, আর গাছের পাতায় বাতাসের মর্মর ধ্বনির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বীণা বাজাতাম মনের সুখে—

কখনো আবেগে উত্তেজিত আবার কখনো আবেগে উদীপ্ত বা গভীর ব্যথায় ভেঙ্গে পড়ে ডেভিড সেদিন তার জীবনের বিচিত্র যে বৃত্তান্ত বলেছিল, এখানে তা সংক্ষেপে বলা হল—

বেনজামেনাট সম্প্রদায়ের পূর্ববর্তী সম্রাট সল প্রথম প্রথম ডেভিডকে অত্যন্ত স্নেহ করতো। তার গান এবং বীণার বাজনা শুনতে ভালবাসতেন। প্রত্যেকটি রণ-অভিযানে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। যুদ্ধবিদ্যায় তার অসাধারণ নৈপুণ্য দেখে তাকে নিযুক্ত করলেন তাঁর ব্যক্তিগত অস্ত্রবাহক। কিন্তু যেদিন ফিলিস্তাইনের দৈত্যের মত অতিকায় মহাবীর যোদ্ধা গোলিয়েথকে সম্মুখযুদ্ধে নিহত করল আর তার অসামান্য বীরত্বের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল পুরনগরী, সেইদিন থেকেই সল ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন। তাঁর মনের ভেতরে পুঞ্জীভূত হতে লাগল প্রচণ্ড বিদ্বেষ।

ওদিকে জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র জোনাথন তার অভিন্নহৃদয় বন্ধু। রাজকুমারী

মিচেলের চোখে অনুরাগের দৃষ্টি তার নজর এড়ায় না। জোনাথনেরও আন্তরিক বাসনা ছিল ডেভিডের মত বুদ্ধিমান রণকুশলী যুবকের সঙ্গে তাদের পারিবারিক সম্পর্কটি আরও নিবিড় আরও অটুট হয়ে উঠুক। কিন্তু—

হঠাৎ ফিলিস্তাইনরা যুদ্ধ ঘোষণা করল। ডেভিড সহস্র সৈন্যের এক বিপুল বাহিনী নিয়ে মাতলা হাতীর ঝাঁকের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ফিলিস্তাইনের সীমান্ত শহর শেপন্নাহতে। তুমুল সংঘর্ষের পরে অধিকার করল শেপন্নাহ। উত্তরে ন্যাফাটানি থেকে দক্ষিণে সিয়ন পর্যন্ত সমগ্র জুডিয়ার অধিবাসীরা ডেভিডের অসামান্য বীরত্বের প্রশস্তিতে মুখর হয়ে উঠল।

হিংসা আর বিদ্বেষে জ্বলে যেতে লাগলেন সল। এই সময়েই তার মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এইপ্রসঙ্গে বলা দরকার তিনি কিছুদিন আগে মহামান্য প্রধান পুরোহিত স্যামুয়েলের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। আর সল জানতেন ডেভিড স্যামুয়েলের স্নেহধন্য। তাঁর মনে আশঙ্কা হয়েছিল, ডেভিড স্যামুয়েলের সহযোগীতায় তার সিংহাসন অধিকার করবে। ইস্রায়েলের অধিবাসীরাও তাকে সহ্য করতে পারতো না। গভীর হতাশা এবং বিক্ষোভ তাকে উন্মাদ করে তুলেছিল। কিন্তু যখন শান্ত হয়ে থাকতেন, তখন প্রত্যেকের সঙ্গে হেসে কথা বলতেন। তাঁর কথাবার্তায়, রসিকতায় কোন অসংলগ্নতার আভাস পর্যন্ত পাওয়া যেত না।

একদিন সলের মতিগতি লক্ষ্য করে জোনাথন প্রস্তাব করল মিচেলের বিয়ের। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে মিচেল উৎকণ্ঠায় ভেঙ্গে পড়ছিল। জোনাথন ভাবছিল, ডেভিডের নাম শুনেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবে।

কিন্তু আশ্চর্য! চড়া গলার হাসিতে প্রত্যেকের আশঙ্কাকে উড়িয়ে দিয়ে সম্মতি জানালেন সল। কিন্তু মনের ভেতরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল সর্বনাশা এক দুরভিসন্ধি। বলে বসলেন, তাকে কিন্তু বিয়ের যৌতুক হিসেবে দিতে হবে একশো-টি ফিলিস্তীয়ের মাথা।

আর্তনাদ করে উঠেছিল মিচেল। শিউরে উঠেছিল জোনাথন। কিন্তু ডেভিড হেসে বলেছিল মহামান্য নৃপতিকে আমি সেই যৌতুকই দেব—

সল ভেবেছিলেন ফিলিস্তীয়দের সঙ্গে সম্মুখ সংঘর্ষে নিহত হবে ডেভিড। কিন্তু তাঁর কুটিল অভিসন্ধিকে ব্যর্থ করে দিয়ে ডেভিড তাঁর পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল গুনে গুনে ঠিক একশো-টি মাথা। বিয়ে হয়ে গেল।

কয়েকদিন পর। গভীর রাত্রে তার বুকে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলল মিচেল, পিতার নির্দেশে তোমাকে হত্যা করতে আসবে চারজন গুপ্ত-

ঘাতক—বলেই চোখের পলকে তার শয্যায় ভিস্তিদের জল ভরা চামড়ার সেই থলি রেখে চাদর দিয়ে ঢেকে দিল। আর ডেভিডকে বাইরে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু আড়াল থেকে লক্ষ্য করল ডেভিড ঘাতকরা কেউ তীক্ষধার বর্শা, কেউ বা কুঠার নিয়ে মিচেলের ঘরে প্রবেশ করল। কিন্তু বিছানার চাদর তুলেই কর্কশ কণ্ঠে বলল তারা, বলো ডেভিড কোথায়?

কিছুই বলল না মিচেল। তারা সল-কে জানালো ডেভিড পালিয়েছে—
সেই রাত্রেই গিবেহর রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়ল ডেভিড।
সেই শুরু হল।

শুরু হল শ্বাপদসঙ্কুল বনেজঙ্গলে, পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করে অর্দ্ধাহারে অনাহারের সেই অভিশপ্ত জীবন। কখনো নবের ঘন অরণ্যে কখনো জিফার জঙ্গলাকীর্ণ গিরিকন্দরে তার দিন কাটে। কিন্তু যেখানেই যায় সেইখানেই সলের অনুচররা তাকে অনুসরণ করে।

দুর্ভেদ্য দুর্গের মত অ্যাডালাম পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়ে সেখানকার যাযাবর উপজাতিদের ভেতর থেকে সৈন্য সংগ্রহ করল ডেভিড। এইসময়ে উরিয়ার নেতৃত্বে এসে তার সঙ্গে যোগদান করল হিটিট যুবকদের দল। প্রায় ছয়শো অনুচরের এক বাহিনী নিয়ে দস্যু উপদ্রুত গ্রামবাসীদের বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করতো। আর তার বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে তার দলের লোকদের জন্য আহার্য সংগ্রহ করতো। কিন্তু—

ঘটে গেল এক অঘটন। কর্মিলের বিত্তশালী সওদাগর ন্যাবালের দুই শত হৃষ্টপুষ্ট মেষকে লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছিল দস্যুরা। ডেভিডের সৈন্যদল ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের বিতাড়িত করে দিয়েছিল। কিন্তু তারপরেই যখন ডেভিডের প্রতিনিধি তার কাছে রসদ প্রার্থনা করল, তখন তাকে প্রত্যাখান করতে এতটুকু দ্বিধা করল না সেই স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক ন্যাবাল।

আক্রোশে ফুঁসে উঠল ডেভিড। তার সশস্ত্র অনুচরদের নিয়ে অগ্রসর হল ন্যাবালের গৃহের অভিমুখে। ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেবে ন্যাবালের বিশাল অট্টালিকা। নৃশংসভাবে খুন করবে সেই কৃপন বেনিয়াকে। কিন্তু—

পাহাড়ী পথের বাঁকে তার পথরোধ করে দাঁড়ালো এক রমণী। ডেভিডের মনে হয়েছিল আকাশ থেকে যেন নেমে এসেছে এক অপ্সরী। তার মসলিনের গাঢ় সবুজবর্ণ বস্ত্রাভরণ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। গায়ে স্বর্ণখচিত রক্তরঙের কুর্তা। সম্ভ্রান্ত আর ঐশ্বর্যশালী! কোন—

মহাশয়, নতজানু হয়ে বসল সে, আপনি অত্যন্ত তুচ্ছ আর নগণ্য একটা

মানুষকে হত্যা করতে চলেছেন, ক্ষণকাল স্তব্ধ হল সে। আবার বলল, যিনি অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র ইস্রায়েলের অধীশ্বর হবেন, এ কাজ তার শোভা পায় না—তার বিশাল দুটো চোখের কৃষ্ণতারকায় ঘন বর্ষার মেঘের মত টলমল করছে গভীর এক মমতা।

একটি কথা বলল না ডেভিড।

বলতে পারল না। রমণীর ক্রীতদাসরা দুইটি গো শকট ভর্তি করে এনেছে, দুইশ পাঁউরুটি, ছাল ছাড়ানো পাঁচটি মেষ, বিপুল পরিমানে ঝলসানো গম, শদেডেক কিসমিস আর দুইশত সুস্বাদু পিঠে এবং দুইটি চর্ম পেটিকায় সুগন্ধী সিরাজী, তোমরা এই আহার্যসামগ্রী, ডেভিডকে ইঙ্গিত করে সেই তরুণী তার ক্রীতদাসদের হুকুম করল এনাব আস্তানায় পৌঁছে—

আর থাকতে পারল না ডেভিড। অধৈর্য হয়ে বলল, কে আপনি—কেন আমি আপনার দান গ্রহণ করবো?

আমি ন্যাবালের দুর্ভাগিনী স্ত্রী অ্যাবিগেল বলেই, ডেভিডের মনে হয়েছিল, চাপা কান্নাকে গোপন করতেই যেন সে পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

কিসের দুঃখ তার? পরে জেনেছিল, ডেভিড, ন্যাবাল শুধু কৃপণ নয়। মদ্যপ। যৌবনশক্তিতে অক্ষম। অ্যাবিগেল তাই সন্তানহীনা। ন্যাবালের অন্যান্য পত্নীরা অনেকদিন আগেই তাকে পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছে। কিন্তু গভীর মায়ার টানেই অ্যাবিগেল যায় নি।

কিছুদিন পর। মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে ন্যাবাল মারা গেল। এই খবর পেয়ে ডেভিড কর্মিলে গিয়ে অ্যাবিগেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। ডেভিডকে দেখে তীব্র আনন্দের আবেগে অ্যাবিগেলের চোখদুটো জলে ভরে এল। মহাসমারোহে তাকে বিয়ে করে নিয়ে এল ডেভিড।

দিনে দিনে ডেভিডের সৈন্যের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল। কোন কোন বিশ্বস্ত অনুচর বলে আপনি তো অনায়াসেই ইস্রায়েলের সিংহাসন অধিকার করতে পারেন—

না-না, বলছো কি তোমরা, আর্তনাদ করে ওঠে ডেভিড, জানো সল আমার আশ্রয়দাতা-অন্নদাতা গরীব চাষীর ঘর থেকে আমাকে নিয়ে এসেছিলেন একটু থেমে আবার বলে, তাঁকে খুন করে সেই রক্তে হাত রঞ্জিত করে আততায়ী হয়ে আমি কখনো সিংহাসনে বসতে চাই না। সমস্ত দেশের মানুষ যেদিন আমাকে—

পভু একটা অশুভ বার্তা আছে, তার গুপ্তচর বলল, ফিলিস্তীয়রা জেজরিল উপত্যকার কাছে গিলবোয়া পাহাড়ের আড়ালে প্রায় সহস্রাধিক সৈন্য সমাবেশ করছে—

তাই নাকি! ফিলিস্তাইনের সীমান্ত সন্নিহিত বিস্তীর্ণ উপত্যকা জেজরিলের ওপর দিয়েই প্রসারিত হয়ে গিয়েছে একটি প্রশস্ত বাণিজ্যপথ। সুদূর সেই নিকটপ্রাচ্যের বক্কান, মরক্কো আর সুদানের মহার্ঘ পণ্যসম্ভার নিয়ে বিশাল কাফিলা (ক্যারাভান) চলে যায় তুরস্ক, ইরাণ পেরিয়ে সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে। তাই জেজরিল যার অধিকারে থাকবে, সেই দেশ-ই নিয়ন্ত্রণ করবে সেই বাণিজ্যপথ (জেজরিলের মধ্যবর্তী পথ) আর সওদাগরদের কাছ থেকে মূল্যবান পণ্যসামগ্রী কর হিসেবে আদায় করবে। তার মাতৃভূমির অন্তর্গত সেই জেজরিল অধিকার করে নেবে ফিলিস্তাইন। কি জানেন এসব?

ডেভিড তার সেনাবাহিনী নিয়ে ঝড়ের মত ছুটে চলল গিলবোয়ার অভিমুখে। কিন্তু—

পথের মাঝেই শুনল দুঃসংবাদ। ইস্রায়েলের রাজকীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে ফিলিস্তীয়দের তুমুল যুদ্ধে নিহত হয়েছেন সল। বীরের মত প্রাণ দিয়েছে জোনাথন। নিদারুণ শোকে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল ডেভিড। কিন্তু—

তখন মুহূর্ত সময় নেই। ফিলিস্তীয়রা চলে এসেছে জেজরিলে। আর কালবিলম্ব না করে ডেভিড ঝাঁপিয়ে পড়ল রণক্ষেত্রে। ফিলিস্তাইনের সৈন্যরা ডেভিডকে দেখেই প্রাণভয়ে পশ্চাদপসরণ করল।

শত্রু মুক্ত হল জেজরিল।

দিকে দিকে ডেভিডের জয়ধ্বনি উঠল।

প্রধান পুরোহিত স্যামুয়েলের পরিচালনায় হিব্রোণে মহাসমারোহে তার অভিষেক অনুষ্ঠিত হল। ইস্রায়েলের রাজমুকুট পরিয়ে দেওয়া হল তার মাথায়—

এই পর্যন্ত বলে থামল ডেভিড।

বাথসেবা যেন রূপকথার রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনছে। সম্মোহিতের মত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে বলল, মিচেল—অ্যাবিগেল—এঁরা এখন কোথায়?

কেন—আমার হারেমে, একটু হেসে বলল ডেভিড, আমি কাউকেই পরিত্যাগ করি নি, অবজ্ঞা করি নি কাউকে। আমি মেয়েদের ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি বাথসেবা, তীব্র আবেগে তার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল। আবার বলল,

শুধু অ্যাবিগেল কেন—সলের তৃতীয় মহিষী অহিনোয়ামও আমার হৃদয়ের শোভা হয়ে আছে—একটু থামল সে। দূরে নিবিড় অন্ধকারের ভেতরে রাশি রাশি আগুনের ফুলের মত ফুটে থাকা পুণ্যনগরীর আলোগুলির দিকে চোখদুটো ছড়িয়ে দিয়ে যেন অনেক—অনেকদূর থেকে আস্তে আস্তে বলল, জানো বাথসেবা, রাত্রির পর রাত্রি আমি যখন বীণা বাজিয়ে সল-কে শান্ত করতে চেষ্টা করতাম, তখন দেখেছি অপ্রকৃতিস্থ স্বামীর শয্যার অদূরে চুপ করে বসে থাকতো অহিনোয়াম। তার সেই শান্ত নিস্পন্দ বেদনার নদীর মত বিনম্র রূপটি আমাকে মুগ্ধ করেছিল। ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে আবার বলল, অ্যাবিগেলের গভীর মমতায় ভরা চোখদুটো, তার সুডৌল মুখে বুদ্ধির দীপ্তি আমাকে আকর্ষণ করেছিল হঠাৎ থেমে গেল ডেভিড।

আবার খুব জরুরী কথা কিছু মনে পড়ে গিয়েছে, এমন করে বলল, ও হ্যাঁ—আসল কথাই এখনও বলা হয় নি—

শির শির করে উঠল বাথসেবার বুকের ভেতরটা।

তোমাকে উপহার দেব বলেই তো ডেকে পাঠিয়েছি বাথসেবা, বলেই স্বর্ণখচিত মেহগিনি কাঠেরবাক্সের ডালা খুলল ডেভিড, সযত্নে তার গলায় পরিয়ে দিল মুক্তাপ্রবালখচিত সোনার কণ্ঠহার। বলল জানো, এই হারটি তৈরি হয়েছে আফ্রিকার খাঁটি সোনায়—

না—না, এসবের কি প্রয়োজন ছিল, বাথসেবার কথা শেষ হওয়ার আগেই তাম্রনির্মিত একটি কর্ণাভরণ দেখিয়ে বলল, জানো, সারিডিনা আর স্পেনের তামার অলঙ্কার,—দেখছ কি—নাও—নাও পরে ফেল—

বাথসেবা কোন কথা বলতে পারল না। কেন—কেন, রাত্রির এই মধ্যযামে ইস্রায়েলের নৃপতি স্বয়ং তার মত নগণ্য এক রমণীকে পৃথিবীর দেশদেশান্তরের সর্ববিধ মহার্ঘ আভরণে সালঙ্কৃতা করতে চাইছেন, তাহলে কি, সেই নিদারুণ সর্বনাশা আশঙ্কা বিষধর সাপের মত ফণা তুলে ধরে দাঁড়ালো।

দেখি দেখি তোমার দুটো হাত, বাথসেবার দুর্ভাবনাকে উড়িয়ে দিয়ে তীব্র আবেগে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলল ডেভিড, কৈ তোমার হাতের করতল দুটো পাতো—বিলম্ব করছো কেন, এবার রাজাদেশের মত কঠোর শোনালো তার কণ্ঠস্বর।

ভীত চোখে একবার তার দিকে তাকিয়ে বাথসেবা তার রক্ত গোলাপের পাপড়ির মত দুটো করতল উন্মুক্ত করল। ডেভিড তার ডানহাতে বসিয়ে দিল গজদন্ত নির্মিত এক সুঠামতনু নগ্ন রমণীমূর্তি আর বাঁ-হাতে একটি অনতিদীর্ঘ সুগন্ধী কাষ্ঠখণ্ড।

হঠাৎ বিদ্যুতগতিতে বাথসেবার হাত থেকে সেই নগ্নিকার মূর্তিটি তুলে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়েই বাথসেবার সেই অনিন্দ্যসুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠবের দিকে কেমন স্থির, বিচিত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে উদভ্রান্তের মত বলল ডেভিড, বাথসেবা তুমি যদি—যদি সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে উন্মুক্ত ছাদে স্নান করতে না যেতে. উত্তেজনায় ভেঙ্গে পড়তে লাগল ডেভিড। আবার বাথসেবার নিশ্বাসের সীমানায় ঘনীভূত হয়ে ফিস ফিস করে বলল, জানো বাথসেবা, তোমার —তোমার অনির্বচনীয় অঙ্গসৌষ্ঠব যেন কোন নিপুণ ভাস্করের রচিত ঠিক এই মূর্তিটির মত, বলেই কামনান্মোত্ত মাতঙ্গের মত টেনে খুলে ফেলল ঘন সবুজ মসলিনের কুর্তা।

অবারিত করল কাঁচুলীর বন্ধনে আবদ্ধ দুটো দৃঢ়, কঠিন, উদ্ধত স্তনভাণ্ড! আর সেই উত্তুঙ্গ গিরিশিখরের মাঝখানে সংকীর্ণ সমতল উপত্যকায় মুখ চেপে ধরে যেন অসহ্য-তীব্র একটা জ্বালায় দগ্ধ হয়ে অস্ফুট স্বরে বলল ডেভিড, বাথসেবা—আমাকে ক্ষমা করো—কি করবো—আমি যে কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে পারি না কেমন করুণ আর্তনাদের মত শোনালো তার কথাগুলো।

বাথসেবার বুকের ভেতরে মাথা রেখেই দীন একটি প্রার্থীর মত বলল ডেভিড, বাথসেবা—তুমি—তুমি আমাকে অনুগ্রহ করবে?

আপনি এসব কি বলছেন—আমি পরস্ত্রী! আপনার প্রমোদ ভবনের পরিচারক, ক্রীতদাসরা সব জানতে পারবে, তাই নিশ্চয়ই আমার স্বামী, আমার পিতামহ সেই অসম্ভব কট্টরনীতিবাদী আহিথোপেলের কাছেও এই কলঙ্কের কথা গোপন থাকবে না—এই কথাগুলোই তার মনের ভেতরে তোলপাড় করছিল। কিন্তু—ভয়ে, উত্তেজনায়, আর আসন্ন সর্বনাশের আশঙ্কায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আবার তার মনে হল, ইস্রায়েলের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ জনগণবন্দিত প্রতাপশালী নৃপতি তাকে কামনা করছেন মুহূর্তের জন্যও তাঁর বিলাসের সহচরী হওয়া যে-কোন নারীর দুর্লভ সৌভাগ্য। কিন্তু সহস্র বাসনায় কণ্টকিত মনের এই চিন্তাটা বিদ্যুতের রেখার মত মুহূর্তের জন্য ঝলসে উঠেই অবচেতনার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আর চোখের সামনে ভেসে উঠল উরিয়ার হাসি হাসি সরল চোখদুটো!

ডেভিডের চোখে বিরক্তির মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে।

বিস্রস্ত বেশবাস নিয়ে বাথসেবা ভীরু হরিণীর মত নিদারুণ ত্রাসে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় ঘটে গেল একটা কাণ্ড—

প্রমোদ ভবনের সেই সুদৃশ্য কক্ষের কড়িকাঠের গজদন্তের মসৃণ পেলব আবরণ ঈষৎ ফাঁক হয়ে গেল। আর তার ভেতর থেকে বৃষ্টির মত ঝরে পড়ল গোলাপের পাঁপড়ি। তীব্র সুগন্ধে আমোদিত হয়ে গেল ঘরের বাতাস।

তোমার সঙ্গে আমার শুভ মিলনের সঙ্কেত হল, নির্বিকার আর শীতল গলায় বলল ডেভিড, এস শয্যায়—

নিশীথ রাত্রির আকাশ থেকে একটা উল্কা ঝরে পড়ল।

সুদীর্ঘক্ষণব্যাপী আশ্লেষে ক্লান্ত অবসন্ন ডেভিড গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে গেল। আর জীর্ণ ও নিপিষ্ট একটি গন্ধপুষ্পের মত বাথসেবার মনের ভেতরে তীক্ষ্ণধার খড়্গের মত জ্বলজ্বল করতে লাগল উরিয়ার মুখখানা অসহ্য যন্ত্রণায় তার চোখ ফেটে জল এসে পড়ল।

তারপরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত।

ইস্রায়েলের অমিতশক্তিধর নৃপতি ডেভিডের সাদর আমন্ত্রণে সেই যে রাজপ্রাসাদে এসেছিল বাথসেবা, আর ফিরে যায় নি। যেতে পারে নি।

ওদিকে রাব্বাহের রণক্ষেত্র থেকে খবর এসেছিল, আম্মোনীয়রা প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে চলেছে। ডেভিডও ও পাঠিয়ে দিয়েছিল মেষচর্মের বা পার্চমেণ্টে লিখে তার নির্দেশ—অবরোধ অব্যাহত থাকবে। রাব্বাহ নগরের একটি প্রাণীও যেন বাইরে যেতে না পারে। আর লক্ষ্য করবে, বাইরে থেকে কোন গোপন পথে খাদ্যসম্ভার যেন নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পারে—

অতএব মাসের পর মাস চলেছিল অবরোধ। আর উরিয়া এবং বাথসেবার পিতা ইলিয়ম রণক্ষেত্র সন্নিহিত শিবিরে দিনযাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। অতএব তারপরে যা স্বাভাবিক যা অনিবার্য, তাই ঘটেছিল। আর ডেভিড ও দুর্ভাগিনী বাথসেবার ইতিবৃত্তটিও এইখানেই শেষ হতে পারতো। কিন্তু—

তা হয় নি। রূপরম্যা যৌবনধন্যা বাথসেবা সম্রাটের ক্ষণিক বিলাসের সহচরী হয়েই বাইবেলের সহস্র রূপসী রমণীর বর্ণাঢ্য মিছিলে হারিয়ে যায় নি। বরং অভাবনীয় একটা দুর্ঘটনার সূত্রেই ইস্রায়েলের ইতিহাসের পাতায় বিরাজ করছে মহীয়সী সম্রাজ্ঞীর মত। কিন্তু—

কি সেই অকল্পনীয় অঘটন? বাইবেলে আছে, ইস্রায়েলের সেই অসামান্য ব্যক্তিত্ব, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, যিনি বহু দেশ জয় করেছিলেন, বিবদমান বহু উপজাতি, বহু সম্প্রদায়কে একতাবদ্ধ করে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন

একটি অখণ্ড সাম্রাজ্য, সেই ডেভিডের গৌরবোজ্জল জীবন একটি গভীর কলঙ্কের অপচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল তাব আরও একটি—

জঘন্য পাপ—'Heinous Sin !

আর ডেভিডের সেই হীন পাপাচারের অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করেই বাথসেবা কেমন করে অবারিত আলোর রাজ্যে পৌঁছে গিয়েছিল, সে ইতিহাস যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি বিচিত্র।

মধুভাণ্ডের গায়ে যেমন নিবদ্ধ মৌমাছি তেমনি সুদৃশ্য প্রমোদভবনের প্রকোষ্ঠে বাথসেবার কবোষ্ণ সান্নিধ্যে বিভোর হয়ে থাকতো ডেভিড। তার এই মোহাচ্ছন্ন দিনগুলোব ইঙ্গিত করে পুরাতন পদ্ধতির বাইবেল জানিয়েছে—

ডেভিড যখন গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে তখুনি ঘটেছিল তার পদস্খলন। আর যিনি বহু দেশ জয় করেছিলেন, তিনি জয় করতে পারেন নি নিজের কামনা—When David reached zenith of his power, he fell. Having concquered all nations, he failed to concquer himself

স্যামুয়েল লিখিত সুষমাচারে আরও আছে, ডেভিডেব রক্তে বক্তে প্রবহমান ছিল তাদের বংশানুক্রমিক গভীব ধর্মবিশ্বাস ! ডেভিডেব পিতা জেসি বৎসরে অন্তত একবার—সপরিবারে বেথলেহাম থেকে পাহাড় আর মরুভূমি পেরিয়ে যেত সেই জুডিয়ার দক্ষিণে, হীব্রুদের পুণ্যতীর্থ গিলগ্যালে। এইখানেই জর্ডন উপত্যকার ঢালুতে ঘনসন্নিবদ্ধ জলপাইগাছ আর দ্রাক্ষাকুঞ্জের নিবিড় নীলাভ ছায়ার নীচে জীহোভার থান।

সেই সুদূর বাল্যকাল থেকে যে ডেভিড তার পিতার সঙ্গে জীহোভার থানে মাথা ঠেকিয়ে আকুল হয়ে পর্যাপ্ত শস্যের জন্য যেমন, তেমনি জীবনে কখনো নীতি এবং ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট না হওয়ার জন্যও আকুল হয়ে প্রার্থনা করেছে ; যে ডেভিড আদর্শ শাসক, প্রজানুরঞ্জন নৃপতি এবং যিনি স্বয়ং জীহোভার আশীর্বাদ-পুষ্ট—সেই ডেভিড শুধু পরস্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারের পাপকে চাপা দিতে আরও একটি পাপও করেছিল—

Commited double Crime—

বাথসেবাকে নিয়ে উত্তালসুখে বিভোর হয়ে থাকে ডেভিড। লুপ্ত হয়ে গিয়েছে তার বাইরের পৃথিবী। মন্ত্রণাগৃহেও আর যায় না। বিশিষ্ট সভাসদরা দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর চলে যায় বিরক্ত হয়ে। তবুও—

বিশ্বস্ত অনুচব বোনিয়া আসে। ভীত হয়ে বলে, প্রভু, জেজরিলের বাণিজ্যপথে

ডাকাতি হয়েছে। ফিনিসিয়াগামী কাফিলার ওপরে ফিলিস্তীয় রাহজানরা চড়াও হয়ে—

আঃ কেন বিরক্ত করতে আসো, হুঙ্কার দিয়ে ওঠে ডেভিড। রক্তাভচোখে আগুন ঝিকিয়ে ওঠে। বলে, সীমান্তবাহিনীকে খবর দাও—সেনাবিভাগে জানাও—

প্রমোদ ভবনে উচ্ছৃঙ্খল আর প্রমত্ত নিশিযাপন করে ডেভিড। দিনের বেলায় গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। আর সেই নিস্তব্ধ কক্ষে বেদনার শিলাস্তূপের মত বসে থাকে বাথসেবা। আর দূরে-বহুদূরে ধূমাচ্ছন্ন পর্বতশ্রেণী ছাড়িয়ে চোখদুটো ছড়িয়ে দেয় দূরে জর্ডন নদীর পরপারে কালো দিগন্তরেখায় মুখ থুবড়ে পড়ে রাব্বাহ-এর দিকে। দুঃস্বপ্নের ঘোরে যেন বিড়বিড় করে বলে, তোমার যে কতবড় সর্বনাশ হয়ে গেল—

টি—ভি—ই—দূর আকাশ থেকে একটা হুপো পাখির তীক্ষ্ণ কর্কশ চীৎকার যেন তার অবসন্ন চেতনাকে তুরপুনের মত বিদ্ধ করে বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে গেল। এক ঝাঁক হুপোপাখি জুডিয়ার মরুভূমি ছাড়িয়ে মরুসাগরের ওপর দিয়ে চলেছে রাব্বাহের দিকে। এই পাখিদের দিয়েই যদি সেই রণমত্ত, সৎ, নিষ্ঠাবান মানুষটাকে জানাতে পারতো, যে সে তারই প্রভুর উন্মত্ত লালসার শিকার হয়ে রসাতলের গভীর অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে।

এক এক সময় মনে প্রশ্ন জাগে, কি তার ভবিষ্যৎ? রণক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন করলে তাকে গৃহে পাঠিয়ে দেবে, আর প্রমোদভবনের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে এই গোপন প্রণয়লীলার অধ্যায়টি লোকচক্ষুর অগোচরেই থেকে যাবে। ইস্রায়েলের দণ্ডমুণ্ডের মালিক, এইমানুষটি আর যাই হোক—হীব্রুদের সামাজিক আচার বিচার, ন্যায় নীতির নিষ্ঠাবান অনুগামী। অহিনোয়াম, অ্যাবিগেলকে বিয়ে করে হারেমে নিয়ে এসেছিলেন তাদের স্বামীর মৃত্যুর পরে। হীব্রু বা ইহুদীদের সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ না হলে, সেই রমণীকে বিয়ে করতে পারে না। তাই যত বড় শক্তিধরই হন না কেন, যত প্রবল বাসনাই থাক, তাকে সম্রাজ্ঞীর মর্যাদা দিতে সক্ষম হবেন না। কিন্তু—

তার রক্তের ভেতরে যে আসন্ন সর্বনাশের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে, যে দুর্যোগের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে—কি হবে—কি হতে পারে তার পরিণতি। সেইদিন-ই

সেইদিন গভীর রাত্রে যখন বাথসেবার বুকে মাথা রেখে অস্ফুটস্বরে, প্রায় প্রতিদিন যেমন বলে, তেমনি বলল ডেভিড, বাথসেবা রমণীদেহের আস্বাদ

আমার অজানা নয়, কিন্তু—আশ্চর্য তোমার অপূর্ব অঙ্গসৌষ্ঠবে আমি যেন সুদূর এক অপার্থিব সৌন্দর্য দেখতে পাই—

তুমি আমাকে খুব ভালোবাসে—না ?

কেন—তুমি অনুভব করতে পারো না বাথসেবা, একটু থেমে যেন নিজের ভেতরে মগ্ন হয়ে ডেভিড বলল, সময়ের ব্যবধানে তোমার প্রতি সেই দুর্বার কামনা-টা পর্যবসিত হয়ে গিয়েছে গভীর প্রেমে ; সে প্রেম দেহাতীত, সে প্রেম স্বর্গীয়—

সঙ্গীতে বাদ্যযন্ত্রে সুদক্ষ, ভাবপ্রবণ মানুষটির উচ্ছ্বসিত আবেগের ঝরণাকে স্তব্ধ করে দিয়ে বাথসেবা বলল, আমি একটা কথা বলবো ? আপনার পরে ইস্রায়েলের সিংহাসনে—মানে আপনার উত্তরাধিকারী—কে হবে, ঠিক করেছেন ?

কেন, বলো তো ? বিস্ময়ে ছটফট করে ডেভিডের চোখদুটো। থেমে থেমে বলে—অহিনোয়ামের গর্ভজাত অ্যামনন—সেই তো এখন জ্যেষ্ঠ রাজকুমার। আমি তো ঠিক করেছি, অ্যামননই—

কোন কথা বলল না বাথসেবা।

কেমন বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকালো ডেভিডের দিকে। তার বুকের ভেতরে মাথা রেখে অস্ফুটস্বরে বলল, আমি যা চাইবো দেবেন ?

কি বলছো বাথসেবা, আমি তোমাকে আমার সর্বস্ব উজাড় করে দিতে পারি—

তাহলে প্রতিশ্রুতি দাও—আমাদের গভীর ভালবাসার যে সন্তান আসছে সে যদি পুত্র হয় তাহলে সে-ই হবে ইস্রায়েলে—

সে কী—তুমি বলছো কি বাথসেবা, এক ঝটকায় বাথসেবাকে দূরে সরিয়ে দিল ডেভিড। আর প্রচণ্ড যন্ত্রণার দাবদাহে দগ্ধ হয়ে বাথসেবার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দ্রুত কক্ষান্তরে চলে গেল।

ধর্মনিষ্ঠ ডেভিডের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল।

উরিয়া এখানে নেই দীর্ঘদিন। নিঃসন্দেহে বাথসেবার সন্তানের পিতৃত্বের দায়দায়িত্ব তার উপরেই বর্তাবে। কিন্তু বাথসেবা পরস্ত্রী। উরিয়া বর্তমান। কি বলবেন প্রধান পুরোহিত স্যামুয়েল—কি বলবে সমগ্র ইস্রায়েলের অধিবাসীরা।

বজ্রাঘাতে দগ্ধ বনস্পতির মত ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইল ডেভিড। কিন্তু অনেক ঝড়, অনেক দুর্যোগের অন্ধকার পাড়ি দিয়ে এসেছে সে। বিপদের ঘন কালো মেঘকে বিচিত্র কৌশলে অপসারিত করতে তার নৈপুণ্য অসামান্য !

মেষচর্মে লেখা ডেভিডের জরুরী চিঠি নিয়ে বার্তাবাহক বা রানার ছুটল রাব্বাহের রণক্ষেত্রে।

'পত্রপাঠ উরিয়াকে রাজধানীতে পাঠিয়ে দেবে। জেরুজ্যালেমে পৌছেই যেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে'—ডেভিডের এই চিঠি পেয়ে সর্বাধিনায়ক জোয়াব তৎক্ষণাৎ উরিয়াকে পাঠিয়ে দিল।

আরে এস—এস উরিয়া, সরব অভ্যর্থনায় উরিয়াকে বিস্মিত করে বসতে বলল ডেভিড। তার হতভম্ব মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে কয়েকমুহূর্ত আবার তাকিয়ে বলল, ইস্—এ কী চেহারা হয়েছে তোমার—গভীর সহানুভূতির অভিব্যক্তিতে ভারী হয়ে উঠল তার মুখখানা। আর অতি সুদক্ষ অভিনেতার মত দূরে তাকিয়ে ছাড়া ছাড়া গলায় বলল হবে না—হবেই তো, আমি তো জানি, যুদ্ধ—মানে সম্মুখযুদ্ধ, সংঘর্ষের চেয়ে অবরোধ করে চুপচাপ বসে থাকা—অনেক—অনেক বেশি কঠিন—তুমি কি বলো উরিয়া—

আপনি কেন ডেকে পাঠিয়েছেন, তা তো বললেন না, অস্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠল উরিয়ার চোখে।

আরে তুমি না কি, একাই একশত আম্মোনীয়কে নিহত করেছ, খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ডেভিড বলল, আরে সেই অ্যাডাম্নামে-ই তো দেখেছি তোমাকে—তোমার বর্শা নিক্ষেপের যেমন বিচিত্র কৌশল তেমনি অব্যর্থ লক্ষ্য—

এসব কি বলছেন আপনি, বিপুল প্রশংসায় সঙ্কুচিত হয়ে যায় উরিয়া। নিভু নিভু গলায় বলে, শুধু আমি কেন—জোয়াব এবং আর সব সেনাপতিরাও তো কেউ আমার মত, কেউ বা আমার চেয়েও বেশি শত্রু নিধন করেছে—

সংখ্যাটাই বড় নয় উরিয়া, বাধাপ্রাপ্ত হয়ে একটু যেন বিরক্ত হয় ডেভিড ঈষৎ ভারী গলায় বলে, তোমার মত রণকৌশল শিখতে ওদের অনেক দেরী—আর—আরও কিছু বলতে উদ্যত হয়েছিল ডেভিড। কিন্তু তাকে স্তব্ধ হয়ে যেতে হল।

এক নুবিয়া ক্রীতদাস প্রবেশ করল। তার এক হাতে রৌপ্যখচিত বড় রেকাবীতে সুপক্ক মেষ-মাংস, পিষ্টক, উৎকৃষ্ট মধু ও ছাগদুগ্ধ আর এক হাতে চর্মপেটিকায় আম্মোনের সুগন্ধী সিরাজী। মহার্ঘ আহার্যসামগ্রীর উগ্র সুগন্ধে প্রকোষ্ঠের বাতাস আমোদিত হয়ে গেল।

এত সব আহার্যের কি প্রয়োজন ছিল,—

বলছো কি তুমি—এ আর এমন কি, উরিয়ার পিঠ চাপড়ে বলল, নাও—নাও খেয়ে নাও—এতদিন তো খেয়েছো বন্যকুক্কুটের ঝলসানো মাংস আর—

কেন ডেকে পাঠিয়েছেন, বলুন না। অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে উরিয়া। ভেতরে ভেতরে অসহ্য যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে যেতে থাকে।

শোন, আমি ঠিক করেছি, রাব্বাহের যুদ্ধক্ষেত্রে যারা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে তাদের প্রত্যেককে—একের পর একজন করে একমাস ছুটি দেব। তারা গৃহে ফিরে এসে বিশ্রাম করবে আর পরিবারও স্বজনপরিজনের সঙ্গে আমোদস্ফূর্তিতে কাটিয়ে দেহ-মন বেশ চাঙ্গা করে ফিরে যাবে রণক্ষেত্রে, একটু থেমে, উরিয়ার পাথরের মত নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলল,—ছুটির তালিকায় তুমিই প্রথম ব্যক্তি—

বলছেন কি আপনি, বিদ্যুতগতিতে জ্যা মুক্ত ধনুকের মত উঠে দাঁড়ালো উরিয়া, থেমে থেমে বলল, সাধারণ সৈনিকরা খোলা মাঠে শত্রুর সম্মুখে বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ে থাকবে, আর এক একজন সেনাপতি আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে আমোদ করবে—হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল, সেই হিটিটি যুবক। হয়তো মনে পড়ে গিয়েছিল সে কথা বলছে ইস্রায়েলের প্রবলপ্রতাপান্বিত নৃপতি ডেভিডের সঙ্গে।

ডেভিড কোন কথা বলল না।

চোখের কোণা দিয়ে উরিয়ার ভাবলেশহীন গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসল। আস্তে আস্তে বলল, তুমি ঠিকই বলেছো উরিয়া—আচ্ছা—এখন তো গৃহে যাও—বিশ্রাম কর—

উরিয়া কেমন বিহ্বল দৃষ্টিতে ডেভিডের দিকে তাকালো। আরও একটি কথা তার ফাটা ফাটা বেগুনী ঠোটের রেখায় যেন কেঁপে কেঁপে থেমে গেল। মাথা নীচু করে চলে যেতে যেতে আবার ফিরে এসে বলল, আমি কোন বন্ধুর গৃহে রাত্রিযাপন করবো—স্বগৃহে তো যেতে পারবো না—

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডেভিড। ইস্রায়েলের ইতিহাসের সেই মহানায়ককে যেন সেই প্রথম অসহায় মনে হল।

রাজপ্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে ডেভিড চোখ দুটো ছড়িয়ে দিল নীচে—অনেক নীচে অসংখ্য সুদৃশ্য সৌধ পরিকীর্ণ পবিত্র নগরীর দিকে। সন্ধ্যা নেমে আসছে। আসন্ন রাত্রির অন্ধকারে মলিন হয়ে আসছে দিগদিগন্ত। কে জানে কোন দুর্গ্রহের চক্রান্তে এমান এক ছায়াচ্ছন্ন গোধুলির আলোয় প্রথম দেখেছিল বাথসেবাকে। সেই শান্ত কমনীয় জ্যোৎস্নার মত শুভ্র নগ্ন তনুর সৌন্দর্য যেন আজ দারুণ অগ্নিবানের মত তার দিকে ছুটে আসছে কলঙ্ক আর অপযশের অভিশাপ নিয়ে।

ওই কঠোরনীতিবাগীশ হিটিটি যুবক যদি একবার গৃহে যায় আর তৃষ্ণার্ত মানুষ যেমন জলাধারের দিকে ধাবিত হয় তেমনি করে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সে-ও যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে বাথসেবার উত্তাল যৌবনের নদীতে। আর তাহলে যেমন বাথসেবা, তেমনি সে-ও পরিত্রাণ পেয়ে যাবে নিদারুণ কলঙ্কের আসন্ন সেই গ্লানি থেকে। কিন্তু—

একদা যাযাবর উপজাতি হিটিটিরা ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত হয়ে হীব্রুদের সমাজে স্থান পেয়েছে। ওরা অন্ত্যজ। সমাজের একেবারে নীচের তলায় আছে বলেই ধর্ম, ন্যায় নীতি, আচার বিচারকে অহংকারের মত আঁকড়ে ধরে থাকে যে হিটিটিরা, তাদের-ই রক্ত প্রবাহিত হয়ে চলেছে উরিয়ার দেহে। তবুও আর একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে।

পরদিন প্রভাতেই উরিয়া এল।

প্রভু, আমাকে রণক্ষেত্রে যাওয়ার অনুমতি দিন ব্যাকুল হয়ে বলল সে! যে-কোন মুহূর্তে আম্মোনীয়রা তো আমাদের আক্রমণ করতে পারে—

তার কথা যেন শুনতেই পেল না ডেভিড। প্রচণ্ড বিরক্তি মনের ভেতরে চেপে হেসে শান্ত কণ্ঠে বলল, বিগত রজনীতে কোথায় ছিলে?

আমার এক ব্যবসায়ী বন্ধুর গৃহে—

কেন, বলো তো?

বাঃ আপনি জীহোভার আশীর্বাদধন্য শ্রেষ্ঠ হীব্রু সন্তান হয়েও জানেন না যুদ্ধ চলাকালীন স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস নিষিদ্ধ—

উরিয়ার গোঁড়ামীতে ভেতরে ভেতরে উগ্র ক্রোধে জ্বলতে থাকে ডেভিড। তবুও নিজেকে সংযত করে বলে, তুমি তো লৌহনির্মিত অস্ত্র তৈরির কৌশল জানো—তোমাকে যদি রাজধানীতে অস্ত্রনির্মাণশালার পরিদর্শক করে রেখে—

যদি এক বৎসরব্যাপী অবস্থান করি আর তার ভেতরে যদি রাব্বাহের যুদ্ধ শেষ না হয়, তবুও মুহূর্তের জন্যেও স্ত্রী-র সান্নিধ্যে যাবো না প্রভু—যেতে পারবো না, তীব্র অস্বস্তিতে, উত্তেজনায় যেন ভেঙে পড়ে বলল উরিয়া।

হাল ছেড়ে দিল ডেভিড।

কিন্তু কখনো কোন বিপদ, কোন জটিল সমস্যা তাকে হতাশার অন্ধকারে নির্বাসিত করে দিতে পারে নি। তার মনের ভেতরে ভয়ঙ্কর ধূর্ত আর সর্বনাশা এক অভিসন্ধি বিষধর সরীসৃপের মত মাথা তুলে দাঁড়ালো। মৃদু, শীতলকণ্ঠে বলল, তুমি রাব্বাহের রণক্ষেত্রে যেতে পারো—

রাত্রি নামল গভীর হয়ে।

রাব্বাহতে যুদ্ধের প্রসঙ্গে একটি জরুরী নির্দেশ দিয়ে রানার পাঠিয়ে দিল ডেভিড।

কয়েকদিন পর। রণক্ষেত্র থেকে এল এক নিদারুণ দুঃসংবাদ—উরিয়া নিহত হয়েছে।

শোকে ভেঙ্গে পড়ল বাথসেবা। কিন্তু যখন জানতে পারল, রাব্বাহ নগরের প্রধান তোরণদ্বারে প্রচণ্ড সংঘর্ষে বীরের মত মৃত্যুবরণ করেছে উরিয়া তখন সৈনিকের স্বাভাবিক আর অনিবার্য পরিণতি বলেই মনকে সান্ত্বনা দিল।

উরিয়ার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে প্রথমে খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল ডেভিড। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই তার মন কৃতকর্মের অনুশোচনায় জ্বলে যেতে লাগল। নিদারুণ গ্লানির অপচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে তার চেতনা!

দিন কাটে। মাস যায়। জর্ডন নদীর জলের মতই প্রবাহিত হয়ে যায় বাইবেলের এই দুইটি অগ্রগণ্য নায়ক-নায়িকার বিচিত্র জীবনের গতি। সম্মানজনক সময়ের ব্যবধানে ডেভিড বাথসেবা-কে বিয়ে করে নিয়ে এল হারেমে। তার আকুল প্রার্থণাতেই হয়তো তাদের অবৈধ প্রণয়ের স্বাক্ষরটি মৃত হয়েই ভূমিষ্ঠ হল। ডেভিডের বুকের ওপর থেকে যেন একটা ভারী বোঝা নেমে গেল। কিন্তু তার মনের অবচেতনায় তীক্ষ্ণধার ছুরির মত জ্বলজ্বল করে সেই আশঙ্কা—জোয়াব কি আর কোন হিটিটি যোদ্ধা উরিয়ার মৃত্যুর প্রকৃত রহস্যটা ফাঁস করে দেয়। প্রতিমুহূর্তের সেই দুশ্চিন্তাটাকে ঝেড়ে ফেলতেই যেন হঠাৎ খুব তৎপর হয়ে উঠল। রাব্বাহতে পাঠালো নির্দেশ—অবরোধ সরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো নগরের ওপরে⋯

দেখতে দেখতে অতিক্রান্ত হয়ে গেল একটি বৎসর। বাথসেবা আবার সন্তানসম্ভবা হয়ে উঠল। আর তার ফুটফুটে সুন্দর একটি শিশুপুত্রের জন্মের ভেতরে ইস্রায়েলের ভবিষ্যতের নৃপতির জননী হওয়ার স্বপ্নটা সত্যে রূপায়িত হয়ে উঠল। নবজাত পুত্রের প্রশস্ত ললাটের দিকে তাকিয়ে যেন তার আলোকোজ্জ্বল অনাগত ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করছে এমন করে অস্ফুটস্বরে বলল ডেভিড, বাথসেবা, আমার পরে ইস্রায়েলের সিংহাসন আরোহণ করবে তোমার এই পুত্র—আমি ওর নাম রাখলাম—শলোমন! তারা দুইজনে পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা আলোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে এমন সময়—

প্রভু! প্রধান পুরোহিত আর গিলোর জননেতা আহিথোপেল, ডেভিডের বিশ্বস্ত অনুচর বেনিয়া বলল, মন্ত্রণাগৃহে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন!

কী! স্যামুয়েল—বাথসেবার পিতামহ, সেই জীহোভার একনিষ্ঠ ভক্ত-নীতিবাগীশ আহিথোপেল! বিবর্ণ হয়ে 'গেল ডেভিডের মুখ। তাহলে কি দীর্ঘদিন পরে উরিয়ার মৃত্যুর রহস্যটা—

তোমার কি হয়েছে গো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডেভিডের মুখের দিকে তাকিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে বাথসেবা। বলে, তুমি অমন ফ্যাকাশে হয়ে গেলে কেন?

অপরাধীর মত মাথা নীচু করে যেই এল মন্ত্রণাকক্ষে অমনি নিরুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়লেন প্রবীন নেতা আহিথোপেল—আপনাব সঙ্গে আমার দৌহিত্রীর ন্যক্কারজনক অবৈধ প্রণয়ের কানাঘুষো অনেকদিন ধরে শুনছিলাম, একটু থেমে আবার বললেন, আপনি ওকে পরিপূর্ণ করে পাওয়ার লোভে উরিয়াকে খুন কবতে দ্বিধা করলেন না—

ছিঃ ছিঃ তুমি জোয়াবকে নির্দেশ দিয়েছিলে, রাব্বাহয়েব প্রধান তোরণদ্বার উরিয়ার পরিচালনায় আক্রমণ করতে আর তারপরে অন্য সৈনিকদের পশ্চাদপসরণ করতে বলেছিলে যাতে উরিয়া অনিবার্যভাবে নিহত হয়, তীব্র ঘৃণাব ধিক্কার জ্বলতে লাগল বৃদ্ধ পুরোহিত প্রধান স্যামুয়েলের কুঞ্চিত চোখে। আবার থেমে থেমে বললেন, পাপ কখনো গোপন থাকে না ডেভিড। রাব্বাহের পতনের পরেই রণক্ষেত্রের ছিটিটি সৈনিকরা জোয়াবের অদ্ভুত আচরণের জন্য উরিয়ার মৃত্যুর ,কথা বলে। জোয়াবকে আমি জীহোভার থান স্পর্শ করিয়ে সত্যি কথা বলতে বলি। সে তোমার চিঠি—

আর বলবেন না—আর বলবেন না প্রভু, স্যামুয়েলের পায়ের ওপরে আছড়ে পড়ল ডেভিড। কান্নায় ভাঙা ভাঙা, অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল, আমি—আমি খুনী —আমি মহাপাপী—

খট—মন্ত্রণাকক্ষের অলিন্দে একটা সন্দেহজনক শব্দ হল। একটি ছায়াদেহ যেন বিদ্যুতগতিতে অলিন্দের স্তম্ভের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঝড়ে বিধ্বস্ত বিহঙ্গের মত ডেভিড অন্তপুরে এল।

দেখল শয্যায় শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে বাথসেবা। সস্নেহে তার পিঠে আলতোভাবে স্পর্শ করে অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল, আমাকে ক্ষমা ক'রো বাথসেবা—তোমাকে ভালবেসে আমি উন্মাদ—

খবরদার, আমাকে আর স্পর্শ করবেন না, সাপিণীর মত-ফুঁসে উঠল বাথসেবা। তীব্র জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ডেভিডের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ডেভিডের মনে হল, যেন তার চোখ থেকে ঝলকে ঝলকে বিষ ঝরছে।

পরদিন।

হারেমের প্রধান খোজা ইলিয়াস ছুটে এসে বলল ডেভিডকে, ছোট রাণীমাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না—

সে কী! চমকে উঠল ডেভিড। উরিয়ার গৃহে এবং জেরুজ্যালেম শহরের চারিদিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেল না বাথসেবাকে। কেমন উন্মাদের মত হয়ে গেল ডেভিড। তার বিপুল সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিল—এডম, মোয়াব, ফিলিস্তাইন আমার প্রতিটি রাজ্যের সর্বত্র অন্বেষণ করো—যেমন করে হোক—আমি বাথসেবার সন্ধান চাই—

জীহোভার থানে যেয়ে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করল, প্রভু প্রধান পুরোহিতের পাদস্পর্শ করে শপথ করছি জীবনে আর কারো পরস্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হবো না—তুমি অন্তর্যামী। তুমি তো জানো, বাথসেবাকে আমি কী গভীরভাবে ভালোবাসি। তারই মোহে বিকারগ্রস্ত হয়ে উরিয়াকে খুন করিয়েছি—সেই পাপের অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। আমার বাথসেবাকে ফিরিয়ে দাও প্রভু—ইস্রায়েলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নৃপতি অসহায় শিশুর মত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

অন্নজল পরিত্যাগ করে নিরম্বু উপবাসে দিন অতিবাহিত করতে লাগল। কয়েকদিন পর।

সাম্প্রতিকালে অধিকৃত রাব্বাহ থেকে জোয়াবের মেষচর্ম লিপি নিয়ে এল দূত—আপনি অবিলম্বে এখানে আসুন—মহামান্যা সম্রাজ্ঞীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে—

অশ্বারূঢ় হয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটল ডেভিড। রাব্বাহতে পৌঁছে যেতেই জোয়াব তাকে নিয়ে এল মিস্রো পর্বতের পাদদেশে নগরের প্রধান তোরণদ্বারের নিকটবর্তী একটি কূপে। ব্যথাভরা ক্লান্ত কণ্ঠে বলল জোয়াব, ভেতরে তাকিয়ে দেখুন—প্রভু—

ডেভিড কূপের ভেতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই মর্মান্তিক যন্ত্রণায় দুহাতে চোখদুটো ঢেকে আর্তনাদ করে উঠল। কূপের জলে ভাসছে বাথসেবার বিকৃত দেহটা। দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

এইখানেই উরিয়া নিহত হয়েছিল, অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল জোয়াব।

সমস্ত রাব্বাহ যেন ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে আসছে। আর তার অসামান্য রণনৈপুণ্য, দেশে দেশে রাজ্যবিস্তার, তার সব—সব কীর্তি যেন গলে গলে মিলিয়ে যাচ্ছে এক পরম অন্তর্ধানের স্রোতে। সেই দিকপ্লাবী স্রোতে মজ্জমান ডেভিড যেন শেষ দৃষ্টি মেলে দেখছে—তীর সরে গিয়েছে বহু—বহু দূরে। শুধু দূর দিগন্তরেখায় জেগে রয়েছে তার বহু বিনিদ্র রাত্রির স্বপ্ন—সেই অসাধারণ পতিব্রতার সুতনুকা এক মূর্তির রঙীন মরিচীকা!

আহেসুয়েরাশ ও ইস্থার

আসুন—চলে আসুন—যার যা মনের বাসনা পূর্ণ হবে—

দেরী করবেন না, এখুনি এসে পড়ুন, মেলার সহস্র মানুষের অবিরাম গুঞ্জনকেও ছাপিয়ে ইরাণী যাদুকরের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে,—আমার এই টুপিটা একবার মাথায় পরলেই—

কি বলে দেখেছিস, সম্মিলিত কণ্ঠের উচ্ছল হাসির আওয়াজ যেন ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ল মেলার কলরোলে। আর যেন লাল, নীল, হলুদ, বহুবর্ণের এক ঝাঁক তুষারের ফুল যাদুকরকে চক্রাকারে ঘিরে দাঁড়ালো।

তোমার টুপি পড়লেই রাণী ভাস্তির মত রূপসী হতে পারবো?

আমার গায়ের রঙ আরও ফরসা হবে?

ভালো ঘর-বর পাবো?

বর্ণাঢ্য পোশাকে সুসজ্জিতা খরযৌবনা ইহুদী মেয়েদেব ঝাঁক ঝাঁক প্রশ্নের তীর ছুটে এসে যাদুকরকে বিদ্ধ করতে লাগল।

এই যে এদিকে আসুন—বসোরার গোলাপের নির্যাস মেশানো জলপাই তেল, ইণ্ডিয়ার সুগন্ধী চন্দন—অগুরু,—একবার—একবার দেখে যান—প্রসাধন সামগ্রীর দোকানী তারস্বরে চীৎকার করছে—

সুসানের উপকণ্ঠে এক বিশাল পাহাড়ের নীচে মাঠ জুড়ে মেলা বসেছে। পুরীমের মেলা। যেদিকে তাকাও সারি সারি দোকানে শোভা পাচ্ছে নানা-রকমের পণ্যসম্ভার। কোথাও ইস্পাহানের রেশমে পশমে বোনা বিচিত্র কারুকার্য করা গালিচা, কোথাও বা খোরাসানের দুম্বার চামড়া, টায়রের ঝলমলে রক্তবর্ণ মখমলের বস্ত্র, সিডনের লালরুবি। আর তারপরের গলিতেই দুদিকের দোকানে থরে থরে সাজানো রয়েছে মহার্ঘ আহার্য সামগ্রী, মোয়াবের সুমিষ্ট, রসালো আঙুর, আম্মোনের সুপক্ক খেজুর, জুডিয়ার কিসমিস। গ্যালিলির সুমিষ্ট গমের বা আটা দিয়ে তৈরি পিঠে। প্রত্যিটি খাবারের দোকানে ক্রেতাদের ভীড় উপচে পড়ছে।

দোকানীদের হাঁকে-ডাকে, শিশুদের বাঁশীর শব্দে আর মেলার সমবেত

মানুষের উল্লসিত কলরবে মুখর হয়ে উঠেছে 'পুরীমে'র উপলক্ষ্যে—ইহুদীদের পবিত্র ধর্মীয় উৎসব।

পুরীমের মেলা!

বসন্ত সমাগমে আজও প্যালেস্তাইনের তথা ইস্রায়েলের শহরে গ্রামে জনপদে দেখা যায় এই মেলার রঙীন সমারোহ। আজও এই পুণ্যদিনটিতে যখুনি ভোরের আভাসে পুবের আকাশ রঙীন হয়ে ওঠে, তখুনি রঙ-বেরঙের পোশাকে নিজেকে সজ্জিত করে রাজপথে বেরিয়ে আসে ইহুদীরা। চারিদিকের নিস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে মেষশৃঙ্গের শিঙা বেজে ওঠে—ভেঁা—ও—ও—ও—

সেই দূরাগত গম্ভীর শব্দে সমস্ত গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সচকিত হয়ে ওঠে। আর পুরীমের সেই আলোকোজ্জ্বল রঙীন শোভাযাত্রা দেখতে উৎসুক হয়ে তারা কেউ যায় ছাদে কেউ বা দোতলার অলিন্দে কিম্বা রাজপথের ধারে এসে দাঁড়ায়।

ড্রাম বাজছে। বাজছে বিউগিল। সেই বাজনার তালে তালে পা ফেলে আসছে পাঁচ থেকে ষোল বছরের সুন্দর ফুটফুটে কিশোরদের দল। তাদের প্রত্যেকের পরনে গাঢ় রক্তবর্ণ মসলিনের কলিদার পায়চার পাজামা, গায়ে বকের পালকের মত সাদা ধবধবে মখমলের কুর্তা। তারপরেই সেই মধুর ঐকতানের ধ্বনিকে ছাপিয়ে উচ্চকিত কণ্ঠে গান গাইতে গাইতে আসছে মুখোসধারী, নাচিয়ের দল। ভ্রাম্যমান শিল্পীদের কারো মুখে শান্ত সৌম এক ইহুদী সন্ন্যাসীর মুখোস, আবার কারো মুখে ভয়াল এক কুৎসিত দানবের। তাদের সঙ্গে আছে রূপরম্যা এক দীর্ঘতনু রমণী! তার পরিধানে রাণীর মত মহার্ঘ বস্ত্রাবরণ!

এক এক সময় আবার গান থামিয়ে আবার সংলাপ চলছে—

দানব। হা—রে—রে—রে, তোদের প্রত্যেকটি ইহুদীকে টিপে টিপে মারবো—পৃথিবী থেকে নির্বংশ করে দেব তোদের—

[নৃত্যের মুদ্রায় পরিস্ফুট হয়ে উঠল নিষ্ঠুর নরহত্যার অনুপ্রেরণা। বাঁশীর সুরে বীণার ঝঙ্কারে গভীর এক বেদনার মূর্চ্ছনা ছড়িয়ে পড়ল]

সন্ন্যাসী। ওরে মূঢ়—নরখাদক—জেনে রাখিস—হিংসা মহাপাপ—তুই যেমন তেমনি ইহুদীরাও মানুষ—

[সন্ন্যাসীর নৃত্যে এক উদার মহৎ অনুভূতির ব্যঞ্জনা]

রমণী। [দ্রুতপদে তাদের দুইজনের মাঝখানে এসে] এখনও আকাশে সূর্য উঠছে, চন্দ্র উঠছে—যদি অনন্ত শক্তিমান সদাপ্রভু জীহোভা থাকেন—তাহলে তুই তোর পাপে ধ্বংস হয়ে যাবি—

তার কথাগুলোর ভেতরে এক সুদূর অপার্থিব দৈববাণীর আভাস পরিস্ফুট হয়ে উঠল। উতরোল হয়ে উঠল ঐক্যতান। বাঁশীর জলদ সুরে, বীণার দ্রুত ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে যেন বিলাসিত হয়ে গেল সেই শাশ্বত সত্য—শুভ—অশুভ শক্তির দ্বন্দ্বে, শুভ শক্তির জয় অনিবার্য।]

নেচে নেচে কথা বলতে বলতে তারা এগিয়ে যায়। পথের দুই পাশের বাড়ি থেকে পিল পিল করে বেরিয়ে আসে ছেলে, মেয়ে আর বুড়োবুড়ী, আরও স্ফীত হয়ে ওঠে কৌতুহলী জনতার সমাবেশ।

ভ্রাম্যমান শিল্পীরা আরও এগিয়ে যায়। এইবার দেখা যায় ঘনবেগুণী রঙের আলখাল্লা আর সাদা ধবধবে পাজামা পরা গায়কদের দল। মূল গায়েন খঞ্জনী বাজিয়ে গাইছে—

শোন—শোন নগরবাসী,
শোন হামানের কুকীর্তি,
তার সহযোগী শিল্পীরা দোহার ধরছে—
শোন—শোন নগরবাসী!
চক্রান্ত করেছিল সে ইহুদী সংহারে,
রক্ষা পেয়েছিল তারা ঈশ্বরের বরে।
শোন হামানের কুকীর্তি

নৃত্যগীত আর সুমধুর ঐকতানে মুখর সেই বর্ণাঢ্য বিশাল মিছিল এসে থামে ঘন সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন একটি প্রান্তরে। তার শেষপ্রান্তে পাথরে বাঁধানো একটি বেদীর ওপরে দণ্ডায়মান হামানের কুশপুত্তলিকা। তারই পাশে সেই উঁচু মঞ্চে এলেন প্রধান পুরোহিত। তাঁর এক হাতে অনতিদীর্ঘ একটি স্বর্ণদণ্ড, আর এক হাতে থাকে মেষচর্মে লিখিত কোষ্ঠীর মত করে জড়ানো একটি প্রাচীন পুঁথি!

প্রধান ঋত্বিক দুই হাত আন্দোলিত করে সেই বিশাল জনতাকে বসতে ইঙ্গিত করে। সঙ্গে সঙ্গে সেই জনসমাবেশের প্রতিটি নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ প্রার্থনার ভঙ্গীতে নতজানু হয়ে বসে। পুরোহিত সুউচ্চকণ্ঠে পাঠ করতে শুরু করেন—ইস্থারের পুঁথি বা বুক অফ ইস্থার!

কেমন করে সেই নিষ্ঠুর প্রকৃতির হামান পৈশাচিক নৃশংসতায় ইহুদীদের ধ্বংস করার হীন ষড়যন্ত্র করেছিল আর কেমন করেই বা তাদের সেই নিশ্চিত ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছিল এক অসামান্য রূপসী রমণী—সেই বৃত্তান্ত শুনতে তাদের অপলকচোখে মুগ্ধ তন্ময়তা থম থম করে। আর কোন সুদূর

বিস্মৃতকালের সেই মহীয়সী নারীর প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাব অবনত হয়ে আসে তাদের মস্তক।

৪৭৪ খৃষ্ট পূর্বাব্দে, অর্থাৎ প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের ইতিহাসের সেই দুর্ঘটনার সেই ভয়াবহ দুস্মৃতির করুণ অনুরণন ধ্বনিত হয় ইহুদীদের বসন্তকালীন ধর্মীয় লোক উৎসব—পুরীমে।

পুরীম—হীব্রু শব্দ। অর্থাৎ পবিত্র দিবস ('পুর' কথাটির অর্থ হল পবিত্র)। ইহুদী পঞ্জিকার দ্বাদশ মাসের (ইংরাজীব তৃতীয় বা মার্চ মাসে) ত্রয়োদশ দিবসটি ছিল হামান নির্দ্ধারিত সেই গণহত্যার দিন। আর পরের দিন অর্থাৎ চতুর্দশ দিবসে নানা ঘটনা জটিল স্রোত পাড়ি দিয়ে, অনেক বাধার চড়াই উৎরাই ডিঙিয়ে ইহুদীরা পরিত্রাণ পেয়েছিল। এই পরিত্রাণের দিনটিকে তারা পুণ্য ও পবিত্র দিন বলে মনে করে বলেই—

১৮ই মার্চ শুরু হয় হাস্যোচ্ছ্বল এই লোক-উৎসব বা ফোক ফেস্টিভ্যাল—পুরীম। সেদিন শুধু যে সমবেত প্রার্থণার আসরে তারা মেগিল্লেট বা ইস্থারের পাঁচালী শোনে তা নয়, পড়া শেষ হলে মহাসমারোহে তারা নরাধম হামানের কুশপুত্তলিকায় অগ্নিসংযোগ করে। দাউ দাউ করে জলে ওঠে আগুন। আর প্রজ্জলন্ত পুত্তলিকাকে ঘিরে তারা উল্লাসে নৃত্য করতে থাকে। তারপর—

পোস্তদানা দিয়ে তৈরি করা হয় তিন কোণা এক বিশাল 'কেক'। ইহুদীরা চলতি কথায় এই ত্রিকোণ কেককে বলে হামানের কান। ছোট ছোট ছেলেরা এই কানের এক একটা টুকরো ছিঁড়ে মুখে দেয় আব উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু—

কে সেই হামান, কেই বা দেবী প্রতিমার মত অনিন্দ্যসুন্দর সেই যৌবনধন্যা নারী, যে জীবনের মায়া তুচ্ছ করেও তার স্বজাতিকে নিশ্চিত ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছিল, সেসব জানতে হলে যেতে হবে, চলে যেতে হবে, সেই দূর অতীতে—সেই আড়াই হাজার বছব আগে—যেতে হবে বাইবেলের দেশ প্যালেস্তাইন-ইস্রায়েল পেরিয়ে, সেই পশ্চিম ইরাণের প্রাচীন জনপদ—

সুসানে।

হাঁ। এইখানেই একদা ধনে জনে সমৃদ্ধ কোলাহলমুখর এই মহানগরীর মাটিতেই ইতিহাসের সেই নিষ্ঠুর কঠিন আর রক্তঝরা বিপর্যয়ের ভেতরেই মুক্তাবিন্দুব মতই টলমল করছে এক নিবিড় প্রেমেরও বেদনাদীর্ণ ইতিবৃত্ত।

পুরাতন নিয়মের বাইবেলের এই উপাখ্যানটিতে উদ্ভাসিত হয়ে সেই শাশ্বত সত্য—মহৎ প্রেম কখনো মানুষকে মোহগ্রস্ত করে না, করে না ব্যথিত কি

অবসন্ন বা উদাসীন বরং উদগ্র, মহৎ এক অনুভূতিতে আবিষ্ট করে দেয় মনকে আর—উদ্দীপ্ত করে অসামান্য আত্মত্যাগে—

থাক সেসব কথা। এইবার ঘটনাটা বলি—

গাধার পায়ের খুর।

খেজুর ফুল।

গরুর হাড়ের গুঁড়ো।

শোন, এই তিনটি জিনিস মিশিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করবে মিহি করে বুঝলে? তারপর তাতে ঢালবে সুগন্ধী তেল। একটু থেমে আবার সে বলল, দেখবে লাক্ষা সাবের মত তৈরি হয়ে যাবে জিনিসটা। সেটা খুব ভাল করে রগড়ে রগড়ে গায়ে, মুখে, হাতে, পায়ে মাখবে। দেখবে ফরসা ধবধবে হয়ে যাবে তোমাদের গায়ের রঙ।

আর শোন—একটু থামে সে। দূরে আস্তাবলে হাজার হাজার গাধার দিকে চোখদু'টো ছড়িয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বলে, গাধাগুলোর দুধ দোয়ানো হয়ে গেলে সেই দুধ দিয়ে স্নান করে নেবে কিন্তু ওগুলো মাখবার আগে—

সুন্দরীরা চুপ করে থাকে। অস্বস্তির ছায়া ফুটে ওঠে তাদের কাল ডাগর চোখে। গরুর হাড়ের গুঁড়ো মাখতে হবে!

—ভাবছ কি? নাও নাও কাজে লেগে পড়, প্রসাধনবিশেষজ্ঞ এবং হারেমের প্রধান খোজা হেগাই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বলে, সময় নেই বেশি—আর মাত্র তিন—তিন মাস বাকি—দ্রুত পায়ে হেগাই চলে যায়।

যৌবনবতীরা প্রসাধনের জিনিসগুলো ভাগাভাগি করে নিয়ে গুঁড়ো করতে শুরু করে। দুরু দুরু কাঁপে তাদের বুক। কে জানে, কার নসীবে কি আছে! তাদেরই ভেতরে কেউ একজন হয়ে যাবে সম্রাটের প্রধানা অগ্রমহিষী। ময়ূরপঙ্খী পালঙ্কে সোনার চুমকিবসানো জাজিমের ওপরে সে বসবে। সর্বাঙ্গে শোভা পাবে বহুমূল্য অলঙ্কার। মাথায় জ্বলজ্বল করবে সোনার মুকুট! আর—

সেই একজন ছাড়া বাদবাকি সবাইকে চলে যেতে হবে। চলে যেতে হবে সম্রাটের হাজার হাজার উপপত্নীর ভীড়ের ভেতরে। নিতান্ত নগণ্য আর খুব সাধারণ হয়ে হারেমের চার দেওয়ালের ভেতরে শ্বাসরোধী জীবন কাটাতে হবে! তাই—

তারা এক একজন নিজেদের স্বাস্থ্য ও যৌবনের সৌন্দর্যে সুন্দর চেহারাটাকে

আরও সুন্দর—আর রমণীয় করে তোলার চেষ্টা করে। প্রসাধনের কাজে রীতিমত একটা প্রতিযোগিতার আভাস সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তারা প্রত্যেকে সুতনুকা। অসামান্য যৌবনশ্রী। তাদের কারো ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘের মত অপর্যাপ্ত কেশরাশি তরঙ্গায়িত হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে পিঠের নীচে। কারো বা নীবার ধান্যমঞ্জরীর মত ক্ষীণ দীর্ঘ তনুদেহ। আবার কারো বা অটুট স্বাস্থ্যের সমুজ্জ্বল উদ্ধত যৌবনপুষ্ট দেহ। কিন্তু কোন ব্যবধান নেই, পার্থক্য নেই—তাদের মুখশ্রীর সৌন্দর্যে। প্রত্যেকের নাক, চোখ, মুখাবয়বের গঠনে অতুলনীয় রূপের ছটা। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন স্বর্গলোক থেকে নেমে এসেছে অপ্সরীরা।

কেন হবে না? বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিটি প্রদেশের প্রত্যেকটি নগরে, গ্রামে রীতিমত রাজকীয় আদেশ জারী করে সেরা রূপসীদের জড়ো করা হয়েছে। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরেই নানাবর্ণের পুষ্পেব শোভায় নয়নাভিরাম উদ্যানের প্রান্তে শ্বেতমর্মরে নির্মিত হয়েছে এই অনাঘ্রাত পুষ্পকোরকের মত সুকুমারীদের জন্য পৃথক একটি মহলসরা বা হারেম। তার নাম দেওয়া হয়েছে আসমানী মঞ্জিল!

সুন্দরীদের জানানো হয়েছে, তিনমাস ব্যাপী নিয়মিত দেহগাত্র মার্জনা করে বিবিধ প্রসাধন সামগ্রী প্রয়োগ করে নিজেকে আরও রূপবতী—আরও আকর্ষনীয় করে তুলবে। তারপর—

তারপর প্রতি রজনীতে সাতজন করে যাবে বাদশাহেব কাছে। যেদিন আসমানী মঞ্জিলের পরীদের প্রত্যেককে দেখা শেষ হবে সেইদিন—

পারস্যের মহামান্য সম্রাট আহেসুয়েরাশ ঘোষণা করবে শ্রেষ্ঠ সুন্দরীব নাম! আর তিনি তাকেই করবেন তাঁর প্রধান সম্রাজ্ঞী! অতএব—

রূপসীদের ভেতরে শুরু হয়ে যায় তীব্র প্রতিযোগীতা। রূপচর্চাব বিচিত্র সেই প্রতিযোগীতা। তাদের শিরায় শিরায় রক্ত প্রবাহ চঞ্চল হয়ে ওঠে। স্নায়ুতে স্নায়ুতে ছড়িয়ে পড়ে তীব্র উত্তেজনা। স্বপ্ন নেমে আসে চোখে—সম্রাজ্ঞী হবে—সোনার তাজ পরবে। বাদশাহের পাশে রত্নখচিত তখতে বসবে! কিন্তু—

তাদের ভেতরে একজন। আশ্চর্য তার রূপ। দীর্ঘাঙ্গী। পরীর মত অঙ্গসৌষ্ঠব। গায়ের রঙ স্বর্ণের অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিকেও ম্লান করে দেয়। ঘন-কালো ভ্রুর নীচে উজ্জ্বল নীলাভ দুটো বড় বড় চোখ। আর অপর্যাপ্ত সোনালী চুল রূপকথার পরমাসুন্দরী রাণীদের কথা মনে করিয়ে দেয়।

আরও আশ্চর্য! ঝকমকে দুটো নীল চোখে, ঈষৎ বক্র খড়্গের মত নাকে যেন প্রখর বুদ্ধি আর ব্যক্তিত্বের কিছুটা আভাসই তাকে আর সব সুন্দরীদের থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছে।

শুধু অনির্বচনীয় সৌন্দর্যেই নয়, বিচিত্র স্বভাবও তাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। কেন, কে জানে, সেই দুটো বড় বড় নীল চোখে বিষাদের ছায়া থমথম করে! সঙ্গিনীর সঙ্গে অপ্রয়োজনে একটা কথা বলে না। তারা যখন উচ্ছল হাসিতে গল্পে অনাগত আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের আলোচনায় মুখর হয়ে ওঠে তখন সে আসমানী মঞ্জিলের ছাদে ঘণ অন্ধকারে এক অভিশপ্ত প্রেতিনীর মত পায়চারী করে। আর কেন যেন নিশিরাতের জমাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন সেই উদ্যানের জোনাকির ঝিকিমিকি আলোয় ভরা গাছগাছালির ভেতর দিয়ে দূরে রাজপথের দিকে চোখদুটো ছড়িয়ে একটা পাথুরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে।

আসমানী মঞ্জিলের প্রতিটি প্রকোষ্ঠে আছে সুবৃহৎ মুকুর। সুযৌবনা কুমারীরা সেখানে তাদের দেহবল্লরী আর প্রসাধনে উজ্জ্বল মুখাবয়ব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। দেখে মনযোগ দিয়ে আরও কতটা রূপসী হয়ে উঠেছে, কতটা পরিমানে লাবণ্য আর কমনীয়তা ফুটে উঠেছে মুখে। কিন্তু—

সেই বিচিত্র স্বভাবের মেয়েটি-কে কখনো এক মুহূর্তের জন্য আয়নার সামনে দাঁড়াতে দেখেনি তার সঙ্গিনীরা।

আরে ওকে তো বাদশাহের পছন্দ হবে-ই, তাই গর্বে ওর মাটিতে পা পড়ে না—

সত্যি-ই যা সুন্দরী! ওর পাশে পর্যন্ত দাঁড়াতে লজ্জা করে—

কিন্তু—সব সময় ভার ভার হয়ে থাকে কেন রে? নিশ্চয়ই কোন ব্যাপার আছে—

আসমানী মঞ্জিলের সুন্দরীদের ভেতরে গুঞ্জন ওঠে।

তোমার কি হয়েছে বলো তো? মহলসরার প্রধান খোজা হেগাই তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, এমন রূপ তোমার—কিন্তু—সদাসর্বদা কেন বিষন্ন হয়ে থাকো?

কোন কথা বলে না ইস্থার। ভেতরে ভেতরে কিসের যেন তীব্র যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে যায়। আর কেমন ম্লান দুটো চোখের ব্যথাতুর দৃষ্টি ছড়িয়ে সবুজ বাগিচার বাইরে রাজপথের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তুমি কি—তুমি কি চাও না ইস্থার, বাদশাহ তোমাকে পছন্দ করেন? বিস্ময়ে হেগাইয়ের চোখদুটো ছটফট করে। আস্তে আস্তে থেমে থেমে আর ইস্থারের শয়নকক্ষের চারিদিকে থরে থরে সাজানো জুডিয়া আর দামাস্কাসের বিশুদ্ধ জলপাই তেলের রঙীন চিত্র-বিচিত্র মৃৎপাত্র, ভারতের সুগন্ধী চন্দনকাষ্ঠ, বসোরার অগুরু বিবিধ প্রসাধন সামগ্রীর দিকে ইঙ্গিত করে বলে, শুনেছি, তুমি—নিয়মিত গর্দভ-দুগ্ধে স্নান করো না। তুমি জলপাই তৈল দিয়ে গাত্র—

আচ্ছা—বলতে পারেন, বাদশাহের হঠাৎ এই খেয়াল হল কেন? ক্ষণকাল থেমে অস্ফুটস্বরে বলল, শুনেছি প্রধানা বেগম—ভাস্তি ডাকসাইটে সুন্দরী—

সে কী তুমি জানো না? প্রধান খোজা যেন আকাশ থেকে পড়ে। আর তার প্রভুর বিচিত্র কৃতিত্বে খুব গর্ব করে যে বৃত্তান্ত বলেছিল—তা আছে পুরাতন নিয়মের বাইবেলে—

পারস্যের সুলতান আহেসুয়েরাশ। পূর্বে সোমালিল্যাণ্ড থেকে পশ্চিমে মেসোপটেমিয়া পেরিয়ে চীন সীমান্ত উত্তরে খোয়ারিজম* থেকে ভারত ভূখণ্ড পর্যন্ত বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট হলে কি হয়—অসাধারণ উচ্ছৃঙ্খল।

মদ্যপ নিশিদিন মোয়াবের উত্তেজক সিরাজীর নেশায় বিভোর হয়ে থাকে। তার নেশারক্ত দুটো চোখ শুধু অন্বেষণ করে বেড়ায় যৌবনান্বিতা নারীর দীর্ঘতনু রক্তপ্রবালের মত দুটো বিম্বাধর। তার বাদশাহী খেয়ালে প্রতিটি মহলসরায় ছিল দেশদেশান্তরের শত শত রূপসী বেগম। প্রতিটি রজনীতে তাদের এক একজনের সঙ্গে নিত্যিনতুন অভিনব পদ্ধতিতে উন্মত্ত কাম-লালসা চরিতার্থ করেও তার পরিতৃপ্তি হতো না। আরও সুন্দরী আরও উদগ্র যৌবনা রূপসীর খোঁজে অনুচর পাঠাতো।

তেজস্বী বলশালী অশ্ব কি দুগ্ধবতী স্বাস্থ্যপুষ্ট গাভী থাকলে মালিক যেমন তেমনি আহেসুয়েরাশও রূপবতী খরযৌবনা বেগমদের জন্য আত্মপ্রসাদ অনুভব করতো। মাঝে মাঝেই তার প্রতিটি প্রদেশের সুবেদার, ভিজির এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে বর্ণাঢ্য ভোজসভার আয়োজন করতো আর সেই রাজকীয় সমাবেশে সুন্দরী শ্রেষ্ঠ মহিষীকে উপস্থিত করিয়ে আস্ফালন করে বলতো, কেমন দেখছেন—হালফিল তুরস্ক থেকে আমদানী করেছি—তার কথাগুলো শুনে মনে হতো যেন তুরস্কের কোন নগরের ব্যবসাকেন্দ্র

*আধুনিককালের উজবেকিস্থান

কেন্দ্র থেকে লোভনীয় আর মহার্ঘ কোন পণ্য সওদা করে এনে বন্ধুদের কাছে যাচাই করছে—

কিন্তু একদিন—

একদিন ঘটে গেল অঘটন। সম্রাটের প্রধান বেগম, বাগদাদের এক উজীরের কন্যা, ভাস্তি বেঁকে বসল। যেমন ছিল তার অসামান্য রূপ, তেমনি ছিল তেজ।· যাও—বলো—যাবো না, আমি যেতে পারবো না সুলতানের খাস খানসামাকে বলল ভাস্তি, আমি চিড়িয়া নই—

সম্রাটের মাথায় আগুন জলে উঠল। সভাসদদের সঙ্গে পরামর্শ করে হুকুম দিলেন—অবিলম্বে ভাস্তিকে অগ্রমহিষীর প্রাসাদ পরিত্যাগ করে চলে যেতে হবে—বাস করতে হবে তাকে তার উপপত্নীদের সঙ্গে—এই পর্যন্ত বলে থেমে গিয়েছিল প্রধান খোজা।

তুমি—তুমি পরম আবেগে ইস্থারের হাতটা ধরে বলল হেগাই, তুমি—তুমিও কিন্তু—সম্রাটের কথা অমান্য করছো—

কেমন করে? হাতটা ছাড়িয়ে দূরে সরে দাঁড়ালো ইস্থার। আর কেমন নিরুত্তাপ, ব্যথিত কণ্ঠে বলল, তাহলে এলাম কেন?

আরে এলে কি হবে গরুর অস্থিচূর্ণ মাখছো না—নিয়মিত জলপাই তেল দিয়ে—বলতে বলতেই ইস্থারের মসলিনের নীলাভ স্বচ্ছ মিহি বস্ত্রের কুর্তার আড়ালে সুডৌল বুকের দিকে একবার লোলুপদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, অবশ্য তোমার যা রূপ আর সম্রাট রমণীর সৌন্দর্যের যে-রকম পাকা জহুরী, তাতে মনে হয়, তুমি তার নজরে পড়বেই—

কোন কথা বলল না ইস্থার।

ব্যথার ছায়া ফুটে উঠল তার মুখে।

তার সেই বেদনার্ত দুটো নীলাভ চোখের দিকে তাকিয়ে হেগাই বলল, তুমি কি চাও না—ইস্থার—বাদশাহ তোমাকে পছন্দ করেন?

কেন চাইবো না—তাহলে এলাম কেন, দুঃস্বপ্নের ঘোরে বিড়বিড় করে বলল ইস্থার।

তাহলে—তাহলে তুমি সৌন্দর্যের বা শ্রেষ্ঠসুন্দরীদের প্রতিযোগীতার জন্য কেন—কেন নিজেকে প্রস্তুত করছো না, নারীরূপ বিশেষজ্ঞ হেগাই যেন অগ্নিদগ্ধ একটা সরীসৃপের মত ছটফট করে ওঠে। অদূরে ইরাকী আর্মেনিয় সুন্দরীদের প্রকোষ্ঠের দিকে তাকিয়ে বলে, খাবসুরৎ চেহারার মেয়ে তো কম আসে নি ইস্থার, স্তব্ধ হয়ে যায় হেগাই। আর কেন যেন অপলক দুটো চোখের স্থির

দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সেই দেবীপ্রতিমার মত অনিন্দ্যসুন্দর সেই রমণীর নিখুঁত অঙ্গসৌষ্ঠব। তার প্রভুর মত ভোগী পুরুষদের ভোগবাসনাস্থল উদ্ধত আর সুপুষ্ট কুচযুগলে যেন সাদর আমন্ত্রণের ইসারা! ইস্—এই অপ্রকৃতিস্থ মেয়েটা যদি ওই বিবর্ণ আর কর্কশ বস্ত্রের তৈরি সাবেককালের আংগিয়া ব্যবহার না করে, মিহি, প্রায়স্বচ্ছ আর রক্তবর্ণ মসলিনের বক্ষোবাসে তার দুরন্ত গ্রহদুটোকে আবদ্ধ করতো! আর সাদামাটা দেহাতী ওই ঘাঘরা না পরে যদি ওর কঠিন শিলাখণ্ডের মত বিশাল নিতম্বপ্রদেশ আবৃত করতো ফিনীসিয়ার পীতবর্ণ কোমল রেশমের বস্ত্রাভরণে (যা তাদের প্রত্যেককে এনে দেওয়া হয়েছে) —তাহলে—তাহলে তার আড়ালে ওর ওই রম্ভাকাণ্ডের মত নিটোল শীতল উরুযুগলের ছায়াময় লোভানিতে কামীপুরুষরা আচ্ছন্ন আর বিবশ হয়ে যেত!

বেশভূষার দিকে লক্ষ্য-ই নেই পাগল মেয়েটার! অমন সুডৌল মুখখানা—সেই মুখে একটু যদি লোধ্র ফুলের রেণু অগুরু মিশ্রিত করে নিয়মিত মাখতো! হতে পারে, তোমার গায়ের রঙ অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণের মত, কিন্তু একটু, দিনে অন্তত একবার—একবার মেহেদী মেখে গাত্রবর্ণ আরও উজ্জ্বল—আরো রমণীয় করে তুলতে ক্ষতি কি?

আমি কি ওই বাগানটার ধারে গিয়ে দাঁড়াতে পারি?

কেন? গেঁয়ো মেয়েটার অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে বিস্মিত হেগাই বলে, বাগানের পাশে তো এই নগরের প্রধান রাজপথ—সেখানে তুমি যেয়ে কি করবে শুনি?

মাথা নীচু করল ইস্থার। মুখে দারুণ অস্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠল। আর বুকের ভেতর থেকে একটা ব্যথা পাক দিয়ে উঠতে লাগল গলার কাছে চোখ ফেটে জল এসে পড়ে।

এই আমাকে একটু সুগন্ধি চন্দন দে না ভাই।

আর কত মাখবি, গায়ের ছাল যে উঠে যাবে!

তোর কি, তোকে তো ভাই রাজার পছন্দ হবেই—সুন্দরীরা কলকল করে। তাদের টুকরো টুকরো কথা আর হাসির শব্দ হারেমের বাতাসে ভাসে। তাদের সেই উদ্দাম কলগুঞ্জনের মাঝখানে বিষাদের প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে থাকে ইস্থার।

রাত কাটে। আকাশে আলোর রেখা ফোটে। আবছায়া অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়ে ইস্থার ছুটে আসে বাগানে। আর সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ায় তার হৃদস্পন্দন। থর থর করে কাঁপে। বাগানের বেড়া ডিঙিয়ে টলতে টলতে সে আসে জলপাইগাছের নীচে।

তার নজরে পড়ে আবছায়া অন্ধকারে আচ্ছন্ন দূরে রাস্তারই বিপরীত দিকে উইলো গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে আছে পা-পর্যন্ত ঢাকা জোব্বা পরা তার বাবা—মরডেসাই! স্বসানের স্বনামধন্য ইহুদী সন্ন্যাসী। জীহোভার একনিষ্ঠ উপাসক। ত্রিসন্ধ্যা জীহোভার স্তব না করে কখনো অন্নজল গ্রহণ করেন না। এই শহরের ইহুদী সমাজের অবিসংবাদী এবং জনপ্রিয় নেতা!

উদ্দাম আবেগে ছুটে এসে মরডেসাইয়ের চওড়া বুকের ভেতরে মুখ রেখে খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ইস্থার। নরম চুলে ভরা মাথাটা তার বুকে ঘসতে ঘসতে বলে, বাবা জানতাম তুমি—তুমি আসবে—

তারপর ইস্থারকে পরম মমতায় জড়িয়ে ধরে-চুলে, মুখের ভাঁজে ভাঁজে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল মরডেসাই, তোকে জোর করে রাজপ্রাসাদে পাঠিয়ে দেওয়ার পর একটি রাত্রেও ঘুমোতে পারি নি—

ইস্থার কোন কথা বলল না। তার ঠোঁট কাঁপল। বলল, আর তুমি কি মনে করছ, রাণী হওয়ার স্বপ্নে আমি-ই বেশ আনন্দে মশগুল হয়ে আছি, ইস্থারের গলার স্বর কেমন জড়িয়ে আসছিল—

কিন্তু শোন তোকে তো রাজার পছন্দ হবেই—

হয়তো হবে। কেমন একটা গভীর হতাশার ভেতরে ডুবে যেতে যেতে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল ইস্থার, কিন্তু তুমি যে কাজের ভার দিয়েছ—তা কি আমি পারবো বাবা—

পারবি মা—নিশ্চয়ই পারবি, দৃঢ়কণ্ঠে বলল মরডেসাই, সদাপ্রভু, কল্যাণময় জীহোভার ওপরে বিশ্বাস রাখিস—

কিন্তু বাবা—শুনেছি সম্রাট রমণীদের পণ্যসম্ভারের চেয়ে বেশী মূল্যবান মনে করে না, তীব্র একটা ঘৃণার ধিক্কারে ইস্থারের মুখখানা কঠিন হয়ে উঠল। আবার থেমে থেমে বলল, দিনরাত সিরাজীর নেশায় ডুবে থাকে—

সেসব আমি জানি মা; ইহুদী সন্ন্যাসীর কণ্ঠে উত্তাপ ফুটে ওঠে, আমি বিশ্বাস করি, নারী যেমন পুরুষের মনে কামনা জাগিয়ে দেয়, তেমনি দেবত্বও জাগাতে পারে। সে শক্তিরূপিণী কল্যাণময়ী—হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল মরডেসাই। তার পালিতা কন্যার বুদ্ধিদীপ্ত সুডৌল মুখখানার দিকে স্থির দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে নিজের মনেই বলল, তুই পারবি মা—মনের ভেতরে ধ্রুবতারার মত জ্বালিয়ে রাখবি তোর উদ্দেশ্য—তোর লক্ষ্যটা—

খস্—শুকনো পাতায় কার পায়ের শব্দ হল। মনে হল কেউ তাদের লক্ষ্য করছে।

চোখের পলকে গাছগুলির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল ইস্থার। মরডেসাইও বাগানের বেড়া ডিঙিয়ে রাস্তায় নামল।

দেখতে দেখতে কেটে গেল তিনমাস। যৌবনবতী সুন্দরীদের সৌন্দর্যের পরীক্ষার দিন এসে গেল। সহস্র ঝাড়বাতির আলোয় ঝলমল করে উঠল বিশাল সভাকক্ষ। শ্বেত ও নীলবর্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত প্রতিটি স্তম্ভে শোভা পাচ্ছে রৌপ্যবলয়ের ভেতরে ফিনিসীয় মিহি লিনেন বা বস্ত্রে নির্মিত ঘন বেগুনীরঙের পুষ্পস্তবক। শ্বেত এবং রক্তবর্ণ মার্বেল পাথরের মেঝেতে স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্মিত এক একটি আরাম কেদারায় উপবেশন করেছেন বিভিন্ন প্রদেশের ভিজির, আমীর ওমরাহ এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা। বর্ণাঢ্য পোশাকে সুসজ্জিত কাফ্রী ক্রীতদাসরা স্বর্ণনির্মিত পাত্রে রাজকীয় উৎকৃষ্ট সিরাজী নিয়ে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করছে অতিথিদের। তারা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে কখন—কখন শুরু হবে সেরা সুন্দরী যৌবনবতীদের মিছিল।

ওদিকে আসমানী মঞ্জিলে সৌন্দর্যের প্রতিযোগীতার শেষ মহড়া চলছে। ওদিকে বার বার ঝাড়াই বাছাই করে ইস্থারকে নিয়ে যে সাতজন শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে মনোনীত করেছিল স্বয়ং সম্রাট তার প্রাথমিক পরীক্ষায় তাদের সারি সারি দাঁড় করানো হল। এল শেষবারের মত সৌন্দর্যের বিশেষজ্ঞ—হেগাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাদের প্রত্যেকের দাঁত, নখ, চুল থেকে শুরু করে পায়ের পাতা পর্যন্ত দেখল। তাদের সবাই অপরূপ সাজে সেজেছে।

কিন্তু ইস্থারের কাছে এসে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, প্রসাধনের তেমন উগ্রতা নেই; নেই পোশাকের বাহার। তবুও আশ্চর্য একটা জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার প্রায় নিরাভরণ দেহ থেকে। হঠাৎ মনে হয়, সুদূর স্বর্গলোক থেকে নেমে এসেছে কোন অপ্সরী!

হেগাই জিভ দিয়ে অস্ফুট একটা আক্ষেপের শব্দ করে বলল, ইস তুমি যদি একটু—একটু নিয়মিত মুখে শুধু ওই গর্দভের ক্ষুরের চূর্ণটা লাগাতে ইস্থার, তাহলে দেখতে এই মুখখানাই শিশির ভেজা নরম আর স্নিগ্ধ ফুলের মত—

ঢং—ঢং—ঢং—ঘণ্টা বেজে উঠল। সম্রাটের সভাগৃহে সংকেত। সুন্দরীদের বুক ভয়ে ধুকপুকু। হারেম থেকে তাদের সবাইকে নিয়ে যাওয়া হল এক সুদৃশ্য হলঘরে। সেই ঘরের চার দেওয়ালে চারটি বড় বড় আয়না। রঙীন প্রজাপতির মত রূপসীদের আবির্ভাবে সমস্ত ঘরটা যেন ঝলমল করে উঠল।

স্বর্ণমণ্ডিত দীপাধারের উজ্জ্বল আলোয় তাদের প্রতিচ্ছায়া আর রাজবাড়ির সান্ধ্য নহবতে সানাইয়ের সুরে রীতিমত উৎসবের সমারোহ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।

রাত্রি গভীর হল। উতরোল হয়ে উঠল নহবতের বাজনা। রূপসীরা মরালীর মত ধীর গতিতে আলো ঝলমল বিশাল সভাগৃহের অভিমুখে রওনা হল। মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, ইথিওপিয়ার ক্রীতদাসরা সেই পথের দুপাশে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হাতে মশাল জ্বলছে। তারপরে বকের পালকের মত সাদা ধবধবে আলখাল্লা পরিহিত পুরোহিতবর্গের সম্মুখ দিয়ে, বর্ণাঢ্য পোশাকে সুসজ্জিত রাজপুরুষদের আসনের মাঝখানে রক্তবর্ণ জাজিমে আবৃত সংকীর্ণ পথ ধরে সভাগৃহের প্রান্তে কাঞ্চনময় মঞ্চে আসীন সম্রাটের সন্নিকটে যেতেই মধুর ঐকতানে পরিস্ফুট হয়ে উঠল উল্লাসের লহরী।

প্রখর হয়ে উঠল সম্রাট আহেস্যুয়েরাশের চোখের দৃষ্টি। উত্তেজক মদিরার নেশায় আচ্ছন্ন ঝাপসা দুটো চোখ রগড়ে নিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রূপধন্যা কুমারীদের মিছিলের দিকে।

তার দুহাতের দশটি আঙুলে দশটি হীরের আংটি ঝকমক করছে। পা পর্যন্ত ঢাকা মহার্ঘ রেশমের আংগরাখা, তার মাঝে মাঝে সোনার চুমকি চকচক করছে। কোমরে উজ্জ্বল সবুজ পাথরের বাঁট লাগান সোনার তলোয়ারে আলো ঠিকরে পড়ছে।

সুন্দরীরা একে একে তার কাছে এল। তার দু পা ছুঁয়ে অভিবাদন করল তীব্র সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে আহেস্যুয়েরাশ দেখল তাদের। রাজপুরোহিত, রাজ-কর্মচারীদের চোখের স্থির দৃষ্টি তাদের যৌবনপুষ্ট সুন্দর দেহের দিকে।

হেগাই রূপসীদের সামনে এল। সে সরিয়ে দিল তাদের পরিচ্ছদের ওপরের শিশিরের মত স্বচ্ছ শবনব মসলিনবস্ত্রের সুদীর্ঘ আবরণ আর উজ্জ্বল আলোয় প্রায় স্বচ্ছ মলমলের মিহি পোশাকের নীচে তাদের লীলায়িত তনুদেহের আশ্চর্য রমণীয় শোভা অবারিত হয়ে গেল। তাদের কারো সবুজ, কারো হলুদ কাঁচুলীর বন্ধনে আবদ্ধ দুটো বিভ্রমের ছবি, গোলাপী উরুদেশ, পুষ্ট নিতম্বের ছায়াময় রঙীন মরীচিকা উপস্থিত প্রত্যেকের মনের ভেতরে কামনার আগুন জ্বালিয়ে দিল।

আহেস্যুয়েরাশ সিংহাসন থেকে উঠে এল। প্রত্যেকে তার চোখের দৃষ্টিকে অনুসরণ করার চেষ্টা করছে—কার দিকে—কোন রূপসী ভাগ্যবতীর দিকে তার লক্ষ্য।

দুরুদুরু কাঁপছে রূপসীদের বুক। উত্তেজনায় ভেঙে পড়ছে তারা।

একে রেখে আর সবাইকে যেতে বলো, ইস্থারের মাথায় সস্নেহে হাত রেখে আহেস্যুয়েরাশ বলল।

সঙ্গে সঙ্গে সানাইয়ের সুরে সুরে উদ্দাম জয়জয়ন্তী বেজে উঠল। আর দুপাশের অলিন্দ থেকে থেকে মহলসরার রমণীরা ইস্থারের ওপরে অঝোরে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগল। প্রধান রাজপুরোহিত এসে সুগন্ধী চন্দনের তিলক পরিয়ে দিল তার কপালে।

দেশের সেরা সুন্দরীদের ভিতরে শ্রেষ্ঠ বলে নির্বাচিত হল ইস্থার। রাণীর মুকুট উঠল তার মাথায়। উৎসবের সমারোহে কেউ লক্ষ্য করল না, তার মেহেদী মাখা দুটো রক্তিম মুখে ঘন হয়ে নেমেছে হতাশার ছায়া।

নিদারুণ আশঙ্কায় কম্পিত হতে থাকে ইস্থারের বুকের ভেতরটা। আর আকুল হয়ে প্রার্থনা জানায় জীহোভার কাছে, প্রভু, যে মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য তাকে রাজপ্রাসাদে সুন্দরীদের প্রতিযোগীতায় প্রেরণ করা হয়েছিল সে যেন সফল হতে পারে সেই ব্রতে।

ওদিকে শুভসংবাদ পৌঁছে গেল মরডেসাইয়ের আশ্রমে। উল্লসিত হয়ে উঠল ইহুদী অধিনায়ক, আনন্দে উত্তাল হয়ে উঠল পারস্যের ইহুদী অধিবাসীরা।

প্রহরে প্রহরে রাত্রি গভীর হল। সমগ্র সাম্রাজ্যের সেরা সুন্দরীদের ভেতর থেকে সম্রাজ্ঞী নির্বাচনের উৎসব শেষ হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ আগে। আমন্ত্রিত অতিথিরা চলে গিয়েছে। নিভে গিয়েছে শূন্য সভাকক্ষের হাজার ঝাড়বাতির আলো। আর আলোকোজ্জ্বল রাজপ্রাসাদও তলিয়ে গিয়েছে গভীর অন্ধকারে কিন্তু।

শুধু প্রাসাদাভ্যন্তরের একটি সুরম্য কক্ষে আলো জ্বলছিল। নবনির্বাচিত সম্রাজ্ঞীর বিলাসবহুল আসবাবে সজ্জিত সুরম্য শয়নকক্ষ। ফিনিসীয় মহার্ঘ বেশমবস্ত্রে আবৃত শয্যার একপ্রান্তে বেদনার একটি শিলীভূত মূর্তির মত বসে রয়েছে ইস্থার। আর থেকে থেকে ঝড়ের পাখির মত কেঁপে কেঁপে উঠছে। এখুনি—এখুনি আসবে সম্রাটের শয়নকক্ষে যাওয়ার হুকুম। ক্ষুধার্ত মানুষটির উদরপূর্তির জন্য আহার্যসম্ভার পরিবেশনের রাজকীয় নির্দেশ।

আর কয়েকমুহূর্ত পরেই সেই পশুটি তার দেহটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খুবলে খুবলে মাংস খেয়ে পরম পরিতৃপ্তিতে ঢেকুর তুলবে আর আহারান্তিক গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে যাবে।

যাক—যা খুশি তাই করুক। তার যত কষ্টই হোক—তাকে স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে—তার মনের ভেতরে বলিষ্ঠ সঙ্কল্পটা স্তম্ভের মত উঁচু হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু রাত্রির তৃতীয়যামও যে অতিক্রান্ত হতে চলল। এখনও—এখনও কেন—

টক্—টক্—টক্—সম্রাজ্ঞীর জন্য নিযুক্ত খাসবাঁদী জুলিয়া এল। তার সঙ্গে এল দুজন পরিচারিকা। তাদের হাতে রৌপাধারে বকমারী ছোট ছোট স্ফটিকপাত্রের কোনটায় অগুরু, কোনটায় সুগন্ধী চন্দন, কোনটায় জলপাই তেল ইত্যাদি বিবিধ প্রসাধন সামগ্রী।

বেগমসাহেবা গোস্তাকী মাফ করবেন, অভিবাদন জানিয়ে বলল জুলিয়া, আপনার এই পোশাক ছেড়ে এইগুলো পরতে হবে, বলেই সে শয়নকালীন পরিচ্ছদ নিয়ে এগিয়ে এল।

কোন কথাই বলল না ইস্থার। তার ইচ্ছা অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ সব নির্বাসিত করে দিয়ে সে যেন এক নির্বেদলোকে পৌছে গিয়েছে!

জুলিয়ার নির্দেশে পরিচারিকারা দ্রুত হাতে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করল তাকে। সেই নগ্ন তনুদেহ জলপাই তৈল্য দিয়ে নিপুণ হাতে মার্জনা করতে শুরু করল। তৈল্য মর্দন শেষ হলে সারা দেহে ছড়িয়ে দিল ইস্পাহানের সুগন্ধী আতর। ইস্থারের শুধু মনে হল, যাযাবর উপজাতিরা তাদের ছাগশিশুকে বলি দেওয়ার আগেও স্নান করিয়ে সিন্দুর মাখিয়ে এমনি করেই দেবতার অর্ঘের উপযোগী করে নেয়।

শেষ হল প্রসাধনপর্ব। এইবার সেই সুগন্ধী চন্দনে আতরে চর্চিত স্বর্ণলতার দীর্ঘতনুটিকে আবৃত করা হল,মাকড়সার জালের মত স্বচ্ছ, নীলাভ ঝুনা মসলিনের বস্ত্রে নির্মিত পা পর্যন্ত ঢাকা এক ঢিলে আলখাল্লা বা গাউনের মত এক আজব কুর্তায়। তার নীচে আংগিয়া নয়, এমন কি অন্তর্বাস পর্যন্ত নয়। তাই সেই আস্বচ্ছ, বিচিত্র বস্ত্রাভরণের আড়ালে সেই অনাবৃত যৌবনশ্রীর এমন এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল যে জুলিয়া এবং পরিচারিকারা পর্যন্ত রমণী হয়েও বিস্ময়ে স্তম্ভিত এবং মুগ্ধ হয়ে গেল।

এবার আমার সঙ্গে আসুন বেগমসাহেবা, অস্ফুটস্বরে বলল জুলিয়া।

সম্রাটের শয়নকক্ষে পা দেওয়া মাত্র তার দেহের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল কামনান্মোত্ত একটা মাতঙ্গ! তাকে দলে পিষে নিপিষ্ট করে, কখনো গালে, কখনো মুখে, বুকে খিমচে, আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত করে বদ্ধ উন্মাদের মত সম্ভোগ-ক্রিয়ায় মগ্ন হয়ে গেল।

আশ্চর্য! একটা সম্ভাষণ না, আলাপ-পরিচয় না, প্রেম-প্রণয়ের গুঞ্জন

তো দূরে থাক—একটি কথা পর্যন্ত না। ইস্থারের মনে হল, তার দেহটা যেন একটা ভোগ্যপণ্য—ভোগলালসা চরিতার্থ করার যন্ত্র!

তার মনের ভেতরে ভেসে উঠল মরডেসাইয়ের মুখখানা। কানে বাজতে লাগল তার কথাগুলো, তুমি জানবে—মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে অনেক দুঃখ পেতে হয় ইস্থার।

একান্তভাবে কামনা করল ইস্থার। সম্রাটের বুকের ভেতরের লালসা উত্তপ্ত তরল লাভা স্রোতের মত তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাক ডুবিয়ে দিক, অতল অন্ধকারে তলিয়ে দিক।

যা ভেবেছিল তাই হল। আহেস্যুয়েরাশের কামনার আগুনে তার দেহটা যেন পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সুতীব্র আশ্লেষে ক্লান্ত, অবসন্ন শরীরটা শয্যায় এলিয়ে দিয়ে কয়েকমুহূর্ত স্থির নিস্পন্দ হয়ে রইল। কিন্তু লক্ষ্য করল, পালঙ্কেরই আর এক প্রান্তে একটা শবদেহের মত অনড় হয়ে রয়েছে বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর সম্রাট আহেস্যুয়েরাশ। কামুক। মদ্যপ। উচ্ছৃঙ্খল। অন্ধকার কবরের এই মানুষটাকে নিয়ে যেতে হবে আলোর রাজ্যে। হীন ওই পশুটার ভেতরের মানুষটাকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

না—না—সে পারবে না—অসম্ভবের পায়ে মাথা খুঁড়তে পারবে না—বাবা —এ তুমি কী কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছো—মর্মভেদী হাহাকার করে এই কথাগুলো যেন তার বুক ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইল।

কিন্তু সেই স্বর্ণনির্মিত নিগড়ে বন্দিনী দুর্ভাগিনীর কথা শুনতে কে আর বসে আছে। তার মনের তীব্র বেদনাই ফোটা ফোটা জল হয়ে ঝরে পড়ল তার দুই গাল বেয়ে।

হঠাৎ সে লক্ষ্য করল, টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল মহামান্য সম্রাট। বিস্রস্ত বেশবাস ঠিক করে নিয়ে দরজায় শব্দের সংকেত করল। সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রকোষ্ঠের গুপ্তদ্বার দিয়ে জুলিয়া এসে দাঁড়ালো।

তুই কি ঘুমিয়ে পড়েছিলি, সিরাজীর নেশায় জড়িত কণ্ঠস্বর অত্যন্ত রূঢ় আর কর্কশ শোনালো—তুই জানিস না—এতক্ষণ কোন বেগমকেই আমি আমার ঘরে থাকতে দেই না—একটু থেমে যেন কোন অবাঞ্ছিত এবং বহু ব্যবহৃত আসবাবকে ঘর থেকে বের করে দিতে বলছে তেমনি করে ইস্থারের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, ওকে ওর ঘরে নিয়ে যা,—আদেশ দিয়ে হয়তো আবার তারই প্রতীক্ষায় চঞ্চল, অন্য কোন বেগমকে আসতে বলার জন্য কোন বান্দার খোঁজে প্রস্থানোদ্যত হতেই—

দাঁড়ান, জাঁহাপনা—মরিয়া হয়ে সম্রাটের কাছে এল ইস্থার। তার বুকের কাছে ঘন হয়ে দাঁড়ালো। তার নেশাচ্ছন্ন ঘোলাটে দুটো চোখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট কণ্ঠে বলল, আমার ভবিষ্যৎ কি সম্রাট?

কোন কথা বলতে পারল না আহেসুয়েরাশ। চোখদুটো দুই হাতে রগড়ে নিয়ে বিচিত্র সেই রমণীর দিকে কেমন অর্থহীন শূন্য আর নিস্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। প্রতি রজনীতে প্রস্ফুটিত পদ্মকোরকের মত এক একটি উদ্ভিন্ন যৌবনা নারী আসে আর ক্ষণকাল পরে নিপিষ্ট, দলিত হয়ে ফিরে যায়। আবার প্রতীক্ষা করে—কবে—আবার কত দিন—কত মাস পরে তার আমন্ত্রণ আসবে, কিন্তু এই রকম অদ্ভুত কথা—

আমি কি বলছি বুঝতে পারছেন না?

কিসের কি ভবিষ্যৎ, বিস্ময়ের ধাঁধায় চোখদুটো ছটফট করে। আস্তে আস্তে হয়তো অগ্রমহিষী ভাস্তিকে উপপত্নীদের মহলসরায় নির্বাসন, দেশের সেরা সুন্দরীদের ভেতর থেকে নতুন সম্রাজ্ঞী নির্বাচন সব—সব অতীত ঘটনাগুলো স্মরণ করতে চেষ্টা করে থেমে থেমে বলে কেন আমি তোমাকে আমার পাটরাণী করব। তুমি দেশের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী—

তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খিল খিল করে হেসে উঠল সে। উপহাসের হাসি। মনের জ্বালা ছড়িয়ে দিয়ে বলল, আবেগের বশে কথা বলছেন জাঁহাপনা। যখন নেশা কেটে যাবে।

ভুল—ভুল করছ, প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকিয়েছিল আহেসুয়েরাশ। ঝোঁকের বশে বলে ফেলেছিল, তুমি কি প্রতিশ্রুতি চাও বল—

প্রতিশ্রুতি! দীপশিখার মতো কেঁপে উঠল ইস্থার। বুকের ভেতরটা খুশিতে উত্তাল হয়ে উঠল। সম্রাটের বুকে মাথা রেখে তার পিঠে পরম আদরে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মৃদু স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, তোমাকে নিয়ে আমার—আমার অনেক—অনেক বড় স্বপ্ন—

তুমি কি চাও, স্পষ্ট করে বলো না, অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে আহেসুয়েরাশ। তার কোষমুক্ত তরবারির মত তীক্ষ্ণধার ঝকমকে চেহারাটার দিকে তাকিয়ে ক্ষণকাল ইতস্তত করে বলে, রক্তপ্রবাল খচিত কণ্ঠহার নেবে?

না—জাঁহাপনা—

তাহলে ভারতীয় মুক্তার অঙ্গুরীয়?

না জাঁহাপনা—স্বর্ণালঙ্কার-ঐশ্বর্য এসব কিছুই চাই না আমি; শ্বেতশুভ্র

হস্তীদন্তে শোভিত দেওয়াল, মহার্ঘ আসবাবপত্রের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, এসব আমার কাছে তুচ্ছ—

তুচ্ছ! ইস্থারের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার উজ্জ্বল নীলাভ চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করল, প্রকৃতিস্থ কিনা। অস্ফুটস্বরে বলল, তাহলে তুমি কি—

কিন্তু তার কথা শেষ হওয়ার আগেই রৌপ্যাধারে নানা বিচিত্র কারুকার্য-খচিত স্ফটিকপাত্রে সুগন্ধী মদিরা নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল বাদশাহের খাসবান্দা।

তুমি তোমার কক্ষে যাও—আমি এখন বলেই সিরাজীর দিকে ইঙ্গিত করল আহেসুয়েরাশ। গম্ভীরকণ্ঠে বলল, মদ্যপানের সময় আমি কখনো কারো সঙ্গে কথা বলি না—ক্ষণকাল থেকে আবার যেন নিজের মনেই অস্ফুটস্বরে বলল, তুমি আমাকে বিস্মিত করেছো—কী যে প্রতিশ্রুতি চাও—কী-ই-বা বলবো—

কোন কথাই বলল না ইস্থার। প্রথমদিনে-ই সে সব বলা ঠিক হবে না বলেই বলল না। কিন্তু মুখে ঝিকমিক করতে লাগল হাসি।

সাফল্যের হাসি।

সুরম্য প্রকোষ্ঠে বিনিদ্র রাত্রি যাপন করে সম্রাজ্ঞী ইস্থার। সম্রাটের মত্ত উল্লাসে নিপিষ্ট দেহটা ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু যেই দুটো চোখ তন্দ্রায় জড়িয়ে আসে অমনি—তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক করুণ দৃশ্য—নিবিড় অন্ধকারে হাজার হাজার ছায়ামূর্তি যেন এগিয়ে আসছে, তারা আসছে শমরিয়া থেকে, আসছে মোয়াব থেকে, আসছে ম্যাগডালা থেকে, আসছে তিবরিয়া থেকে, আসছে এই সাম্রাজ্যের সীমানার ইহুদী অধ্যুষিত আরও দূর-দূরান্তরের গ্রাম থেকে—জনপদ থেকে। তারা যেন তীব্র যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে নিজেদের মাথার চুল ছিঁড়ে কাতর আর্তনাদ করছে আমাদের বাঁচাও—আমাদের বাঁচাও—নিশিরাতের নিথর নির্জনতার ভেতরে যেন তাদের নিঃশব্দ করুণ আর বুকফাটা কান্না শোনা যাচ্ছে।

তার মনে পড়ে গেল, বাড়ি থেকে রওনা হওয়ার আগে বাবা সস্নেহে মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, জানি, তোর খুব কষ্ট হবে—একটু থেমে আবার আস্তে আস্তে বলেছিলেন, সম্রাট অত্যন্ত মদ্যপ আর উচ্ছৃঙ্খল শুধু নয়—লোকটা অপদার্থ। রাজ্যশাসনের যাবতীয় দায়দায়িত্ব ভিজিরদের ওপরে দিয়ে নিজে বিলাস ব্যসনের ভেতরে ডুবে রয়েছে—

কিন্তু আমি—একটা মেয়ে মানুষ—

শুনছি প্রধানমন্ত্রী হয়েছে, তার কথাটা ভ্রূক্ষেপ না করে বলতে লাগল বাবা, ইহুদীদেরচিরশত্রু এক অ্যামলেকাইটকে (প্যালেস্তাইনের একটি উপজাতি) জানিস তো নেগেভ মরুভূমির এই হিংস্র যাযাবর সম্প্রদায় ইহুদীদের একেবারে সহ্য করতে পারে না—

কিন্তু আমি এই ব্যাপারে কি কিছু করতে পারবো বাবা ?

পারবি মা—পারবি—দেখবি খুব শীগগীরই দেশজুড়ে ইহুদীদের ওপরে অত্যাচার শুরু হবে—একটু থেমে আবার বলল, পারসিকরাও ইহুদীদের সুনজরে দেখে না। সম্রাট দিনরাত মদের নেশায় বিভোর হয়ে থাকে। অধীনস্থ কর্মচারীরা এই সুযোগে যা খুশী তাই করছে - ক্ষণকাল থেমে তার হাতদুটো ধরে উত্তেজনায় ভেঙ্গে পড়ে আবার বলেছিল, তুই সম্রাটকে ভালবেসে, জয় করে এই ব্যাপারে সজাগ করে তুলবি। বোঝাতে চেষ্টা করবি—ইহুদীরাও মানুষ—তাদেরও নিরাপদে বেঁচে থাকার অধিকার আছে—

ইস্থারের মনে হল যেন তার শয্যায় অজস্র আগুনের ফুলকি ছড়ানো। তার স্নায়ুর ভেতরে যেন তীব্র একটা জ্বালা তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে। ধীর পায়ে গবাক্ষের কাছে এল।

শেষরাতের আকাশে দপ দপ করছে রাশি রাশি তারা। আবছায়া অন্ধকারে, জবুথবু হয়েথাকা গাছগাছালির আড়ালে রাজপথের দিকে চোখদুটো ছড়িয়ে দিল।

হয়তো বাবা এতক্ষণে এসে গিয়েছে। তার বুকের শিরা-উপশিরায় টান পড়ে। চোখদুটো জলে ভরে আসে। আর কেমন ঝাপসা ও ঘোলাটে দেখায় রাজপথের আলোগুলো। কিন্তু চুপ করে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকবে না। বাঁচাতে পারবে—পারবে বাঁচাতে লক্ষ লক্ষ নিরাপরাধ ও নিরীহ মানুষকে। মনে হয়, অনন্ত শক্তিমান সদাপ্রভু জীহোভা তাকে করুণা করবেন। অসহ্য অস্থিরতায় তার হাত দুটো নিসপিস করতে থাকে।

ছুটে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে নীচে। উদ্যানের পাঁচিলের কাছে আসতেই দেখল, দূরে রাজপথে সাদা ধবধবে জোব্বা-পরা পিতৃদেবের শান্ত সৌম্য মূর্তিটা। চাপা গলায় বলল, বাবা—শুভসংবাদ আছে, বলেই সম্রাটের সঙ্গে তার আলোচনার বৃত্তান্ত জানালো—

আশ্চর্য! মরডেসাইয়ের মুখে কোন প্রসন্নতার চিহ্ন দেখতে পেল না। তোমার কি হয়েছে বাবা—শরীর ভালো আছে তো ?

হ্যাঁ মা! কেমন করুণ কণ্ঠে বলল মরডেসাই, সুসানের পশ্চিমে ইহুদীদের গোটা পল্লীটাই পুড়িয়ে দিয়েছে মা—

কারা আবার? ওই সম্রাটের বেতনভুক পারসিক সৈন্যরা! উস্কানি দিচ্ছে ওই শয়তান অ্যামলেকাইটটা—

তুমি কিছু ভেব না বাবা—আমি পারবো—দেখবে আমাদের স্বপ্ন সার্থক হবেই।

সর-সর্—উইলোগাছের ঝোপে সন্দেহজনক শব্দ হল। দ্রুত পায়ে প্রাসাদে ফিরে এল ইস্থার।

দিন কাটে। মাস যায়। কিছুতেই ইস্থার সম্রাট আহেস্যুয়েরাশের ভেতরের মানুষটাকে জাগাতে পারে না। নিয়মিত প্রতিদিন রাত্রির মধ্যযাম পর্যন্ত তার দেহটাকে নিয়ে মত্ত পশুর মত ছিনিমিনি খেলে তাকে বিদায় করে দেয়।

একদিন জুলিয়া যখন সম্রাটের অঙ্কশায়িনী হওয়ার আহ্বান নিয়ে এল, তখন ইস্থার বলল, আমার শরীর খারাপ—আজ যেতে পারবো না—

কিছুক্ষণ পরই অলিন্দে দ্রুত পদশব্দ বেজে উঠল। ছুটে এল আহেস্যুয়েরাশ। প্রকোষ্ঠে নেই ইস্থার। দরজা হাট করে খোলা। তার মনের ভেতরে ভেসে উঠল, খাপখোলা তলোয়ারের মত ধারালো ঝকমকে প্রদীপ্ত রমণীমূর্তি। হঠাৎ তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। রাজপ্রাসাদের চারিদিকে সে স্বয়ং উন্মাদের মত ইস্থারকে খুঁজতে লাগল।

হঠাৎ সেই রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানের আবছায়া অন্ধকারে তার নজরে পড়ল, একটি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি! উত্তেজনায় অস্থির হয়ে কেমন ব্যাকুল কণ্ঠে বলল আহেস্যুয়েরাশ, তোমার কি হয়েছে—তুমি এখানে কেন—

আমার যাই হোক কেমন ক্ষীণ আর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল ইস্থার তাতে আপনার কি এসে যায়, একটু থেমে আবার বলে আপনার অন্তঃপুরে তো যুবতী মেয়ের অভাব নেই, তাদেরই কাউকে নিয়ে গিয়ে খিদেটা মিটিয়ে নিন—

এসব—এসব তুমি কি বলছো ইস্থার—

কেন মেয়েমানুষ তো আপনার কাছে শুধু ভোগের বস্তু—

না-না—ইস্থার, আমি—আমি তোমাকে ভালবাসি—ভীষণ ভালবাসি!

ভালবাসেন—সত্যি বলছেন, উত্তেজনায় থর থর করে কেঁপে উঠল ইস্থার। তার বুকে মাথা রেখে বলল, তুমি তো তোমার কথা মত কাজ করছো না। একটু থেমে বলল, আমি শুনেছি আবারও ইহুদীমহল্লায় তোমার সৈন্যরা চড়াও হয়ে লুটতরাজ করেছে—

না-না ইস্থার—তোমাকে—তোমাকে আমি শপথ করে বলছি আমি নিজে—নিজে রাজকার্যের সব কিছু দেখা শোনা করবো, একটু থেমে বলল, জানো মন্ত্রী সেনাপতি এক একটা ধুরন্ধর শয়তান—

আহেসুয়েরাশের গালে আলতো করে একটি তপ্ত চুম্বন এঁকে দিয়ে আস্তে আস্তে বলল আমার কথায় কত সহজে কি দারুণ প্রতিজ্ঞা করলেন—

তার কথা শেষ হল না। তার ঠোঁট দুটো আহেসুয়েরাশের ঠোঁটের লোলুপ গ্রাসের ভেতরে লুপ্ত হয়ে গেল। আর অসহ্য ও তীব্র একটা পুলকানুভূতিতে তার সারা শরীর অবশ হয়ে গেল। সেইখানে—সেই জলপাইগাছের নীচে নরম সবুজ ঘাসের শয্যার ওপরেই আহেসুয়েরাশ তাকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে আস্তে—খুব আস্তে শুইয়ে দিল।

আকাশে চাঁদ উঠেছিল। তারা দুইজনেই বড় বড় নিশ্বাস ফেলছিল। জলপাইগাছের নীচে চাঁদের আলো-ছায়া যেন জাফরি কেটে দিয়েছিল। ফুলের সুগন্ধ বয়ে নিয়ে হু হু করে ছুটছিল সন্ধ্যার বাতাস। আবার তার মুখে চুমু এঁকে দিয়ে গুণ গুণ করে আহেসুয়েরাশ বলেছিল, আর কখনো আমাকে ভুল বুঝবে না তো ?

না গো না, মধুর কোন গানের মত গলায় বলল ইস্থার, তোমাকে তো বলেছি—তোমাকে নিয়ে আমার যে অনেক—অনেক বড় আশা গো—একটু থেমে আবার আস্তে আস্তে যেন বহু—বহু—দূর থেকে বলেছিল, দেখ·তুমি নিজে রাজকার্য পরিচালনা করবে। তোমার রাজ্যের প্রতিটি প্রজা সুখে সচ্ছন্দে বাস করবে। তবে—তবেই না ইতিহাসে প্রজানুরঞ্জন নৃপতি—

আর বলো না—বলো না ইস্থার, বলেই মত্ত উল্লাসে তাকে বুকের ভেতরে টেনে নিয়ে বলল আহেসুয়েরাশ, তোমাকে— তোমাকে যত দেখছি ততই বিস্মিত হয়ে যাচ্ছি ইস্থার, তীব্র আবেগে তার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এল। আবার দূরে সুন্দরী বেগমদের সারি সারি সুদৃশ্য সৌধগুলিরদিকে তাকিয়ে নিজের মনের ভেতরে ডুব দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, ভাস্তিও ছিল রূপসী। আমাকে ভালবাসতো—একটু থেমে আবার বলল, কৈ একদিনও তো তোমার মত সারা দেশ আর দশের কথা কখনো বলেনি ইস্থার। আর সব বেগমরা তো এক একটা মাদী কুকুরের মত কতক্ষণে আমার ঘরে আসবে আর আমার বিছানায়—

ছিঃ ছিঃ এমন করে বলো না—বলো না, কেমন আর্তনাদের মত শোনালো ইস্থারের কণ্ঠস্বর, তুমি-ই কি কখনো কোন বড় আদর্শ, বড় স্বপ্ন তাদেরকে বলেছো—

থাক কি করলে—কি করলে প্রজারা খুশি হয় বল তো ইস্থার। তীব্র আগ্রহে আহেস্যুয়েরাশের চোখদুটো জল জল করে।

তুমি কি জানো ইহুদীরা বড় দুঃখী, মৃদু গলায বলল, জেরুজ্যালেম থেকে রোমীয়দের তাডা খেয়ে গিয়েছিল সিরিয়ায় সেখান থেকে এসেছে এই দেশে, একটু থেমে কেমন ভার ভাব গলায় বলল তোমাব কর্মচারীরা যখন তখন তাদেব ওপব হামলা কবে, হঠাৎ থেমে গেল ইস্থার আব সম্রাটের কণ্ঠলগ্না হযে আব পবম আবেশে চুমুতে চুমুতে তার মুখখানাকে আচ্ছন্ন কবে দিযে বলল, তোমার গোটা বাজ্যেব না পাবো, বাজধানীব ইহুদীদেব একটা স-ডেকে তুমি প্রতিশ্রুতি দিতে পারো না?

শপথ করতে পারি কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে।

কেন? সরকাবী ভাবে বলতে বাধা কোথায?

চিন্তাব ছাযা পড়েছিল আহেস্যুয়েবাশেব চোখে। আস্তে আস্তে তাকে বুকেব ভেতরে জড়িযে ধরেছিল। ইস্থাবেব বুকের বক্তেব ভেতবে মৃদঙ্গ বাজতে লাগল। কিন্তু আহেস্যুয়েরাশ তাকে একতাল মযদাব মত ঠাসতে ঠাসতে অসহ্য যন্ত্রণায় জ্বলে পুড়ে যেতে যেতে বলল—তোমাকে—তোমাকে ভালবেসে কি ভুল যে কবেছি ইস্থাব—তার কথাগুলো সেই উইলোগাছেব নীচে ছায়াছন্ন অন্ধকাবে কাতব কান্নার মত শোনাচ্ছিল। তাব কপালে একটা মৃদু চুমু এঁকে দিয়ে বলেছিল—সরকারী প্রতিশ্রুতি দিতে গেলে মন্ত্রীসভার অনুমতি নিতে হবে—একটু থামল।

কোথা থেকে একটা বাতচবা পাখির কর্কশ ডাক ভেসে এল। আবাব থেমে থেমে প্রায় অস্পষ্ট গলায় বলল. শুনেছি প্রধানমন্ত্রী হামান দুচোখে ইহুদীদেব দেখতে পাবে না—তবুও সব দুশ্চিন্তা আব সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে বলল, ঠিক আছে, সবকাবী ঘোষণাই কবাব চেষ্টা করব, তোমাদের ওপবে আর কেউ অত্যাচার করবে না—

তাবপবেব ঘটনাগুলো ঝবণার জলেব স্রোতে এক একটা ছোট ছোট নুড়ি পাথরেব মত তব তব কবে এগিয়ে গেল। সেই বাজপ্রাসাদ সংলগ্ন প্রাঙ্গণেই ইহুদীদেব সভা বসেছিল। আহেস্যুয়েবাশ প্রতিনিধি স্থানীয় ইহুদীদের এবং মবডেসাইকে ভবসা দিয়েছিল। সম্রাটের সেই অঙ্গীকাবেব কথাগুলো তাদের কানে মধুর কোন গানেব সুরের মত মনে হয়েছিল। তাদেব চোখে স্বপ্ন নেমে এসেছিল। আব তাদেব দাবিদ্রজীর্ণ পল্লীগুলোয় মহাপ্রলয নেমে

আসবে না, পারসিক সৈন্যদের অত্যাচারে জর্জরিত মানুষের হাহাকার শোনা যাবে না। বহুদিন, বহুকাল পর তারা নিরুদ্বিগ্ন মন নিয়ে ঘুমাল।

সম্রাট জানতেও পেরেছিল মরডেসাই—ইস্থারের পিতার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিশিষ্ট সভাসদের পদে নিযুক্তও করেছিল আহেস্যুয়েরাশ। ইহুদীদের সম্মান প্রতিপত্তি বেড়ে গেল। যারা ছিল ব্রাত্য, অবহেলিত জনসাধারণ তাদের সম্ভ্রমের চোখে দেখতে লাগল।

কিন্তু একজন—একজন মনে মনে পুড়ে যায়।

নতুন সম্রাজ্ঞীর বাপটা—ব্যাটা ইহুদী সন্ন্যাসীটা হাত তুলে একটা অভিবাদন পর্যন্ত করা প্রয়োজন মনে করে না।

এই কচুরীপানার মত ভেসে আসা বেজন্মাগুলোর এত বাড় সহ্য করতে হবে যক্ষার জীবাণুর মত তাকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলে। তার হিংস্র যাযাবর রক্তে একটা ভয়ঙ্কর চক্রান্ত আবিল হয়ে উঠল।

এই লোকটি আর কেউ নয়—ইহুদীদের চিরশত্রু হামান। সে সুযোগ খুঁজতে লাগল, কেমন করে—কেমন করে সমাজের এই জঞ্জাল নির্মূল করা যায়—

সুযোগও এসে গিয়েছিল।

তাকে নিবিড় করে পেয়ে আহেস্যুয়েরাশ সব ভুলে গিয়েছিল। লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তার বাইরের পৃথিবী। ইস্থারকে আবেগের বশে প্রতিশ্রুতি দিলে কি হবে—রাজ্যের কোন খবর রাখত না। রাজসভায় যেত না।

কতবার—কত অসংখ্যবার তাকে বলেছে ইস্থার বিভিন্ন প্রদেশে পরিদর্শনে যেতে, বলেছে প্রধানমন্ত্রী হামানের কাজকর্ম এবং গতিবিধির ওপর নজর রাখতে কিন্তু—

কে শোনে কার কথা। আহেস্যুয়েরাশ, কে জানে—কি পেয়েছিল কি দেখেছিল ইস্থারের ভেতরে। দিবানিশি সে মধুলোভী মৌমাছির মত তার কাছে গুণগুণ করতো। কখনো তাকে নিয়ে চলে যেত দূরে-বহুদূরে ইউফ্রেতিস নদীর বিস্তীর্ণ বালুচরে আবার কখনো লোকলস্কর, দাসদাসী নিয়ে হারানের নিবিড় জঙ্গলে শিবির তৈরি করে মৃগয়ার নেশায় বিভোর হয়ে দিনযাপন করতো আর সেই নির্জন আর অবারিত আরণ্যক পরিবেশে ইস্থারকে নিয়ে কেমন উদ্দাম আর আদিম হয়ে উঠতো। সেইখানে—

সেইখানেই ঘটে গেল একটা কাণ্ড। একদিন রাত্রির মধ্যযামে নিস্তব্ধ বনভূমি বহু মানুষের আর্তকলরবে সচকিত হয়ে উঠল। ঘুম ভেঙ্গে গেল আহেস্যু-

য়েরাশের। ছুটে বেরিয়ে এল ইস্থার। দেখল দূরে একটা নরেলগাছের জমাট অন্ধকারের নীচে তার পিতৃদের দুইহাতে যমদূতের মত দুজন সুদানী ক্রীতদাসের হাত চেপে ধরে আছেন। আর তীব্র ঘৃণার ধিক্কারে জ্বলে যেতে যেতে বলছেন, ছিঃ ছিঃ তোমরা সম্রাটের খাসবান্দা হয়ে—

কি হয়েছে বাবা? কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এল ইস্থাব।

হবে আবার কি এই দেখ—বলেই মরডেসাই দুটো তীক্ষ্ণধার খঞ্জর (বড ছোরা) এগিয়ে দিল ইস্থারকে। বলল, এই দুজন সম্রাটকে হত্যা করতো—

তার কথা আর শেষ হল না। সম্রাটের গুণগ্রাহীরা তাদের দুইজনকেই বেঁধে নিয়ে গেল আহেস্যুয়েরাশের কাছে। সব বৃত্তান্ত শুনে সেই হারানের গভীর জঙ্গলেই প্রাণদণ্ড দিল সেই দুইটি ক্রীতদাসকে।

আপনার অনুগ্রহে জীবন ফিরে পেলাম, মরডেসাইয়ের পা ছুঁয়ে নুয়ে পড়ে অভিবাদন জানিয়ে বলল সম্রাট, আপনার এই উপকার জীবনে ভুলবো না—

শুধু তাই নয়। তখুনি নকলনবীশ ডেকে শ্রুতিলেখন দিতে শুরু করল পারশ্যের অধিপতি আহেস্যুয়েরাশ। মেষচর্মের সেই রাজকীয় দলিলে সোনার লেখার মত জলজল করতে লাগল মরডেসাইয়ের সেই অসামান্য কৃতিত্বের কথা।

ইহুদীদের সম্মান প্রতিপত্তি আরও বেড়ে যায়।

পরম পরিতৃপ্তিতে আবিষ্ট হয়ে আসে ইস্থারের চেতনা।

আর হামানের চোখদুটো জ্বলে।

প্রধানমন্ত্রী হামান তার গুণমুগ্ধ দুইজন যাদুকব এবং অনুচরদের সঙ্গে পরামর্শ করে তৈরি করল ধূর্ত আর ভয়ানক একটি পরিকল্পনা—

রাজপ্রাসাদের কর্মচারীদের ভেতরে কর্মরত তার গুপ্তচররা হামানকে জানালো, মহারাণী ইস্থারকে নিয়ে প্রমত্ত নিশিযাপনের আগে প্রচুর পরিমানে সুগন্ধী সিরাজী পান করেন।

অতএব ঘটনার দিনে পানশালায় সরবরাহ করা হল জুডিয়ার উত্তেজক মদ্য। আর কেন যেন সেদিন নৈশআহারের পর পেস্তা বাদাম সহযোগে সুস্বাদু ঘোলের শরবত পান করার পরই ইস্থারের চোখ ভেঙ্গে ঘুম নেমে এল।

জুলিয়া, সম্রাজ্ঞীর খাস পরিচারিকা এসে জানালো, বেগম সাহেবা ঘুমিয়ে পড়েছেন—

. সে কী! নেশাচ্ছন্ন দুটো চোখ টেনে জড়িত কণ্ঠে বলল আহেস্যুয়েরাশ, চলো আমি-ই যাচ্ছি তার ঘরে, টলতে টলতে যেই উঠে দাঁড়ালো অমনি এল হামান। বলল, প্রভু অসময়ে বিরক্ত করতে হল। আমি খবর পেয়েছি,

আপনার রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে এমন অনেক লোক আছে যারা রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত—

সে কী বলছেন, গ্যাঙড়ানো গলায় বলল আহেস্থয়েরাশ, তাদের এখুনি ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দিন—ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেন নি এখনও—

আপনার হুকুম না পেলে তো কিছু করতে পারি না—হামান অত্যন্ত গোবেচারী ভালো মানুষের মত বলল। আর জোব্বার পকেট থেকে রাজকীয় সনদ বা পরোয়ানা লেখা মেষচর্ম লিপিখানা বের করে বলল, আপনি তাহলে এখানে স্বাক্ষর করে দিন প্রভু।

আহেস্থয়েরাশ সেই সনদটি একবারও না পড়ে স্বাক্ষর করে দিল। এবং তাতে শীলমোহরও লাগিয়ে দেওয়া হল।

বলাবাহুল্য সেই সনদে রাষ্ট্রবিরোধী প্রজা কথাটির বদলে লেখা ছিল সমগ্র সাম্রাজ্যের ইহুদী প্রজা আর সেই সঙ্গে ছিল তাদের নেতার নামটিও—

মরডেসাই। কিন্তু—

একটি জনপ্রাণীও জানতে পারল না। দেশজুড়ে সমস্ত ইহুদী এবং মরডেসাইয়ের মৃত্যুবান তৈরি হয়ে গেল। হামানের বেতনভুক যাদুকর এবং জ্যোতিষীরা শৃগাল চর্মাবৃত শকুনির অস্থি দিয়ে তৈরি যাদুদণ্ড দিয়ে অনেক আঁকজোক কষে জানালো কোন মাসের ত্রয়োদশ দিবসই হল যে কোন মহৎ ব্রত উদ্‌যাপনের সর্বোৎকৃষ্ট শুভদিন।

তাই একটি জাতি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করার সেই ভয়াবহ পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার দিন—ব্যাপক গণহত্যার দিন ধার্য করা হয়েছিল—সেই মাসেরই ১৩ই--অর্থাৎ তের তারিখ।

হামান এবার সেই রাজকীয় পরোয়ানার কথাগুলোকে সুগ্দ তুখারা, চীনা সংস্কৃত, আর্মেনিয়, শ্লাভ ইত্যাদি সমগ্র সাম্রাজ্যে প্রচলিত সমস্ত ভাষায় অনুবাদ করে এবং বিশেষ তারিখটি রক্তবর্ণ কালিতে লিখে রাণার দিয়ে পাঠিয়ে দিল একশো সাতটি প্রদেশে।

এসে পড়ল ইতিহাসের সেই রক্তরঞ্জিত দিন।

তের তারিখ সারাদেশের প্রতিটি প্রদেশের প্রত্যেকটি নগরে জনপদে গ্রামে শুরু হল ইহুদী নিধন যজ্ঞ। রাজপথ থেকে ভেসে এল নরহত্যার অনুপ্রেরণায় উল্লসিত জনতার জয়ধ্বনি—ইহুদীরা—

নিপাত যাও—নিপাত যাও—

রাজধানী সুসানেও শুরু হল সেই রক্তাক্ত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। জুলিয়া ছুটে এল ইস্থারের শয়নকক্ষে। বেগমসাহেবা আপনার বাবা ডাকছেন—

বাবা—তুমি—! কিন্তু তার কথা আর শেষ হল না। মরডেসাইয়ের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল তার চোখের দৃষ্টি। পরনে গরীব ইহুদীদের বস্তার মত মোটা কাপড়ের শতছিন্ন আলখাল্লা। শুকিয়ে আমসি হয়ে গিয়েছে মুখখানা—

ইস্থার কিছু বলার আগেই হামানের সেই ইস্তাহারটা তার হাতে দিয়ে বলল, পড়ে দেখ—

এক নিশ্বাসে পড়েই বলল, সে কী বাবা—তোমাকে—তোমাকে ওরা ফাঁসী দেবে—কেমন করুণ হাহাকারের মতো শোনালো তার কথাগুলো।

কিন্তু সম্রাট নিজে দস্তখত করেছেন—

মিথ্যা—মিথ্যা—সব ষড়যন্ত্র—একটু থেমে বলল, তিনি নিজে তোমাদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে—

মৌখিক শপথের কী মূল্য আছে মা—

নরকের আবর্জনা কারা?

ইহুদীরা—

সুসানের রাজপথ থেকে ভেসে এল ক্ষুব্ধ জনতার ইহুদীবিদ্বেষী ধ্বনি কোন জনবহুল বাজার মোড়ে উঁচু মঞ্চ তৈরি করে ওরা তার বাবাকে ফাঁসী দেবে। মৃত্যুর মর্মান্তিক যন্ত্রণায় করুণ আর্তনাদ করবে বাবা। আর শয়তান হামানের অনুচররা নৃশংস পারসিকরা পৈশাচিক উল্লাসে হাততালি দিয়ে অট্টহাসি হাসবে—

হায়েনার মত শুকনো, খটখটে হাসি।

না—যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে বাবাকে—অনিবার্য মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে হবে নিজের স্বজন-পরিজনদের—

শোন মা—সম্রাট তার আদেশ ফিরিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত আমি এই রাজোদ্যানে অনশন করে বসে থাকবো—দৃঢ়কণ্ঠে বলল মরডেসাই।

কোন কিছু করার দরকার হবে না বাবা—একটা ব্যবস্থা আমি করতে পারবোই—বলেই দাবদগ্ধ একটা হরিণীর মত দ্রুত পদক্ষেপে অন্তঃপুরে প্রবেশ করল।

ঝড়ের গতিতে আহেসুয়েরাশের কক্ষের দিকে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। কয়েকমুহূর্ত কি ভেবে নিজের ঘরে এল সুদৃশ্য দেওয়ালে টাঙানো বিশাল

মুকুরের সামনে এসে দাঁড়ালো ! নিজের অপরিসীম রূপরাশির দিকে তাকিয়ে মনে হল—রূপ মেয়েদের খুব বড় একটা মূলধন।

তীব্র সুগন্ধী অগুরু নির্যাস মিশ্রিত জলপাইতেলে সিক্ত করল অপর্যাপ্ত কুঞ্চিত কেশরাশি। তার গোছায় গোছায় ঝুলিয়ে দিল রক্তবর্ণ রুবী। ঘননীলবর্ণ মসলিনের জামদানী বস্ত্রাভরণে তার দীর্ঘ ক্ষীণতনু আবৃত করল। তার নিজেরই মনে হল, নীলাভ আবরণের ভেতরে ঝকমক করছে একটি বিজুরী রেখা। পরীর মত সেজে সালঙ্করা হয়ে এল সম্রাটের সুরম্যকক্ষে—

কী ব্যাপার ! এই সাতসকালে এত সাজের ঘটা—অসামান্য রূপসী মহিষীকে দেখে খুশি হয়েই আবার আহেস্যুয়েরাশ একটু বিস্মিতও হল। যে মেয়ে অনেক অনুনয় করলেও কিছুতেই সাজগোছ করতে চায় না, সে—

তুমি আমার একটা অনুরোধ রাখবে ?

বলো না,—ইস্থারকে বুকের ভেতরে টেনে নিয়ে বলল, তোমাকে অদেয় কিছুই নেই—

শোন, আমার অনেকদিনের ইচ্ছা একটা ভোজসভা করবো—তাতে তোমার মন্ত্রীদের নিমন্ত্রণ করবো—

বেশ তো—বেশ তো—খুশিতে উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠল আহেস্যুয়েরাশ। আর তখুনি ভোজসভার আয়োজন করার হুকুম দিয়ে দিল।

ওদিকে রাজধানীর দিকে দিকে নিরপরাধ ইহুদীদের বাড়িতে বাড়িতে লুঠতরাজ চলছে। বাজারের সন্নিকটে প্রধান রাজপথে উঁচু মঞ্চ করে তৈরি হয়েছে বধ্যভূমি। এখানেই—ইহুদী জননায়ক মরডেসাইকে ফাঁসী দেওয়া হবে। এই সব ব্যবস্থা নিয়ে যখন হামান খুব ব্যস্ত তখন রাজপ্রাসাদ থেকে এল আমন্ত্রণ।

উল্লসিত হয়ে উঠল প্রধানমন্ত্রী। আরও বেশি খুশি হল তার স্ত্রী। বলল, ওই পশুগুলোর গোদাটাকে একেবারে খতম করে দিয়ে নিমন্ত্রণে গেলে পারতে—

না—আগে জেনে আসি। মনে হয় আমার কাজে সম্রাট খুশি হয়েছেন—

আলোকোজ্জ্বল সভাগৃহ।

দীর্ঘ ফরাসে সারি সারি বসে আছেন সভাসদরা। তাদের প্রত্যেকের সামনে মহার্ঘ। অপর্যাপ্ত আহার্য সামগ্রী। প্রধানমন্ত্রী হামান প্রবেশ করতেই স্বয়ং সম্রাজ্ঞী ইস্থার গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এল।

সমবেত সভাসদবর্গ বিস্মিত হয়ে দেখল, সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর মাঝখানের আসনটিতে বসানো হল হামানকে। আহারান্তিক আলোচনার গোড়াতেই

আহেস্যুয়েরাশ বলল, আপনার সেই রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত প্রজাদের দমনের কাজ—কেমন হচ্ছে—

আজ্ঞে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের খবর পেয়েছি প্রচুর গ্রেপ্তার করা হয়েছে—ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে—

আচ্ছা মন্ত্রীমশাই, যদি সম্রাটের তথা রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর কাজ যদি কেউ করে তাহলে—

তাঁকে পুরস্কৃত করা উচিত প্রভু হামানের মনে হল, তার কর্মতৎপরতায় খুশি হয়ে বুঝি বলছেন সম্রাট।

তাহলে—এই দেখুন বলেই সেই রাজপ্রাসাদের দিনলিপির মেষচর্মে লিখিত দলিল তার সামনে মেলে ধরল আহেস্যুয়েরাশ। যেখানে সোনার কালিতে লেখা আছে—মরডেসাইয়ের আশ্চর্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে সম্রাটের প্রাণরক্ষা পেয়েছিল

হামানের মুখ থেকে রক্ত সরে গেল।

আর এই রাজকীয় সনদ কি? আমি—আমি স্বাক্ষর করেছি—নিরুদ্ধ আক্রোশে গর্জন করে উঠল আহেস্যুয়েরাশ'

উপস্থিত সভাসদবর্গ শুনুন, হামানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশে ক্ষিপ্ত বাঘিনীর মত বলল ইস্থার, মদ্যপানে নেশাচ্ছন্ন অবস্থায় এই সনদে সম্রাটের স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছে ইহুদীদের জন্মশত্রু ওই কুচক্রী হামান—

যে বধ্যভূমি মরডেসাইয়ের জন্য প্রস্তুত করেছিল হামান, সেইখানেই তাকে ফাঁসী দেওয়া হল। মরডেসাইয়ের কৃতিত্বের কথা ঘোষণা করে তাকে পুরস্কৃত করাও হল। কিন্তু—

পারসিক আইনে রাজকীয় সনদ যে কখনো প্রত্যাহার করা যায় না। তাই শেষরক্ষা হল না। হামান না থাকলে কি হবে! রক্তবীজের ঝাড়ের মত তার অসংখ্য অনুচর আছে, আছে সমাজবিরোধী দুর্বৃত্তরা। নিরীহ ইহুদীদের ওপর অবাধে চলতে লাগল মর্মান্তিক অত্যাচার।

রাত্রিশেষের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে।

তীব্র ব্যথায় ইস্থারের বুকের ভেতরটা ভেঙ্গে পড়ছে। স্বজাতি স্বজনকে সে রক্ষা করতে পারল না—সম্রাজ্ঞী হয়েও! ধীর পায়ে এল আহেস্যুয়েরাশের কক্ষে।

তীব্র আবেগে উত্তেজনায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন আহেস্যুয়েরাশের মসৃন কপালে চুমু এঁকে দিল সে। পা দুটো ছুঁয়ে প্রণাম করল। প্রণাম করতে গিয়ে পায়ের পাতার ওপরে মুখটা চেপে ধরল। চোখের জলে ভিজে উঠল আহেস্যু-

য়েরাশের পায়ের পাতা দুটো! একটি একটি করে খুলে ফেলল গায়ের বহুমূল্য অলঙ্কার। খুলে ফেলল সোনার চুমকি বসানো নীলাভ রঙের মসলিনের ঘাঘরা। বুকের ভেতর থেকে পাঁক দিয়ে উঠছে তীব্র কান্না।

নিঃশব্দে পরিত্যাগ করল রাজপ্রাসাদ। বিপন্ন ইহুদীদের রক্ষা করতে তার পতৃদেব পাগলের মত পথে পথে ঘুরছে, সেও সেইখানে যাবে—ইহুদী পল্লীতে পল্লীতে যেয়ে তাদের সেবা করবে।

ঘুম ভাঙ্গল সম্রাটের।

একী! ইস্থার কোথায়? ইস্থারই তো কোলের ভেতরে মাথাটা টেনে নিয়ে তার মাথার চুলে বিলি কেটে কেটে তার ঘুম ভাঙায়। ঘরময় ছড়িয়ে রয়েছে তার অলঙ্কার, তার সেই মসলিনের নৈশপোশাক—ঘরের বাতাসে ভাসছে তার সেই দীর্ঘ কমনীয় তনুর মিষ্টি সৌরভ।

ই—স্থা—র ক্ষিপ্ত বাঘের মত গর্জন করে উঠল আহেস্যুয়েরাশ। শূন্য কক্ষে গম-গম করতে লাগল তার গলার স্বর।

ছুটে রাজপথের দিকের গবাক্ষে এল। আর বিস্ময়ে ছটফট করে উঠল তার চোখদুটো। ভয়ার্ত জন্তুর মত ইহুদীরা যে যেদিকে পারছে ছুটে পালাচ্ছে। রাজপথে পৈশাচিক উল্লাসে মত্ত পারসিক এবং সমাজবিরোধী দুর্বৃত্তরা দিনের আলোয় স্বাস্থ্যপুষ্ট সুন্দরী ইহুদী মেয়েগুলোর ওপর বলাৎকার করছে। যারা সামান্য বাধাও দিচ্ছে—তাদের সম্পূর্ণ নগ্ন করে ফেলছে, তারপরে পাশবিক অত্যাচার করছে। থর-থর করে কেঁপে উঠল আহেস্যুয়েরাশ।

তার মনে পড়ে গেল, হামানের সেই সনদের কথা—মনে পড়ে গেল, পারসিক আইনে সম্রাটের স্বাক্ষরিত পরোয়ানা কখনো প্রত্যাহার করা যায় না। আর সঙ্গে সঙ্গে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল, কেন ইস্থার নেই—কেন ইস্থারকে আর কখনো দেখতে পাবে না। দ্রুত নকলনবীশকে ডেকে আর একটি সনদ প্রস্তুত করল, তাতে লেখা হল যদি কোন একটি ইহুদী অধিবাসীর ক্ষতি হয়—তাহলে সেই অত্যাচারী দুর্বৃত্তকে শূলে দেওয়া হবে। সেই পরোয়ানা এক হাতে আর এক হাতে রাজদণ্ড নিয়ে বদ্ধ উন্মাদের মত চলে এল রাজপথে। বধ্যভূমির সেই উঁচু মঞ্চে দাঁড়িয়ে জনতার উদ্দেশ্যে ব্যাকুল গলায় বলল, আমি রাজদণ্ড হাতে নিয়ে মিথ্যে বলব না—আমাকে দিয়ে ইহুদীদের ধ্বংসের পরোয়ানা স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছিল আমার মত্ত অবস্থায় ওই কুচক্রী হামান। মিথ্যে কথা বলেছিল, রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত প্রজাদের শাস্তি দেবে—

ছিঃ—ছিঃ প্রধানমন্ত্রী হয়ে মিথ্যে বলেছিল, জনতার ভেতর থেকে সৎ এবং সুস্থ প্রকৃতির পারসিকরা চীৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্ত হয়ে গেল তারা।

আর হামানের স্ত্রী, পুত্র এবং কন্যাদের নির্মমভাবে হত্যা করল। তার বিপুল সম্পত্তি রাষ্ট্র বাজেয়াপ্ত করল।

এইবার নিশ্চয়ই খুশি হবে ইস্থার আর আবার রাজপ্রাসাদে ফিরে আসবে—এই মনে করে দুরন্ত একটা ঝড়ের মত প্রাসাদে এল আহেস্যুয়েরাশ।

এখুনি—এখুনি—এই মুহূর্তে তীব্র আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াবে ইস্থার। তার স্বর্ণলতার মত দুই বাহু দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরবে। কিন্তু—

কোথায় ইস্থার? শূন্য কক্ষে হু হু করে বাতাস গুমরে গুমরে কাঁদছে। তবে কি ইস্থার আর তার পিতৃদেব ইহুদী জননায়ক বৃদ্ধ মরডেসাই এখনও জানে না—জানে না সে—

বেগমসাহেবা, গরীব ইহুদীদের সেই বস্তার মত মোটা কাপড়ের পোশাক পরে বেরিয়ে গিয়েছেন শেষরাত্রে, জুলিয়া ভয়ে ভয়ে বলল।

তোমরা—তোমরা কি করছিলে, ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মত গর্জন করে উঠল আহেস্যুয়েরাশ।

উল্কার গতিতে ছুটে বাইরে এল আহেস্যুয়েরাশ। রাজপথে অসময়ে অশ্বখুরের দ্রুত শব্দ বেজে উঠল—খট্—খট্—খট্—

নিরীহ পথচারীরা ভয়ে যে যেদিকে পারে পালাতে লাগল। আহেস্যুয়েরাশের বুকের ভেতরে পাক দিয়ে উঠছে কান্নার ঢেউ। ইস্থার—তার ইস্থার আর কখনো তার কাছে ফিরে আসবে না।

রাজধানী সুসানের উপকণ্ঠে এক ইহুদী পল্লীতে ইস্থারের দেখা পেল।

এ কী ইস্থার—তুমি এখানে? আর্তনাদ করে উঠল আহেস্যুয়েরাশ। দরিদ্র আর নগণ্য ইহুদী রমণীর বেশে সেখানকার নির্যাতীত মানুষদের সেবা করছে ইস্থার—

আমি—আমি তোমার বাবাকে পুরস্কৃত করেছি, ফাঁসী দিয়েছি হামানকে, অসহায় একটা মানুষের মত হাহাকার করে বলতে লাগল বিশাল সাম্রাজ্যের সম্রাট আহেস্যুয়েরাশ, আমি—আমি নতুন করে রাজকীয় সনদ জারী করে ঘোষণা করেছি—কোন ইহুদীর কেশাগ্র কেউ স্পর্শ—

সত্যি বলছো। বাতাসে কম্পিত তরুলতার মত থর থর করে কেঁপে উঠল

ইস্থার। লুটিয়ে পড়ল আহেসুয়েরাশের প্রশস্ত বুকে। তীব্র আবেগে উত্তেজনায় কান্নায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলল, তুমি নতুন—নতুন পরোয়ানা—আমাকে তুমি এত এত ভালবাসো—ইস্থারের কণ্ঠরুদ্ধ চোখের জলে হাসির আলোয় অন্ধ হয়ে এল তার দৃষ্টি।

পারসিক সম্রাট আহেসুয়েরাশ আর ইস্থারের নিবিড় প্রেম নিশ্চিত অবলুপ্তি থেকে রক্ষা করেছিল ইহুদীদের।

হাজার হাজার বছরের ব্যবধান এড়িয়েও ইতিহাসের সেই ইতিবৃত্তটিই আজও বসন্ত সমাগমে তাদের পুরীম উৎসবের উল্লসিত নৃত্য গীতে অনুরণিত হয়ে ওঠে।

অ্যামনন ও ট্যামার

রাজপ্রাসাদের সহস্র রূপসী রমণীদের সে ভূষণস্বরূপা। তার অপরিসীম আর অপার্থিব সেই সৌন্দর্যের কাছে এলেই অতীব সুন্দরীও কেমন ম্লান আর বিবর্ণ হয়ে যায়।

তার অসামান্য রূপের স্তুতি করে পুরাতন নিয়মের বাইবেল বা ওল্ড টেস্টামেন্ট বলেছে—

হে লীলাবতী, তড়িৎ উদ্দাম সম তোমার দেহকান্তি। তোমার স্মিত হাসিতে পরিপূর্ণ অপূর্ব নয়নভঙ্গীর বিভ্রম অতি বড় ধৈর্যশীল ব্যক্তিকেও চঞ্চল করে তোলে। তোমার কণ্ঠস্বরে, বাচনভঙ্গীতে,হাস্য পরিহাসে দেখা যায় আশ্চর্য এক মাধুর্যের বিকাশ।

আর ইতিহাসেও আছে, সি ওয়াজ দি ডিলাইট অফ দি রয়্যাল প্যালেশ-অর্থাৎ রাজপ্রাসাদের খুশি-উচ্ছলতার প্রতীক। তার হাসি-খুশি, সদা প্রফুল্ল স্বভাবের জন্যই সে ছিল প্রত্যেকের অত্যন্ত প্রিয়। অতি বিষন্ন আর দুঃখী মানুষও তার সান্নিধ্যে এলেই মুহূর্তে শোক-দুঃখ ভুলে গিয়ে সজীব হয়ে উঠতো।

সেই মেয়ে—অসাধারণ রূপসী। অফুরন্ত প্রাণের সম্পদে পরিপূর্ণ হাস্যোচ্ছল মেয়ের কি হল, কে জানে, তার মুখে নেমে এল আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘ। নিশিদিন উদভ্রান্তের মত অলিন্দে পায়চারী করে। কারো সঙ্গে একটা কথা বলে না।

তার দুঃখের কোন কারণই কেউ খুঁজে পায় না।

রাজার মেয়ে। দেশ জুড়ে তার রূপের খ্যাতি। বিজুরীচমকের মত তার দেহরেখা, রক্তবর্ণ মেঘের মত একরাশ ঢেউ খেলানো চুল দুলছে শ্বেতপাথরে গড়া গ্রীবার ওপরে। ডাগর দুটো নীলাভ চোখে কেমন আবেশ মাখানো দৃষ্টি।

কিন্তু কেন যেন তার সেই বড় বড় দুটো নীল চোখে জল। সুন্দর মুখখানা হতাশার কালিতে মাখা। বিশাল রাজপ্রাসাদের নির্জন এক কোণের ঘরে পাথুরে মূর্তির মত বসে থাকে সে। আর নিঃশব্দে চোখের জল ফেলে। ভিতরে ভিতরে কিসের যেন যন্ত্রণায় পুড়ে যাচ্ছে সে।

তার সেই শোকম্লান বিষন্ন বিষাদের মূর্তির সামনে কেউ আসে না। আসতে

ভরসা পায় না। সে যেন এক গভীর রাজ্যে নির্বাসিত হয়ে গিয়েছে। আর একক নিঃসঙ্গ জীবনের অভিশাপ বহন করছে।

রাজবাড়ির কেউ না এলেও একজন তার কাছে আসে। তাকে আসতেই হয়। গভীর স্নেহের টান তাকে যেন চাবুক মেরে তাড়িয়ে নিয়ে আসে।

কিন্তু তাকে আসতে হয় খুব গোপনে আর নিঃশব্দ পায়ে। পরম স্নেহে তার মাথায় হাত রেখে আস্তে আস্তে বলে, তোর কি দুঃখ মা—আমাকে বলবি না—

কোন কথা বলে না ট্যামার। জলেভরা চোখদুটো তুলে বাবার মুখের দিকে তাকায়। কান্না জড়ানো অস্পষ্ট গলায় বলে, তোমাকে—তোমাকে বলা যায় না বাবা—

রাজার চোখে অসহায় দৃষ্টি ফুটে উঠে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবে—সমগ্র রাজ্যে যেমন প্রজানুরঞ্জন বিচক্ষণ নৃপতি তেমনি রাজঅন্তঃপুরেও তার স্নেহবৎসল পিতা, কর্তব্যপরায়ণ আদর্শ স্বামী বলে খ্যাতি আছে। সারা জীবন কত জটিল সমস্যার সমাধান করেছে। কিন্তু এই ব্যাপারটায় সে কিছুই করতে পারছে না। মেয়েটা তার চোখের সামনে শুকিয়ে যাবে অথচ সে কোন প্রতিকার করতে পারবে না।

তুমিই আদর দিয়ে দিয়ে মাথাটা খেয়েছো—তোমার আস্কারাতেই ও একেবারে মাথায় উঠে গেছে—বড়রাণী ছোটরাণী অনুযোগ করে।

চুপ করে শোনে রাজা। আর মনের ভিতর ভেসে ওঠে একটা সুডৌল মুখের ছবি। সেজরাণী ম্যাকা, ট্যামারের মা। সে নেই। তার অভাবটা স্নেহ দিয়ে যত পূরণ করতে চায় ততই তীব্র হয়ে ওঠে রাণীদের আক্রোশ। প্রবল প্রতাপান্বিত এবং গম্ভীর স্বভাবের স্বামীর কাছে ভয়ে ভয়ে তারা প্রস্তাব দেয়, মেয়ের বয়স হয়েছে—বিয়ে দিয়ে দিন—

ওর দুঃখটা কি—কেন ও গুমরে গুমরে কাঁদে, সেটা তোমরা একবারও জানার চেষ্টা করলে না। বিয়ে দিয়ে ঘাড় থেকে নামিয়ে দিলেই হল। এসব কথা রাজার মুখে এসে গিয়েছিল। কিন্তু বলল না।

কী লাভ? সে জানে মেয়েরা বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক। স্বার্থপর। মেয়েরা কখনো সতীনের গর্ভজাত সন্তানকে অন্তর থেকে ভালবাসতে পারে না!

তার ব্যথিত মনের ভেতরে ভেসে উঠল ঠিক ট্যামারের মুখের মত অবিকল আর একটি মুখাবয়ব! সেই নীলাভ গভীর দুটো চোখ।

ম্যাকা! ট্যামারের মা। গ্যালিলির সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে অনেক অনেক উঁচুতে

এক বিস্তীর্ণ পার্বত্য ভূখণ্ড গোলনের অন্তর্গত ধনেজনে সমৃদ্ধ একটি রাজ্য—ঘেস্থুরের নৃপতি টালমাইয়ের একমাত্র কন্যা।

তার চোখের সামনে ভেসে উঠল, কাঁচের জানলার আড়াল থেকে দেখা দৃশ্যের মতই, ম্লান আর অস্পষ্ট সাবেকদিনের এক একটা ছবি।

সেই প্রথম যৌবনে যখন দক্ষিণে এডম, অ্যামন, মোয়াব ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করে প্রায় সমগ্র প্যালেস্তাইনের একছত্র অধিপতি হয়েছে আব জেরুজ্যালেম থেকে নয়, হেব্রণ থেকে তার শাসনকার্য পরিচালনা করছে।

সেই সময় একদিন খবর এল গিবনের উপজাতি সম্প্রদায় বেনজামেনীযরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

সঙ্গে সঙ্গে সে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে রণযাত্রা করল গিবনে।

অশ্বারূঢ় হয়ে ঝড়ের গতিতে চলেছে। গ্যালিলির সমুদ্রতীর বাঁয়ে রেখে যেই প্রবেশ করল গোলানের পার্বত্য প্রদেশে, অমনি নিবিড় বনভূমিকে সচকিত করে সম্মিলিত স্ত্রীকণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীতের সুর কর্ণগোচর হল!

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সেই সঙ্গীতের দূরাগত সঙ্গীত লহরীর মূর্চ্ছনাকে অনুসরণ করে অগ্রসর হতেই তার চোখদুটোর দৃষ্টি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল!

বর্ণাঢ্য ও মহার্ঘ পোশাকে সুসজ্জিতা রমণীদের এক সুদীর্ঘ শোভাযাত্রা চলেছে পাহাড়ী পথের চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে তাদের প্রত্যেকের হাতে স্বর্ণপাত্রে বন্য মধু, খর্জর, সুপক্ক দ্রাক্ষা ইত্যাদি দেবতার অর্ঘসম্ভার। তারা জীহোভার মহিমায় বিভোর হয়ে গাইছে—

হে সদাপ্রভু, জীহোভা--

তোমারই সৃষ্টি সূর্য, চন্দ্র, তারা শোভা পায় আকাশে।

কিন্তু তুমি প্রভু লুকিয়ে থাকো অন্ধকারের নাগপাশে।

মনে হল জীহোভার থানে পূজা দিতে চলেছে কোন রাজঅন্তঃপুরের রমণীরা। তারা প্রত্যেকে খরযৌবনবতী। কিন্তু তাদের অগ্রনায়িকার যৌবনের শান্ত, নমনীয় সৌন্দর্য। রাত্রিশেষের আকাশের মত এক আশ্চর্য ছায়া মেদুর কমনীয়তা তাকে মুগ্ধ করেছিল। খোঁজ নিয়ে জানল, গোলানের-ই এক ক্ষুদ্র রাজ্যের নৃপতি টালমাইয়ের কন্যা!

প্যালেস্তাইনের অধীশ্বর স্বয়ং পাণিপ্রার্থী জেনে টালমাই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল।

সেই ম্যাকা! প্রথম যখন দেখেছিল তার মুখে পূজার্থিনীর পবিত্রতা, ধর্মনিষ্ঠা, তেমনি তার স্বভাবের এই আশ্চর্য বৈশিষ্ট্যগুলো জীবনের শেষদিন পর্যন্ত

সে অম্লান রেখেছিল। সম্রাজ্ঞী হয়েও আর অন্যান্য সব মহিষীদের মত কখনো বিলাসীতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয় নি! তারই প্রভাবে রাজ-অন্তঃপুরে তৈরি হয়েছিল এক বিচিত্র আরাত্রিক স্নিগ্ধ বাতাবরণ! রমণীদের সুরাপান বন্ধ করে দিয়েছিল, নিষেধ করে দিয়েছিল অকারণে উল্লসিত বেলেল্লাপনা এবং সর্ববিধ উচ্ছৃঙ্খলতা!

তাকে সে যথেষ্টই সমীহ করতো। তার অপর্যাপ্ত রূপরাশির ভেতরে ছিল বুদ্ধির দীপ্তি, ছিল কঠোর ব্যক্তিত্বের এক শান্ত নমনীয় ব্যঞ্জনা। সঙ্কটজনক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং যে কোন জটিল সমস্যায় তার সঙ্গে পরামর্শ করতো আর বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে যেত তার প্রখর অন্তর্দৃষ্টি আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে।

বিসূচিকা রোগে সে মারা গেল। রাজপুরী অন্ধকার করে দিয়ে সে চলে গেল। রেখে গেল তার স্বাক্ষর—দুটো সোনার প্রতিমা।

অ্যাবাস্যালোম।

ট্যামার।

তার এই পুত্রকন্যার অসামান্য রূপের খ্যাতিতে সমগ্র প্যালেস্টাইনের অধিবাসীরা মুখর হয়ে ওঠে!

আজ ম্যাকা থাকলে কি মেয়েকে নিয়ে তাকে এত চিন্তাগ্রস্ত হতে হতো, তার বুকের পাঁজর বিদীর্ণ করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে! সে জানে, রাণীরা যেমন ম্যাকাকে, তেমনি তার মেয়ে ট্যামারকেও ভেতরে ভেতরে সহ্য করতে পারে না।

না। কোন দেশের তরুণ ও রূপবান রাজকুমারের সঙ্গে বিয়ে দিলে ট্যামার অন্তত শ্বাসরোধী কারাগার থেকে মুক্তি পাবে। আর হয়তো সুখীই হবে।

তাই বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে প্যালেস্টাইনের মহামান্য অধীশ্বর সিরিয়ায়, ফিনিসীয়ায়, মিশরে আরও নানা দেশে দূত পাঠিয়ে দিল।

উদ্ভিন্নযৌবনা রূপসী রাজকন্যা।

তাই দেশ দেশান্তর থেকে এল বিভিন্ন রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী, তরুণ রাজকুমাররা। আলোকোজ্জ্বল সভাগৃহে বসল স্বয়ম্বরসভা।

ওদিকে প্রসাধন নিপুণা পরিচারিকারা ট্যামারকে চক্রাকারে ঘিরে তাকে মনের মত করে সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অদূরে দণ্ডায়মান দুই মহিষী বড় রাণী আর ছোটরাণীর দিকে কেমন করুণ চোখে তাকিয়ে থাকে ট্যামারা। নিদারুণ একটা যন্ত্রণায় যেন পুড়ে যায় তার বুকের ভেতরটা। ধীরে ধীরে কেমন অসাড় হয়ে আসে তার চেতনা।

দাবদগ্ধ তরুলতার মত যার ভেতরটা পুড়ে অঙ্গার হয়ে গিয়েছে তাকেই মহার্ঘ অলঙ্কারে সালঙ্করা করে তোলা হল। মহিষীদের নির্দেশে তার স্বর্ণলতার মত দীর্ঘ ক্ষীণতনুকে আবৃত করা হল রক্তবর্ণ চীনাংশুকে (চীনা রেশম)। মনে হল একটা রক্তাভ দীপশিখা যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে!

যা আগুনের মত রূপ, অস্ফুটস্বরে বলল, ছোটরাণী, ওর সাজগোজের দরকার কি—

তবুও—তবুও পরিচারিকারা বড় বড় দুটো নীলাভ ডাগর চোখের নীচে কাজলের রেখা টেনে দেয় দীর্ঘ করে। মেহেদি মাখিয়ে রাঙ্গিয়ে তোলে হাত ও পায়ের করতল।

কিন্তু—ট্যামারকে মনে হয় যেন বিসর্জনের প্রতিমা। ভার ভার মুখ। চাপা কান্না থমকে আছে দু'চোখে।

রাণীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

তোর কি হয়েছে বল তো? বড়রাণী বিরক্ত হয়ে বলে, তোর মা নেই। কিন্তু আমরা তো আছি—তার কথাগুলোর ভেতরে যেন তীব্র একটা জ্বালা ফুটে ওঠে।

এসব কি বলছো মা? ক্ষীণ অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে ট্যামার।

তাহলে কেন—তুই—তুই—মুখ গোমড়া করে আছিস দিনের পর দিন, গর্জে উঠল বড়রাণী, আমাদের কাউকে কিছু বলছিস না—

কোন কথাই বলল না ট্যামার।

শুধু তার জলভরা চোখদুটো চিক চিক করতে লাগল।

আরে মনের ভেতরে যদি কোন গোলমাল থাকে, তাহলে দেখবি, বিয়ের পরে সব কর্পূরের মত উবে গিয়েছে, ছোটরাণী আড়চোখে ট্যামারের দিকে তাকায় আর মুখ টিপে টিপে হাসে।

খট-খট খট-অলিন্দে বেজে উঠল দ্রুত পদশব্দ। প্রসাধন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করল সম্রাট। ট্যামারের বেদনার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল, আমার সঙ্গে সভাগৃহে চলো মা। ওঁরা অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করছেন। একটু থেমে সস্নেহে কন্যার মাথায় হাত রেখে বললেন, যে রাজকুমাররা এসেছে তারা প্রত্যেকে তাদের রাজ্যের ভাবী সম্রাট! সম্রাজ্ঞী হয়েই থাকতে পারবি মা, ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে মেয়ের বিষন্ন আর করুণ মূর্তির দিকে তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেমে থেমে একটু যেন লোভ দেখানোর মত করে বলল, তোর পাণিপ্রার্থী হয়ে যারা এসেছে তারা প্রত্যেকে অসাধারণ যুবাপুরুষ। কন্দর্পকান্তি—

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ল ট্যামার। আর আকুল হয়ে কান্না জড়ানো অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল, আমি—আমি—পারবো না বাবা —আমি বিয়ে করতে পারবো না—

কেন—কেন? ফুঁসে উঠল রাণীরা।

আমি তাদের কাউকেই ঠকাতে পারবো না বাবা—কিছুতেই পারবো না তার শেষের দিকের কথাগুলো কান্নার ভেতরে তলিয়ে গেল।

তবুও অগ্রমহিষী হাল ছাড়ে না। সম্রাটকে ঈষৎ চাপা কণ্ঠে বলে, তুমি ওকে জবরদস্তি করেই নিয়ে যাও, একটু থেমে স্বামীর উদ্বিগ্ন আর ব্যথিত মুখের দিকে গুজগুজ করে বলে মনে হয়, বিয়ে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে--

মা—মেয়ে হয়ে তুমি—তুমি বুঝতে পারছো না, মর্মভেদী কণ্ঠে চীৎকার করে বলল ট্যামার, অপবিত্র ফুল দিয়ে দেবতার পূজা হয় না—হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। কেমন উদ্‌ভ্রান্ত আর অপ্রকৃতিস্থ একটা বিচিত্র দৃষ্টি ফুটে উঠল তার সেই নীলাভ দুটো চোখে। আর দুঃসহ কোন দুঃস্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন মানুষের মত ক্ষীণ অস্ফুট কণ্ঠে বলল, আমি—আমি নষ্ট হয়ে গিয়েছি—

ঘরে যেন বাজ পড়ল।

বড়রাণী, ছোটরাণীর দিকে তাকায়। ছোট তাকায় মহারাজার মুখের দিকে। উপস্থিত প্রত্যেকের চোখে চোখে নিঃশব্দে ঘুরতে থাকে একটি প্রশ্ন—

নাগরটি কে?

অন্ধকার নেমে এল সম্রাটের মুখে।

প্যালেস্তাইনের রাজপ্রাসাদের রমণী কুলের ভূষণস্বরূপা, রাজঅন্তঃপুরের শোভা, হাস্যোচ্ছল আর অসামান্য রূপসী রাজকুমারী ট্যামার। সেই অনাঘ্রাত পুষ্পের মত অপাপবিদ্ধ কুমারী কন্যা কেমন করে অপবিত্র হয়ে গিয়েছিল। আর নারী জীবনের দুরপনেয় কলঙ্কের সীমাহীন গ্লানির অপচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল সমস্ত সত্তা—পুরাতন নিয়মের বাইবেলের সেই সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক আর শোকাবহ ঘটনাটির বিবরণে অগ্রসর হওয়ার আগে জানা দরকার, কে সেই প্যালেস্তাইনের একচ্ছত্র অধিপতি প্রবল প্রতাপান্বিত, সম্রাট এবং দুর্ভাগিনী ট্যামারের পিতা? আরও জানা প্রয়োজন, সেই অকল্পনীয় এবং ন্যক্কারজনক দুর্ঘটনার নেপথ্যের ইতিবৃত্ত! একথা তো অনস্বীকার্য, প্রত্যেকটি ঘটনার

আড়ালে থাকে অনেক—অনেক জটিল কার্যকারণ, যার সূত্র লোকচক্ষুর অগোচরে ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে আর সেগুলোই নিঃশব্দে কালক্রমে হয়ে ওঠে পুঞ্জীভূত বারুদের স্তূপ। তারপর—

তারপর একদিন কোন তুচ্ছ কারণে ঘটে যায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। সেই ভয়াবহ বিধ্বংসী ঘটনাটুকু ভিত্তি করেই সাধারণত বাদী ও বিবাদীর বিচার করা হয়ে থাকে কিন্তু—কেন, কোন পরিস্থিতিতে মানুষ গভীর পাপের অন্ধকারে তলিয়ে যায় প্রায়ই সেসব খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে দোষী সাব্যস্ত করা হয় না।

কেন সম্রাটের মুখখানা কালো হয়ে গিয়েছিল। শুধুই কি কুমারীকন্যার পদস্খলনের জন্যই তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন। আর স্বয়ং মহারাজার যে নয়নের মণি, এবং রাজপ্রাসাদের প্রতিটি মানুষের প্রিয়, তার চরম সর্বনাশ করতে পারে, কার থাকতে পারে এত বড় দুঃসাহস?

এই কাহিনীর সম্রাটের সঙ্গে বর্তমান গ্রন্থের পাঠক-পাঠিকাদের বিলক্ষণ পরিচয় আছে।

যিনি বাইবেলের শ্রেষ্ঠ আদর্শ নৃপতি, ন্যায়নিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ, অসাধারণ সাহসী ও রণনিপুণ যোদ্ধা, আবার যিনি উদ্দীপ্ত আবেগপ্রবণ কিন্তু বিনয়ী নম্র এবং ক্ষমাশীল আর গভীরভাবে জীহোভা বা সদাপ্রভু ঈশ্বরে বিশ্বাসী ইত্যাদি অনেক মহৎ ও সৎ গুণে ভূষিত হয়েও যিনি হয়ে গিয়েছিলেন হিনিয়াস সিনার বা ঘোরতর পাপী? যিনি বহু দেশ জয় করেও জয় করতে পারেন নি তার দুর্নিবার প্রথম রিপুটিকে—তিনিই অনেক অনেক সুকৃতি ও দুষ্কৃতির মহানায়ক—

ডেভিড!

ডেভিডের জ্যেষ্ঠপুত্র অ্যামনন। জেজরিলের সেই রূপসী রমণী, সলের ভূতপূর্ব মহিষী, আহিমন যাকে ডেভিড বিবাহ করেছিল (এই বৃত্তান্তও আগে বলা হয়েছে) তার গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ রাজকুমার। আর এক মহিষী অ্যাবিগেলরও হয়েছিল সবল, সুন্দর এক পুত্র চিলেয়ার। কিন্তু বাল্যকালেই তার মৃত্যু হয়। তারপরেই প্রয়াত মহিষী ঘেসুর নৃপতির কন্যা ম্যাকাও তাকে উপহার দিয়েছিল দুই পুত্র—অ্যাবাস্যালোম এবং অ্যাডোনিজাহ। আর দিয়েছিল প্রস্ফুটিত পুষ্পকোরকের মত সুন্দর ফুটফুটে একটি কন্যা—ট্যামার।

অ্যামননের না ছিল ডেভিডের মত দৃঢ় পৌরুষদৃপ্ত সেই অনিন্দ্যসুন্দর দিব্য কান্তি, না ছিল সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর জনগণের নেতৃত্ব করার সেই দক্ষতাও তার ছিল না। কোন গুণই তার ছিল না। তবুও—

তবুও এই নির্গুণ পুত্রটিকে-ই ডেভিড তার সিংহাসনের ভবিষ্যত উত্তরাধি-

কারী মনোনীত করেছিল। করেছিল, দুইটি কারণে। প্রথমত বড় ছেলে। প্রথম পুত্র তাই ডেভিডের ছিল তার প্রতি অন্ধ স্নেহ। আর দ্বিতীয়ত ডেভিড ন্যায়ের বিচারক, জীহোভার অনুশাসনের পরম নিষ্ঠাবান অনুগামী বলেই জন্মপুত্রে জ্যেষ্ঠ বলে অ্যামনন যে অধিকার পেয়েছে, সেই ন্যায্য দাবী থেকে কেন তাকে বঞ্চিত করবে।

পুরাতন পদ্ধতির বাইবেলে বলছে—রাজরাজড়াদের বংশের ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যায় উত্তরসূরী নির্বাচনে বিধাতা প্রায়ই নিষ্ঠুর পরিহাস করে তৃপ্তি পেয়ে থাকেন।

ডেভিড তার পরে যাকে প্যালেস্টাইনের নৃপতি নির্বাচিত করেছিল তার কিন্তু কোন যোগ্যতাই ছিল না। কিন্তু প্রকৃতি বা ঈশ্বর যাকে ডেভিডের সমস্ত সদগুণ উজাড় করে দিয়েছিলেন সে হল অ্যাবাস্যালোম। অবিকল ডেভিডের মত অসাধারণ সুপুরুষ এবং সুদর্শন চেহারা। সেই সিংহের কেশরের মত স্ফীত স্বর্ণাভ কেশরাশি সেই খড়্গের মত উন্নত এবং বক্র নাকটির দুই পাশে কিসের যেন প্রেরণায় উদ্দীপ্ত দুইটি বড় বড় চোখ।

ডেভিড যেন তার ভেতরে তার নিজেরই প্রথম যৌবনের চেহারার আদল খুঁজে পায়। তার মনে হয়, অ্যাবাস্যালোম যেন তারই মত উচ্চাকাঙ্খার ঘোড়ায় চড়ে প্রেরণার চাবুক হাতে নিয়ে ছুটছে উদ্দাম গতিতে। তার চালচলনে স্বভাবের ভেতরে সেই উদ্দাম অস্থিরতাকে যেন একটু ভয়ই পায় ডেভিড। এই পুত্রটির মধ্যে যেন সে দূরকালে তারই এক শক্তিধর প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখতে পায়। তাই—

হয়তো তাই ডেভিড তার অধীনস্থ বিভিন্ন দেশের কর হিসেবে এবং নানা দেশ জয় করতে গিয়ে যে রাশি রাশি মেষ তার হস্তগত হয়েছিল, তারই কিছু দিয়ে অ্যাবাস্যালোমকে পাঠিয়ে দিয়েছিল জেরুজ্যালেম থেকে পনের মাইল উত্তরে এফ্রেমের অন্তর্গত এক সমৃদ্ধ জনপদ বলহাজোরে! কিন্তু—

ডেভিড যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি ন্যায়পরায়ণ। আর শুধু অ্যাবাস্যালোমকে দিলে অবিচার হবে বলে প্রত্যেক ছেলেকে সমান ভাগ করে মেষের পাল দিয়েছিল। আর অ্যাবাস্যালোম যাতে কোনরকম সন্দেহ না করে, তাই তাকে বলেছিল, বলহাজোর জায়গাটির জলবায়ু ভালো—তোমার স্বাস্থ্যের উন্নতিও হবে আর এফ্রেমের প্রজাদের ভেতরে কিছু লোক আছে, যারা আমার বিরুদ্ধবাদী তাদেরও গতিবিধির দিকে লক্ষ্য রাখা হবে।—

কেন, যে প্যালেস্টাইনের ভবিষ্যৎ সম্রাট তাকে বলহাজোরে পাঠালেই তো

হয়। সে এখানে কোন রাজকার্যটা করছে শুনি—দিনরাত মদ গিলছে আর—আরও অনেক কটু কথার ঝড় অ্যাবাস্যালোমের মনের ভেতরে দারুণ আলোড়ন তুলেছিল কিন্তু—

বলল না। কী লাভ বলে। সে জানে, ওই অপদার্থটার ওপরে বাবার অন্ধ স্নেহের গভীরতায় এতটুকু ঘাটতি পড়বে না। মাঝখান থেকে শুধু অশান্তি সহ্য করতে হবে! ভেতরে ভেতরে জলে যেতে যেতে বলল, কবে যেতে হবে বলুন

যাবি গ্রামে স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে, হো হো করে হেসে চারিদিকের আড়ষ্টতাকে মুহূর্তে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়ে নিপুণ অভিনেতার মত ছেলের পিঠ চাপড়ে বলল ডেভিড, তোর সুবিধামত একটা শুভদিন দেখে চলে যা—

রাজপরিবারের ভেতরে যে মানুষটির ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সম্পদ প্রচ্ছন্ন ছিল বলে ডেভিডের মনে হয়েছিল তাকেই এমনি সুকৌশলে এবং সসম্মানে রাজপ্রাসাদের তথা জেরুজ্যালেমের চৌহদ্দি থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল।

তা না-হলে তার সহোদরা এবং তার বুকের ভেতরে প্রাণের ধুকধুকির মত প্রিয় ট্যামারের এই নিদারুণ বিপর্যয়ে সে উপস্থিত থাকলে যে কী প্রলয়ঙ্করী কাণ্ড ঘটত তা কল্পনাও করা যায় না।

ট্যামার ভ্রষ্টা হয়েছে—তার নিজের মুখেই এই স্বীকারোক্তি শুনে প্রথমেই ডেভিড অ্যাবাস্যালোম উপস্থিত এখানে নেই বলে মনে মনে সেই সদাপ্রভু অনন্ত শক্তিমান জীহোভাকে সহস্র প্রণাম জানালো। আর তার পরেই স্মরণের বায়ুতরঙ্গকে আশ্রয় করে বহু-বহু বছরের ব্যবধানকে এড়িয়ে ভেসে এল প্রধান পুরোহিত স্যামুয়েলের সেই নিরুদ্ধ ক্রোধে উচ্চারিত অভিশাপের কথাগুলো—তোমার এই পাপ (পরস্ত্রী বাথসেবার সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হওয়ার সেই ইতিবৃত্ত ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে) তোমার সন্তান সন্ততিদের রক্তে সঞ্চারিত হবে।

সেই বিস্মিত বিমূঢ় মহিষীদের আর নারীজীবনের গভীর কলঙ্কের পঙ্কে নিমজ্জিত সেই সুরূপা কুমারীকন্যার সম্মুখে আর দাঁড়াতে পারল না ডেভিড। তার মাথার ভেতরটা ঝিম ঝিম করতে লাগল। উত্তপ্ত হয়ে উঠল কানের পিঠদুটো। আর দাবাগ্নি তাড়িত একটা ভয়ার্ত মাতঙ্গের মত ঝড়ের গতিতে সেই প্রসাধন কক্ষ পরিত্যাগ করে চলে গেল তার শয়নকক্ষে।

পাপ-পাপ-সব তার পাপ! তারই রক্তের বিষে তার ফুলের মত ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটির জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল, এই কথাগুলোই তার বুকের ভেতরে মর্মান্তিক

হাহাকারের মত বেজে যেতে লাগল। আর তার মস্তিষ্কের কোষে কোষে ধীয়ে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল একটা তীব্র জ্বালা—জীহোভার অমোঘ বিধানেই হয়তো এসেছে এই বিপর্যয়। কিন্তু তাঁর-ই সবচেয়ে আদরের মেয়ের এত বড় সর্বনাশ কে করল—এই কল্পনাতীত দুঃসাহস কার হয়েছিল—কার হতে পারে ?

আবার মনে হল—মনে হল ট্যামারের তন্বী দেহে বিশ বছরের উথাল পাতাল যৌবন। এই সময়ের পরিধিতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। কত রাজকন্যা ভালবেসে বিপুল সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আর অপরিমেয় ঐশ্বর্য ছেড়ে পথের ধুলোয় নেমে এসেছে! অতি—অতি সামান্য আর নগণ্য কোন সৈনিক কি কোন সাধারণ কর্মচারী এমন কি তুচ্ছ একটা পরিচারকের গলায় বরমাল্য দিয়ে রাজকীয় পরিচযটাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

রাজপ্রাসাদেরই কোন তরুণ যুবার প্রতি কি প্রণয়াসক্ত হয়েছে ট্যামার ? কিন্তু—কিন্তু তাহলে তো তাকে বিবাহ করার জন্য অনুমতি প্রার্থণা করতো, কেন কেন বলবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে—পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত অস্থির ভাবে পায়চারী করতে লাগল ডেভিড।

ধীর পায়ে কক্ষে প্রবেশ করল তার বিশ্বস্ত রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক বেনাই। তার বহু-বহু সৎ অসৎ কর্মের অনুচর। এই সময়ে একমাত্র সেই পাবে অনুমতি না নিয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ডেভিডের খাসকক্ষে প্রবেশ করতে।

প্রবেশদ্বারের পাশে শ্বেতপাথরের নির্মিত এক নগ্ন রমণীমূর্তির আড়ালে অন্ধকারে নিজেকে মিশিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হল—মনে হল—তার প্রভুর যেন একদিনেই দশ বছর বয়স বেড়ে গিয়েছে! গালের ওপরের হাড়দুটো উঁচু হয়ে উঠেছে। চোখের নীচে গভীর কালির দাগে দুশ্চিন্তার চিহ্ন রচনা করেছে অমন দুর্দান্ত দাপটের মানুষটাকে কেমন একটা অসহায় শিশুর মত মনে হচ্ছে। তার মনে হল, প্রভুর বুকের ভেতরে নিঃশব্দ একটা কান্না উত্তাল হয়ে উঠেছে।

এই অবস্থায় কি দুঃসংবাদটা জানানো সমীচিন হবে ? কিন্তু প্রভুর কঠোর হুকুম, রাজপ্রাসাদের তথা অন্তঃপুরের যে কোন জরুরী খবর তার কর্ণগোচর করতে হবে। তাই কি করবে সে—কি করতে পারে।

আবার মনে হল, ওই অশুভ খবরটা থেকে তো প্রভু তার ক্ষুরধার বুদ্ধি দিয়ে সেই রহস্য সমাধানের কোন সূত্রও পেয়ে যেতে পারেন—

প্রভু, একটা কথা বলবো, ক্ষীণ অস্পষ্ট কণ্ঠে বেনাই বলল।

কে—বেনাই—বলো, ডুবন্ত মানুষের মত যেন জলের অতল থেকে বলল ডেভিড।

মধ্যম রাজকুমারের (অ্যাবাসালোম) মহলের পরিচারক আর ক্রীতদাসরা বলাবলি করছিল—

কি কি বলছিল, উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে লাগল ডেভিড।

বলছিল। থেমে থেমে ভয়ে ভয়ে বলল বেনাই, রাজকুমারীর এই সর্বনাশের জন্য আপনি-ই দায়ী!

কী—মর্মভেদী কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল ডেভিড।

আমি-আমি-দায়ী-আমি-আমার জন্যই ট্যামার, দুহাতে বুক চেপে বদ্ধ উন্মাদের মত আর্তনাদ করে তীরের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এইবার ডেভিডের রাজপ্রাসাদের বিভিন্ন বিচিত্র কারুকার্যমণ্ডিত বিভিন্ন সৌধ এবং সেখানকার বাসিন্দাদের রাজকীয় নির্দেশ অনুযায়ী দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার কথা না বললে ট্যামারের সর্বনাশা সেই দুর্ঘটনার নেপথ্যের কার্যকারণ বা সূত্রগুলি অনুধাবন করা যাবে না।

পুণ্যনগরের কেন্দ্রস্থলে জিয়ন পাহাড়ের ওপরে এক বিস্তীর্ণ সমতল ভূমির ওপরে জেরুজ্যালেমের রাজপুরী। এই সম্পূর্ণ ভূমি উচ্চ পাষাণ প্রাচীর বেষ্টিত। দক্ষিণদিকে প্রধান রাজপথের ওপরেই কারুকার্য শোভিত উচ্চ পাষাণ তোরণ।

এই তোরণ উত্তীর্ণ হলেই ফিনিসীয় কারুকার্যে শোভিত বহু স্তম্ভযুক্ত দ্বিতল সভাগৃহ। তারপরেই প্রাসাদের পর প্রাসাদ—কোনটা অলঙ্কারগৃহ কোনটা দেবগৃহ কোনটি চিত্রভবন—আবার কোনটি শিল্পশালা। পাঠক পাঠিকাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, ডেভিডের যেমন অসাধারণ রণনৈপুণ্য তেমনি ছিল তার গভীর শিল্পরুচি। তাই তার বিজিত দেশগুলির শিল্পভাস্করের অনবদ্য নিদর্শনের সংগ্রহ এই প্রাসাদে থরে থরে সাজিয়ে রেখেছিল সে।

সেই শিল্পশালার পরেই ম্যাগনেটো গোলাপ এবং নানাবর্ণের ফুলের সমারোহ ভরা এক প্রশস্ত উদ্যান। এইখানেই বলা দরকার, শুধু রাজপ্রাসাদ নয়, সমগ্র জেরুজ্যালেমের প্রতিটি সৌধ, ডেভিডের নির্দেশে তৈরি করেছিল ফিনিসীয় স্থপতি, আর কারুশিল্পীরা। বন্ধু রাষ্ট্র ফিনিসীয় নৃপতি হিরামের নির্দেশে ভূমধ্যসাগরের নীলজল পাড়ি দিয়ে যেমন হাজার হাজার সুদক্ষ, কারুশিল্পী, রাজমিস্ত্রী তেমনি এসেছিল লেবাননের অরণ্যের চিরহরিৎ বৃহৎ বৃক্ষের রাশি রাশি রক্তবর্ণ সুগন্ধী কাঠ এবং সৌধনির্মাণের বিবিধ উপকরণের বিপুল সম্ভার। সে সব বৃত্তান্ত এখানে অবান্তর।

সেই উদ্যানের মাঝখানে শোভা পাচ্ছে সেই রক্তবর্ণ সুগন্ধী দারুনির্মিত

একটি বিচিত্র ত্রিতল প্রাসাদ। এই প্রাসাদেরই দ্বিতলের ঠিক মাঝখানের একটি সুরম্য কক্ষে বাস করে স্বয়ং সম্রাট ডেভিড। আর প্রথমতল ও ত্রিতলের সারি সারি এক একটি প্রকোষ্ঠে এক একজন মহিষী আর রূপসী উপপত্নীরা।

ডেভিডের সেই প্রাসাদের পরেই একটি সংকীর্ণ কিন্তু গভীর জলপূর্ণ পরিখা। সেই পরিখার ওপারে কারুশিল্পমণ্ডিত উচ্চশীর্ষ তিনটি সারি সারি সুরম্য প্রাসাদ! প্রথমটি জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র অ্যামননের। তার পরেরটি অ্যাবাস্থালোমের, আর শেষেরটি অ্যাডোনিজার।

সাবালক রাজপুত্রদের মহল। বলাবাহুল্য প্রতিটি প্রাসাদ দাসদাসী, সুপকার, মালিতে পরিপূর্ণ এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশাল রাজপ্রাসাদের মত এবং বিলাস ব্যসনের অপর্যাপ্ত উপকরণে সুসজ্জিত। প্রত্যেকটি সৌধ পাষাণ প্রাচীর বেষ্টিত আর প্রতিটি সৌধের প্রাচীরে আছে অপেক্ষাকৃত অপরিসর একটি তোরণদ্বার। এই দ্বার দিয়ে পরের প্রাসাদটিতে যাওয়া যায়। কিন্তু দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী দিবানিশি সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত।

ডেভিডের কঠোর আদেশ, কোন উৎসবে, বা কোন জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত রাজপুত্রেরা পরস্পরের আবাসে অবাধে যাতায়াত করবে না।

কেন সেই অদ্ভুত হুকুম, সেই সম্বন্ধে পুরাতন বাইবেলে আছে, হয়তো ডেভিডের মনে ছিল আশঙ্কা, পুত্ররা যে-কোন সময় তার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে। আর পারস্পরিক সৌহার্দ্য থাকলে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র বা জনমত করতে সুবিধা হয়। কিন্তু ধূর্ত সম্রাট তাদের মুখে হেসে হেসে বলতো তোমরা নিজেদের প্রাসাদে এক একটি খুদে সম্রাটের মত বাস করবে! কী দরকার তোমাদের অন্যের ব্যাপারে নাক গলাবার।

অ্যামনন কিছু বলেনি কখনো।

অ্যাডোনিজাও পিতার আদেশ শিরোধার্য করেছিল। কিন্তু শুনত না একজন। যে স্পষ্ট প্রতিবাদ করে বলতো, আমরা বৈমাত্রেয় হলেও ভাই তো। আমরা পরস্পর মেলামেশা করতে হলে আপনার অনুমতি নিতে হবে—একী রকম? আবার থেমে থেমে দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলতো, আমাদের কী স্বাধীন সত্বা বলে কিছু নেই।

এই রাজপুত্রটি আর কেউ নয় অ্যাবাস্থালোম।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, যুদ্ধবিদ্যায় অসাধারণ নৈপুণ্য, নেতৃত্বে সহজাত দক্ষতা থাকা সত্বেও সে সিংহাসনের অধিকার থেকে ভবিষ্যতে বঞ্চিত হবে বলে

ডেভিডের এবং অপদার্থ অগ্রজ অ্যামননের বিরুদ্ধে সে তীব্র বিদ্বেষ পোষণ-করতো। নিশ্চয়ই পুত্রের এই মনোভাব জানতো বলেই তাকে রাজপ্রাসাদের এলাকা থেকে সরিয়ে দিয়ে নিরঙ্কুশ হতে চেয়েছিল ডেভিড।

যাই করুক। আর ডেভিড যত বুদ্ধিমানই হোক। প্রকৃতির নিয়মেই যে প্রদীপের নীচে জমে ওঠে অন্ধকার! রাজপুত্ররা এক একজন বিপুল সম্মানিত রাজবন্দীর মত রাজকীয় বিলাসীতায় সুরম্য প্রাসাদে বাস করে। দু-একজন আবলুস কাঠের মত ঘোরতর কৃষ্ণকায়া হৃষ্টপুষ্ট বাঘিনীর মত পরিচারিকা ছাড়া আর কোন রমণীর ছায়া পযন্ত দেখতে পায় না।

কিন্তু দূরে সেই পরিখার ওপরে অতিকায় সেই সম্রাটের রক্ত প্রস্তরে নির্মিত প্রাসাদের মত রক্তবর্ণ দারুনির্মিত প্রতিটি প্রকোষ্ঠে, অলিন্দে দেখা যায় শত শত খরযৌবনা তন্বী রমণীর সঞ্চরমান ছায়ামূর্তি। সেখানে সাম্প্রতিককালে বিবাহিত তরুণী মহিষী; রূপসী উপপত্নী, রাজকুমারী সুবেশা সুযৌবনা ক্রীতদাসী সব মিলিয়ে রূপের হাট। যৌবনের মেলা। তাই—

অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তরুণ রাজপুত্রদের রক্তে রক্তে বহমান সেই নারীসঙ্গলিপ্সা আরও তীব্র, আরও দুর্নিবার হয়ে উঠেছিল। তারা আকুল হয়ে কামনা করতো কবে—কবে আসবে বসন্ত সমাগমে পেরিম উৎসব কিম্বা কবে পিতৃদেবের পরিচালনায় জীহোভার থানে উপাসনার দিন! এই দুইটি—মাত্র এই দুইটি দিন তাদের প্রাসাদ নারীকণ্ঠের কলরোলে আর জলতরঙ্গের মত মিষ্টি হাসির শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে।

উৎসবের কাল যেই শেষ হয়ে যায়, অমনি আবার অভিশপ্ত শূন্যতায় খাঁ খাঁ করতে থাকে তাদের প্রাসাদ। কিন্তু—

দৈবাৎ যদি কোন রাজপুত্র অসুস্থ হয়ে পড়ে। তবে শুধু তার জননী এবং কোন কোন রাজকুমারী আসতে পারে তার প্রাসাদে।

রাজপুত্রদের এই প্রায় নির্বাসিত বিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রার জন্য অত্যন্ত বেদনা বোধ করতো তাদের গর্ভধারিণীরা এবং বৈমাত্রেয় ভগিনী অর্থাৎ রাজকুমারীরা তারা অনেকেই তোরণদ্বারে সশস্ত্র প্রহরীদের উৎকোচে বশীভূত করে প্রায়ই চলে যেত রাজপুত্রদের মহলে।

সবচাইতে বেশি আসতো ট্যামার। সে তার অগ্রজদের প্রাসাদে আসতো মধ্য দ্বিপ্রহরের নির্জনতায় আসতো আসন্ন সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে। আর এলেই বরষার নতুন জলের আহ্লাদের মত কল কল করে অফুরন্ত কথার তোড়ে

আর মিহি গলার খিলখিল হাসিতে মোহাচ্ছন্ন করে তুলতো সেই প্রাসাদের কক্ষ পরিবেশ।

আচ্ছা! দাদা, তুমি দিনরাত এত মদ খাও কেন বলো তো, কলকল করে বলে ট্যামার! আবার যেন বাতাসে পা ফেলে চলে যায় দূরে। যেখানে দেওয়ালে ফিনিসীয় শিল্পীর নিপুণ হাতে অঙ্কিত এক হিংস্র ব্যাঘ্রের ছবি জলজল করছে সেখানে কয়েকদণ্ড দাঁড়িয়ে আলতো হাতে ছবিটির ধুলো মুছতে মুছতে উচ্চকিত কণ্ঠে বলে, তুমি কি বলো তো দাদা—তোমার মহলে তো ক্রীতদাস খিদমদগারের অভাব নেই—তাদের একটু বলে এসব করিয়ে নিতে পারোনা? বলতে বলতে হঠাৎ যেন ডানায় ভর করেই উড়ে চলে আসে একেবারে দাদার শয্যারকাছে। আর তার নেশাচ্ছন্ন নিমীলিত দুটো চোখের দিকে তাকিয়েই পাগড়ভাঙ্গা জলপ্রপাতের মত শব্দ করে হেসে ওঠে বলে কি ব্যাপার, রাজপুত্তুরের কি ঘুমের জড়তা এখনো কাটে নি?

অ্যামনন কথা বলে না।

তার মনে হয়,—মনে হয় যেন একটা রঙীন প্রজাপতি ফুল-পরাগের মধু পান করে একবার এখানে বসে, আবার আবেশে উড়ে উড়ে তার প্রকোষ্ঠের চারদিকে একটা মিষ্টি সৌরভ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

একী! দেখি—দেখি—মেষচর্মে আবার এসব কি হিজিবিজি লিখেছ বলেই বালিশের নীচ থেকে উঁকি দেওয়া কোষ্ঠির মত দীর্ঘ পার্চমেন্টটা খস্ করে টেনে নিয়ে ট্যামার খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল। হাসির দমক কমে এলে বলল, তুমি আবার পদ্য-টদ্য লিখতে শুরু করলে কবে থেকে?

এই ট্যামার দিয়ে দে বলছি—ভাল্লো হবে না বলছি—জড়িত অস্পষ্ট কণ্ঠে বলতে বলতেই বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে টলে পড়ে গেল অ্যামনন। ট্যামার ততক্ষণে প্রকোষ্ঠের এককোণে যেখানে সাদা পাথরে বাঁধানো বেদীর ওপরে থরে থরে সাজানো আছে প্রসাধন সামগ্রী তার ওপরে দাঁড়িয়ে মধুর কণ্ঠে আবৃত্তি করতে লাগল বৈমাত্রেয় দাদা অ্যামননের রচিত—কে জানে; কোন অজানা রূপসী রমণীর প্রতি প্রণয়োচ্ছ্বাসের কবিতা—

> ওগো আমার প্রেয়সী,
> কী সুন্দর তোমার কান্তি,
> তোমার তনুদেহের গড়নে কোথাও নেই কোন ভ্রান্তি।
> নীলাভ পাদুকায় আবৃত তোমার পদযুগল,
> যেন নীলসায়রে ভাসমান দুইটি স্বর্ণকমল।

এসা তুমি কোন মেয়েকে উদ্দেশ্য করে লিখেছো দাদা ?

কোন কথা নেই অ্যামননের মুখে।

সে দুই হাঁটুর ভেতরে মাথাটা ঝুলিয়ে বসে থাকে সেই ইস্পাহানী রেশমের চাদরে আবৃত শয্যার ওপরে। তার সেই অদ্ভুত আচরণে এতটুকু ভ্রূক্ষেপ না করে জড়বৎ মূর্তিটাকে প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকি দিয়ে কী একটা বলতে যেতেই—

কি রে দুই ভাইবোনে কিসের এত গল্প হচ্ছে, অ্যামননের জননী, অগ্রমহিষী আহিমন আসে।

তুমি যে কী বলো মা—ওর কি চেতন অচেতন বোধ কিছু আছে, স্ফটিক পাত্রে সুগন্ধী সিরাজীর দিকে ইঙ্গিত করে বলে ট্যামার।

ব্যথার ছায়া ফুটে উঠে আহিমনের মুখে।

আস্তে আস্তে বলে তোকে কতদিন কতবার বলেছি, বাবার সঙ্গে সঙ্গে থেকে কাজকর্মো একটু বুঝে সুজে নে—তোকে তিনি অসম্ভব ভালবাসেন—তার পরে তুই বসবি প্যালেস্তাইনের—

কানের কাছে ভ্যাজর ভ্যাজর করো না করো না বলছি, যেন অবরুদ্ধ কোন যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল অ্যামনন, বাবাকে তুমি চেন না—তার কোন কাজে একটি প্রাণীকেও যে নাক গলাতে দেন না—ত তুমি জানো না ?

তাদের অলক্ষ্যে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় ট্যামার।

অন্ধকার সংকীর্ণ পথ পেরিয়ে আসে তার সহোদর অ্যাবাসালোমের প্রাসাদে। রক্তবর্ণ পাথরে বাঁধানো অঙ্গনে পা দিতেই তার মামাবাড়ির দেশের পরিচারক পরিচারিকারা তাকে চক্রাকারে ঘিরে ধরল। তারা অন্তরঙ্গ কণ্ঠে বলতে লাগল।

তুমি থাকতে আমাদের দাদাবাবুকে মহারাজ দূরে পাঠিয়ে দিলেন। তুমি বললে, মহারাজ কিছুতেই পাঠাতে পারতেন না—

তোরা এবার থামবি, স্নিগ্ধ গম্ভীরকণ্ঠে বলল ট্যামার, তোরা কি মনে করিস, দাদার জন্য আমার মন খারাপ হয় না ? একটু থেমে যেন দুঃস্বপ্নের ঘোরে বিড় বিড় করে বলল, বাবা একবার যা সঙ্কল্প করবেন কেউ তা থেকে নিরস্ত করতে পারবে না। দূরে দ্বিতলে অ্যাবাসালোমের বন্ধ প্রকোষ্ঠের দিকে তাকিয়ে তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করল। আর একটিও কথা না বলে মাথা নীচু করে বেরিয়ে এল।

এবার এল কনিষ্ঠ সহোদর অ্যাডোনিজার প্রাসাদে।

দেখেছিস—দিদি কত বড় একটা চিতাবাঘ শিকার করেছি—দূর থেকে একটা উল্লসিত কণ্ঠস্বর আছড়ে পড়ল বাতাসে।

বিশাল প্রাঙ্গণের মাঝখানে মস্ত বড় এক চিতাবাঘের দেহটা লুটিয়ে পড়ে রয়েছে। তার গর্বিত চোখমুখের দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হেসে বলল ট্যামার তুই-ই সবচাইতে ভালো আছিস—দিনরাত বনে বাদাড়ে বন্য জন্তুর পিছে পিছে ঘুরছিস—

কি করবো দিদি, তোরা কেউ আমাদের এদিকে আসিস না—বলতে বলতে তীব্র ব্যথায় কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এল অ্যাডোনিজার।

আমাদের কি আর আসতে ইচ্ছা করে না ভাই, পরম স্নেহে তাকে জড়িয়ে ধরে ভাব ভার গলায় ট্যামার বলে। জানিস না—রাজাদেশ—

চুপ করে যায় অ্যাডোনিজা।

দূরে রোদজ্বলা নীল আকাশের গায়ে আঁকা অতিকায় ঘাতকের মত সেই জায়ন পাহাড়ের চূড়োটার দিকে তাকিয়ে ট্যামারের মনে হয়—মনে হয়, তারা সবাই রাজপুরীর প্রত্যেকটি প্রাণী বিশাল একটা অদৃশ্য কারাগারে বন্দী।

নিষিদ্ধ এলাকায় বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়, মনে করে যেই সংকীর্ণ পথ অতিক্রম করে জ্যেষ্ঠাগ্রজের প্রাসাদের সম্মুখ দিয়ে হন হন করে চলেছে এমন সময় চারিদিকের সেই নির্জনতার ভেতরে ফুলের মত ফুটে উঠল একটি স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর—তুই ইচ্ছে করলে তোর দাদাকে সৎ ও সুস্থ জীবনের ভেতরে নিয়ে যেতে পারিস মা—আহিমনের কথাগুলো কেমন কান্নার মত শোনায়।

তোমরা কি বলো তো মা—আমি বললে বড়দা মদ খাওয়া ছেড়ে দেবে, মেজদাকে বেলহাজোরে কিছুতে পাঠাতে পারতো না, আমি বললে যন্ত্রণায় জ্বলে পুড়ে এই কথাগুলো চীৎকার করে বলতে চেয়েছিল ট্যামার। কিন্তু কিছুই বলল না। কী লাভ বলে? স্বয়ং সম্রাট যে তাকে বেশি ভালবাসেন সেই হিংসাতেই মা নিশিদিন জর্জরিত হয়ে থাকেন—

মহিষী এবং রাজকন্যার এই গোপন পরিদর্শনের কথা বলাবাহুল্য কখনো জানতো না ডেভিড। ট্যামারের সর্বনাশের জন্য সে দায়ী একথাটা উঠেছে অ্যাবাশ্যালোমের মহলে। আর তার মাথার ভেতরে আগুনের ঝড় বয়ে যেতে লাগল। আর সে মত্ত একটা মাতঙ্গের মত এল মধ্যম রাজপুত্রের প্রাসাদে।

বলো—কে বলেছো—তোমরা, রক্তবর্ণ দুটো চোখে আগুন ঝরিয়ে কর্কশ-

কণ্ঠে বলল ডেভিড প্রাসাদের দাসদাসীদের, তোমরা চুপ করে থাকলে তোমাদের প্রত্যেককে শূলে দেব—

তারা কেউ কথা বলল না।

কয়েকমুহূর্ত পর। ঘেমুরের বৃদ্ধ এক ক্রীতদাস যে ট্যামারের মা ম্যাকাকে শৈশবে লালনপালন করেছিল এবং ম্যাকার সঙ্গে এসেছিল এখানে। সে বলল প্রভু যদি কোন অপরাধ না নেন তো বলি, আপনার হয়তো স্মরণ নেই, জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের অসুখের সময় আপনি একদিন ট্যামার মাকে তার ঘরে যেয়ে সেবা-শুশ্রূষা করতে আদেশ—

কী, মর্মান্তিক যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল ডেভিড। তুমি—তুমি কি বলতে চাও। অ্যামনন—না—না কিছুতেই না— অগ্নিদগ্ধ একটা সরীসৃপের মত ছটফট করে ছুটে চলে গেল।

আশ্চর্য ডেভিড বিশ্বাস করেনি যেমন তেমনি কখনও আদরের পুত্রকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রকৃত অপরাধী কি না কিম্বা আর কে এই জঘন্য অপরাধের সঙ্গে জড়িত—এই প্রসঙ্গে আর কোন উচ্চবাচ্যই করল না। বেশি নাড়াচাড়া করলে পারিবারিক কলঙ্ক রাজপ্রাসাদের পরিধি ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়বে দেশের চারিদিকে। কিন্তু—

স্ত্রীলোকসংক্রান্ত অপঘটনের কথা বাতাসে রটে। দূরদূরান্তের গ্রাম গঞ্জ থেকে তীর্থযাত্রীরা জেরুজ্যালেমে আসে। পুণ্য সঞ্চয় করতে এসে তারা শোনে রাজবাড়ির কেচ্ছার সেই মুখরোচক বৃত্তান্ত। তারা আবার গ্রামে ফিরে যেয়ে দ্রাক্ষাক্ষেতে কি খামারে বসে বেশ রসিয়ে পল্লবিত করে বলে সেই কলঙ্কের কাহিনী। কিন্তু—

কি সেই ঘটনা? প্রকৃতপক্ষে কি হয়েছিল ট্যামারের?

সেই অকল্পনীয় দুর্ঘটনা ঠিক যেমন আছে পুরাতন পদ্ধতির বাইবেলে তেমনি এখানে বলা হল—

অ্যামনন তার পিতার কোন সদগুণ না পেলেও তার রক্তে কিন্তু—সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল পিতৃচরিত্রের সেই মারাত্মক নিন্দনীয় দোষ—

যৌনকামনা।

বাইবেল বলেছে অ্যামনন হ্যাড অ্যান ইনস্যাশিয়েবল সেকসুয়্যাল অ্যাপেটাইট। অর্থাৎ অ্যামননের ছিল চির অতৃপ্ত সেই উদগ্র যৌনক্ষুধা।

দুর্ঘটনার ঠিক এক সপ্তাহ আগে তার শয়নকক্ষে সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে এসেছিল

এক যুবাপুরুষ। প্রায় তারই সমবয়সী! খর্বাকৃতি। কোটরগত চোখদুটো সাপের জিভের মত চিকচিক করছে।

সে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে ঠিক যেমন ট্যামার দেখেছিল তেমনি সে-ও দেখতে পেল, শয্যার চারিদিকে মেষচর্মের লিপি ছড়িয়ে রয়েছে। তাতে লেখা আছে—

তোমার জানুযুগল যেন দুটো স্বর্ণতরু,
আহা তুমি কী অনুপমা।
আর তোমার বর্তুলাকার নাভিকুণ্ডলী,
সত্যিই অতুলনীয় সেখানকার সিরাজী।
তোমার সোনার বরণ উদর যেন সুপক্ক গমের স্তূপ
আহা তার চারিদিকে লিলি ফুলের কী শোভা।
আর তোমার সুপুষ্ট, ও উদ্ধত দুইটি স্তন,
আহা ঠিক যেন দুইটি মৃগশিশু—

এসব কি করেছিস তুই? নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন বন্ধুবরকে টেনে বিছানা থেকে তুলে সে মেষচর্মের লিপিটা তার চোখের সামনে তুলে ধরে বলল, কোন যুবতীর দেহের ধ্যান করছিস?

জোনাদার, তুমি—বন্ধু—আমাকে একটা উপায় বাতলে দাও ভাই, যেন ডুবন্ত মানুষের মত ক্ষীণ অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল অ্যামনন, আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাবো—রাত্রে একটু ঘুমোতে পারি না, বলেই তার কানে কানে আরও কতগুলো কথা। ডেভিডের ছোট ভাইয়ের ছেলে অর্থাৎ অ্যামননের খুড়তুতো ভাই—জোনাদার কোন কথা বলল না।

শুধু চোখদুটো সাপের জিভের মত চিকচিক করে উঠল। আরও কিছুক্ষণ নিজের ভেতরে ডুব দিয়ে থেকে আস্তে আস্তে তাকে বলল বন্ধুর কুৎসিত সেই দুরভিসন্ধিকে সার্থক করার এক নিখুঁত ও মনোরম পরিকল্পনা।

পরদিন জেরুজ্যালেমের রাজপ্রাসাদের প্রতিটি মহলের বাসিন্দাদের মুখে নেমে এল গভীর উদ্বেগের ছায়া।

জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র অসুস্থ হয়েছেন—মন্ত্রগৃহে ডেভিড মাণ্ডলিকবর্গ-কে নিয়ে এক জরুরী আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় অন্তঃপুর থেকে এল প্রতিহারী।

প্রভু, বড়রাণীমা খুবই উতলা হয়ে উঠেছেন।

কেন—কেন?

বড় রাজকুমার রোগের যাতনায় অসম্ভব কষ্ট পাচ্ছেন। তিনি আপনাকে—

—তোমাকে আর বলতে হবে না, তুমি যাও—গম্ভীর কণ্ঠে বলল ডেভিড।

শয্যায় অস্থির হয়ে এপাশ ওপাশ করছে অ্যামনন।

কি হয়েছে বাবা অ্যামনন, তার ঘনকৃষ্ণবর্ণ কেশে পরম আদরে হাত বুলিয়ে বলল ডেভিড, রাজবৈদ্যকে খবর পাঠিয়েছি—

না—না—বৈদ্য প্রয়োজন হবে না বাবা, অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে বলল অ্যামনন আপনি মা-বোন কাউকে আসতে দেন না—

না—না—আমি তো তোমাদের অসুখেবিসুখে এবং উৎসবে—তাদের আসতে অনুমতি দিয়ে থাকি—তাড়াতাড়ি আবার প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলল, বলো—বলো—তোমার জন্য এখন কি করতে হবে—তোমার জননী, আহিমনকে এখানে থাকতে বলবো ?

না—না—বাবা কোন প্রয়োজন নেই, জ্বরতপ্ত কপালটাকে খিমচে ধরে যেন নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে বলল, বাবা—আমার একটি সামান্য—অতি তুচ্ছ একটি অনুরোধ রাখবেন—ট্যামারকে একবার কিছুক্ষণের জন্য পাঠিয়ে দেবেন ! ওর হাতের রান্না কোনদিন খাইনি—

ট্যামার ? ডেভিডের চোখের সামনে ভেসে উঠল কন্যার হাস্যোচ্ছল মুখখানা। সত্যিই রোগীর সেবাযত্ন এবং রন্ধন নৈপুণ্যে তার জুড়ি নেই। আসুক না। ভাই-ই তো ! বলল, বেশ আমি আদেশ দিয়ে যাচ্ছি—ট্যামার আসবে—

অ্যামননের রোগ পাণ্ডুর মুখে হাসি ফুটল।

ট্যামার এল।

এল শ্বেতশুভ্র পোশাকে আবৃত যেন এক শুচিস্নিগ্ধ তপস্বিনী। দাদা অসুস্থ। রোগাক্রান্ত কোন ব্যক্তির ঘরে বেশি সাজগোজের সমারোহ করে যাওয়া ঠিক নয়।

দাদা—তোমার কি হয়েছে বলো তো, প্রতিমার মত সুডৌল মুখে ঝিলি—মিলি হাসি ফুটিয়ে বলল, সত্যি—সত্যি তোমার অসুখ করেছে ? না—আমাকে তোমার প্রাসাদে নিয়ে আসার—

কী বলছিস ট্যামার, ক্ষীণ অস্ফুটস্বরে বলল অ্যামনন, আমি কখনো বাবাকে মিথ্যা কথা বলি না—

তুমি না কি আমার হাতে তৈরি পিঠে খেতে চেয়েছ, বলতে বলতেই

কোমরে ফরসা ধবধবে তোয়ালে জড়িয়ে মুহূর্তে এক কল্যাণী সাংসারিক মূর্তি ধরে চলে গেল রন্ধনশালায়।

বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইল অ্যামনন। যেন একটা শিকারোদ্যত হিংস্রসরীসৃপ অসুখের ছদ্মবেশের আড়ালে নিঃশব্দ প্রস্তুতি করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরই ট্যামার এল।

সঙ্গে তার তিন পরিচারিকার হাতে রৌপপাত্রে আটা ও বার্লি দিয়ে তৈরি সুস্বাদু পিষ্টক, আবার আর একজনের হাতে খাঁটি মধু এবং ছাগদুগ্ধ।

দাদা দেখেছো—এই মাত্র তৈরি করে নিয়ে এলাম। এখনও গরম আছে। খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল ট্যামার।

তোমার পরিচারিকাদের এখুনি বাইরে যেতে বলো রূঢ় কর্কশ কণ্ঠে বলল জ্যেষ্ঠ রাজকুমার।

সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতদাসীরা বাইরে চলে গেল।

ট্যামার—এস—আমার কাছে এস খাইয়ে দেবে, অ্যামননের কাতর কণ্ঠে অনুনয় পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

সরল মনে যেই এগিয়ে এল ট্যামার অমনি শয্যা থেকে লাফিয়ে উঠে তাকে জাপটে ধরল অ্যামনন। কামনার জ্বালায় তার চোখদুটো দুই খণ্ড অঙ্গারের মত জ্বলছে। ফিস ফিস করে বলল, এসো ট্যামার বিছানায় আমার পাশে শোবে চলো—লক্ষ্মী বোনটি আমার—

কি বলছো তুমি, এক ঝটকায় তার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে ছুটে পালাতে গিয়ে দেখল, দরজা বাইরে থেকে বন্ধ!

অ্যামনন এসে আবার তাকে বুকের ভেতর চেপে ধরে বলল, বৃথা চেষ্টা করো না, বলতে বলতেই টেনে খুলে ফেলল দীর্ঘ বস্ত্রাবরণ।

দাদা—তুমি এ কী করছো—তুমি ভাই আমি বোন, জীহোভার অনুশাসনে এসব পাপ, আর্তনাদ করে বলতে লাগল ট্যামার, সারা ইস্রায়েল তোমাকে আমাকে ধিক্কার দেবে—

কিন্তু ততক্ষণে অ্যামনন ক্ষিপ্র হাতে অনাবৃত করে ফেলেছে তার বক্ষো-সম্ভার। সেই দুইটি বিভ্রমের ছবি তাকে উন্মাদ করে তুলেছে।

তুমি—তুমি যদি বিয়ে করতে চাও তাহলে বাবাকে বলো—তোমাকে তিনি ভালবাসেন—তার কথা আর শেষ হল না।

আর কোন কথাই বলতে পারল না ট্যামার। বলবে কি করে? তার

রমণীয় সেই তন্বী দেহের যৌবনসম্ভারকে যে তখন মত্তসুখে এক উন্মাদের মত আস্বাদ করছে অ্যামনন। কিন্তু—

ঝড় যেমন দ্রুত এসেছিল, তেমনি তাড়াতাড়ি থেমে গেল। শয্যার এক কোণে বসে ঝড়ে বিপর্যস্ত একটি পাখির মত থর থর করে কাঁপতে লাগল ট্যামার। তার শুচিস্নিগ্ধ শুভ্রবস্ত্রের ঘাঘরা ছিঁড়ে মাটিতে দুলছে। মহার্ঘ রেশমের জামাটা কুঞ্চিত হয়ে তার জায়গায় জায়গায় ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

তার সেই সম্পূর্ণ রিক্ত অসহায় আর করুণ মূর্তির দিকে তাকিয়ে যেন অ্যামননের সম্বিৎ ফিরে এল। টলতে টলতে ট্যামারের কাছে এসে করুণ কণ্ঠে বলল, এ আমি—আমি কী করলাম—

আবার জানাজানি হলে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যত কুয়াশার মত মিলিয়ে যাবে তাই ট্যামারের ওপরে আক্রোশে ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচিয়ে বলল যাও—যাও—বেরিয়ে যাও—আবার সঙের মত বসে আছো কেন?

মাথা নীচু করে বেরিয়ে গেল ট্যামার।

এই হল ট্যামারের সর্বনাশের ইতিবৃত্ত। কিন্তু—

কি হয়েছিল ট্যামারের পরিণতি আর সেই কামুক, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, ডেভিডের স্নেহধন্য রাজপুত্র অ্যামননের-ই বা কি হয়েছিল?

পুরাতন নিয়মের বাইবেলে আছে অ্যামননের বড় করুণ আর শোকাবহ পরিণতির কথা আর আছে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক এবং যত আকস্মিকই হোক—একবার—মাত্র—একবার কোন নারীর কোন পুরুষের সঙ্গে দৈহিক সংসর্গ হলে সেই রমণীর যে কী বিচিত্র মানসিকতা হয়, তার আভাস।

কিন্তু বাইবেলের সেই অগ্রণ্য মহানায়ক প্রজানুরঞ্জন নৃপতি ডেভিড পুত্রের গর্হিত অপরাধের কথা জানতে পেরে কি করেছিল? আগে বলা হয়েছে, ডেভিড উচ্চবাচ্য করে নি। চুপ করেই ছিল। কিন্তু এই কলঙ্কের কথা দূরদূরান্তরে রটে গিয়েছে। মাণ্ডলিকবর্গও জানাত পেরেছে নিশ্চয়ই। অতএব কিছু একটা করতে হবে—করতে হবে কিছু একটা! সেই দুশ্চিন্তা তাকে অস্থির করে তুলল। এখন থাক সেসব কথা—

দেখা যাক—ট্যামারের কি হল?

গভীর শোকের মত রাত্রি নামে।

নিস্তব্ধতায় থম থম করছে চারিদিক। রাজপ্রাসাদের অলিন্দে দেখা যায়

একটি ছায়াদেহ। নিঃশব্দ পায়ে চলেছে অ্যামননের প্রাসাদের দিকে।

তার প্রকোষ্ঠের সামনে গিয়ে কয়েকমুহূর্ত দাঁড়ালো সেই ছায়াশরীর। কি ভেবে সেই দরজাই করাঘাত করল।

টক-টক-টক—

কে?

আমি, দরজাটা একটু খোলো না—

তুমি—তুমি আবার কেন, দরজার ওপার থেকে অনুতপ্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

দরজা খুলল অ্যামনন।

কিন্তু কোন কথা বলল না ট্যামার। শুধু মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। অন্ধকারে তার জলভরা দুটো চোখ চিক চিক করতে লাগল।

কি বলবে বলো?

বাবা-মা-রা আমার বিয়ে দেওয়ার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন, একটু থামল ট্যামার সোজা অ্যামননের চোখের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বলল, তোমার করণীয় কিছু নেই?

তোমাকে তো বহুবার বলেছি সেকথা, ঝাঁঝিয়ে উঠে অ্যামনন বলল সম্ভব নয় সব কয়েকমুহূর্ত কি ভেবে আবার শান্ত আর করুণ কণ্ঠে সে বলল, ট্যামার তুমি কি চাও না, আমি প্যালেস্তাইনের সিংহাসনে বসি—

কেন বলো তো? তুমি তো সহোদর ভাই নও। বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে তো হয় অ্যামনন, কাঁপা কাঁপা অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল ট্যামার, তুমি—তুমি যদি আমার মনের অবস্থাটা বুঝতে—বলতে বলতেই অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সে।

হয় আমি জানি, কিন্তু রাজপরিবারভুক্ত বৈমাত্রেয়ভাইবোনের বিবাহ নিষিদ্ধ ট্যামার, বিব্রত হয়ে বলল অ্যামনন, তোমাকে বিয়ে করলেই আমি সিংহাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবো—একটু থেমে আবার যেন নিদারুণ একটা যন্ত্রণায় জ্বলে পুড়ে বলল, আর ব্যাপার-টাকে কেন—কেন তুমি সহজভাবে নিতে পারছো না? কেন—নির্দোষ একটা খেলা বলে মনে করছো না—

খেলা! সহজভাবে! বদ্ধ উন্মাদিনীর মত দূরে অ্যামননের সেই নিদারুণ অঘটনের শয্যার দিকে কেমন উদভ্রান্তের মত তাকিয়ে শুধু ওই কথাদুটো অস্ফুটস্বরে বলল। আবার অ্যামননের সেই নির্বিকার কঠিন আর স্বার্থপর লোকের মত অস্পষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন শীতল কণ্ঠে বলল, বেশ আর

তোমাকে বলবো না—তুমি সুখী হও—বলেই অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল ট্যামার !

পারিষদবর্গ ডেভিডকে জানালো—জনসাধারণ রাজবাড়ির কেলেঙ্কারিটা নিয়ে যা-তা বলাবলি করছে—জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের প্রসঙ্গে আপনাকে কিন্তু কার্যকরী কোন ব্যবস্থা নিতে হবে।

বদলে গেল ডেভিডের মুখের চেহারা। মাওলিকদের সঙ্গে একটিও কথা না বলে চলে এল অন্তঃপুরে। চোখদুটো দুখণ্ড আগুনের মত চকচক করতে লাগল। আহিমন কেঁদে পড়ল ডেভিডের পায়ের কাছে। বলল, ওগো একটু খোঁজখবর করে বিচার করো--কার দোষ—

কি বিচার করবো আহিমন, কেমন অসহায়ের মত বলল, শয়তানটা আমার গুণ কিছু পায়নি—পেয়েছে আমার রক্তের সেই বিষ-একটু থেমে আবার বলল, কোন উপায় নেই; লোকের মুখ চাপা দেওয়ার জন্য ওকে আমি কারাগারে পাঠাবো—

রাজকীয় মর্যাদায় অ্যামননকে কারাগারে বন্দী করে রাখা হল। আশ্চর্য ! আহিমন এবং রাজঅন্তঃপুরে রমণীরা সবিস্ময়ে দেখল, অ্যামননের কারারুদ্ধ হওয়ার সংবাদে খুশি হল না ট্যামার। কেমন বেদনার একটা শিলীভূত মূর্তির মত বসে রইল তার প্রকোষ্ঠে ?

আহিমনের মনটা দুলে উঠল একটা সন্দেহে, তাহলে কি ট্যামার ভালবেসে ফেলেছে ? ও কি স্বেচ্ছায় অ্যামননের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। ট্যামার কিন্তু খুব বেশি যেত অ্যামননের প্রাসাদে।

না বলতে হবে সম্রাটকে ! পারিষদবর্গ, প্রজারা বললেই হল। একী রকম বিচার ?

রাত নামল গভীর হয়ে। ঘুম নেই ট্যামারের চোখে। হয়তো কারাকক্ষে কত কষ্ট পাচ্ছে অ্যামনন। আর স্থির থাকতে পারল না ট্যামার।

কারারক্ষীর কাছ থেকে চাবি নিয়ে সেই ঘুটঘুটি অন্ধকার কারাকক্ষে এল। দুই হাঁটুর ভেতর মাথা গুঁজে বসে রয়েছে অ্যামনন। ট্যামারের বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। পরম আবেগে তার পিঠে হাত রাখতেই চমকে উঠল অ্যামনন—কে—কে ?

আমি ট্যামার—

তোমার লজ্জা করে না আমার কাছে আসতে! রুদ্ধ আক্রোশে জ্বলে উঠল অ্যামনন। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল, তুমি নিজের মুখে বাবা-মা-কে সব কথা বলতে পারলে—

আমি কি করব বলো, বাবা সত্য ঘটনা জানতে চেয়েছিলেন—

আহা তুমি অন্য কারো নাম কিম্বা যা হোক কিছু একটা বলতেও তো পারতে—

সে কী! চমকে উঠল ট্যামারের জলভরা দুটো চোখের দৃষ্টি। সেদিন রাত্রে যেই বাবা মা-রা চলে গেলেন অমনি তুমি আমাকে তোমার ওই চওড়া বুকের ভেতরে জাপটে ধরেছিলে। সঙ্গে সঙ্গে অনাস্বাদিত একটা অনুভূতিতে আমার মন ভরে গিয়েছিল। রক্তের ভেতরে কলধ্বনি বাজতে শুরু করেছিল আমি মেয়ে বলে এবং অনিবার্য বিপদের কথা ভেবেই প্রথমে বাধা দিয়েছিলাম। তুমি শুনলে না।

কি করব। আমিও তো রক্তমাংসের মানুষ। মুহূর্তে বিধিনিষেধ নীতি সব ভেসে গিয়েছিল দিকপ্লাবী এক বন্যায়। আমরা পরস্পরের শরীরের ভেতরে ডুব দিয়েছিলাম তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে।

বিচিত্র এক পুলকানুভূতিতে ভরে গিয়েছিল আমাদের মন। পরে তুমি আমার কাছে এসে বলেছিলে—

এ আমি কী করলাম ট্যামার—

থাক সেসব কথা। শোন, তোমার স্পর্শ, তোমার আদর, তোমার সেই রাত্রির নিবিড় ভালবাসার চিহ্ন থরে থরে ফুটে রয়েছে আমার শরীরে অদৃশ্য ফুলের মত। ফুটে রয়েছে আমার যৌবনের সদম্ভ ঘোষণার মত। সেই রাত্রির সুখস্মৃতি আমার নারীত্বের প্রথম জয়ের গৌরবে উদ্দীপ্ত। এসব কি কখনো মেয়েরা মন থেকে মুছে ফেলতে পারে, না তাই সম্ভব?

তুমি জানো না। তুমি পুরুষমানুষ। তুমি কি করে জানবে বলো, মেয়েদের জীবনে প্রথম পুরুষের স্পর্শ হল স্বর্গের আলোর মত—প্রাণের যে উত্তাপ সঞ্চারিত করে দেয় মাটিতে তার রেশ সহজে মিলিয়ে যায় না! আমার জীবনেও তুমি সেই প্রথম পুরুষ। তোমার নামটাই গোপন করব—তাই কখনো হয়!

এই কথাগুলো তার মনের ভেতরে গরম জলের মত টগবগ করে ফুটতে লাগল। অস্ফুটস্বরে বলল, এসব কখনো মিথ্যে বলা যায় না।

যায় না—বেশ করেছ—জেল খাটিয়েছ—এইবার তোমার আশ মিটেছে তো? অ্যামননের দুচোখে হিংস্র দৃষ্টি ফুটে উঠল।

আসব না—আসব না করেও ট্যামার কাছে এল। তার পিঠে হাত রেখে যেন বহু বহু দূর থেকে বলল, তুমি বাবাকে একটা কথা বললেই তো হয়ে যায়—

না না, তা আমি পারব না—সম্ভব নয়। বদ্ধ উন্মাদের মত দুহাতে বুক চেপে ধরে চীৎকার করে উঠল অ্যামনন—

তুমি আমাকে ভালবাসো না?

না—একটুও না—ওটা মুহূর্তের ভুল—ওটা একটা দুর্ঘটনা! আর তাছাড়া তুমি আমার—

হাত তুলে তাকে থামতে ইঙ্গিত করল ট্যামার। বলল, এসব কথা তোমার সেদিন মনে ছিল না? তীব্র উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে সে। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, রাজপ্রাসাদে আরও কত সুন্দরী মেয়ে থাকতে কেন তুমি আমাকেই ডেকে পাঠিয়েছিলে? কেন আমার হাতেই পিঠে খেতে চেয়েছিলে? বলতে বলতে তার চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। মাথা নীচু করে চলে যেতে যেতে আবার থামল।

কারাকক্ষের পাথরের দেওয়ালের দিকে চোখদুটো ছড়িয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, মানুষের তৈরি কতকগুলো নীতি আর সংস্কারের ভয়ে তুমি সত্যকে এড়িয়ে যাচ্ছ। আমি প্রমাণ করে দেব, তুমি আমাকে ভালোবাসো—বলেই তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রেতলোকের অভিশপ্ত একটা আত্মার মত ঘাড় গুঁজে বসে রইল অ্যামনন। শুধু তার মনের ভেতর বারে বারে ভেসে উঠতে লাগল ট্যামারের নরম আর সুডৌল মুখের ছবি।

ভালবাসে—সে কথা ঠিক। কিন্তু তার বাবাকে বিয়ের কথা বললে নির্ঘাত নির্বাসন দেবে। আর সিংহাসনের আশাও ত্যাগ করতে হবে। বাবা কিছুতেই রাজপ্রাসাদের মর্যাদা এবং আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ করবেন না। কিন্তু—কিন্তু—

ট্যামারের এই বিচিত্র আচরণের অর্থ কি! এরকম ছোটখাটো অঘটন বৈমাত্রেয় ভাইবোনেদের ভেতরে কত হয়! তার মনে হল, জেজরিলের মিশরীয় সওদাগরের কাছে শুনেছিল সুদানের অরণ্যে নাকি একরকম গাছ আছে। যার একটা পাতা একবার স্পর্শ করলেই গাছটা নাকি তার সব ডালপালা দিয়ে মানুষটিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। মেয়েদের প্রেম কি সেই প্রকৃতির মত সর্বগ্রাসী। তার মনে হল, মনে হল, ট্যামার—ট্যামারের

প্রেম, যেন অদৃশ্য শত বাহুর বন্ধনে তাকে চিরকালের মত বন্দী করে ফেলেছে! কিন্তু—

কি করবে—কি করতে পারে সে? ট্যামার—ট্যামার-কে যে পত্নী বলে মেনে নিতেই চায়না মন। ইস—কী কুক্ষণেই যে সেই সর্বনাশা খেলায় মেতে উঠেছিল। কিন্তু—

কিছুই করতে হল না অ্যামননকে। ডেভিডকেও বিবাহের প্রস্তাব করতে হল না। আর আদরে লালিত জ্যেষ্ঠপুত্রকে কারাগারে বন্দী করে রাখার জন্যও আর নিদারুণ একটা অস্বস্তিতে থাকতে হল না ডেভিডকে! ঘটে গেল একটি অদ্ভুত কাণ্ড।

বেল হাজোর থেকে হঠাৎ এল অ্যাবাসালোম।

শঙ্কিত হয়ে উঠল ডেভিড। ভয়ের ছায়া পড়ল আহিমনের মুখে। এইবার একটা ঝড় উঠবে। ট্যামারের বুকে কাঁটার মত বিঁধতে লাগল নিদারুণ অস্বস্তি। কিন্তু—

আশ্চর্য। অ্যাবাসালোমের মনটা-ই যেন আমূল পাল্টে গিয়েছে। কথায় সেই কর্কশতা আর অকারণ রূঢ়তা নেই। চোখে মুখে নেই সেই রুক্ষতা। নিবিড় একটা পরিতৃপ্তিতে যেন আবিষ্ট হয়ে আছে তার সমস্ত চেতনা।

সে রাজপ্রাসাদের প্রত্যেকের কুশল সমাচার নিল। প্রাসাদপুরীর প্রতিটি মানুষের মনের ভেতরে জলজ্বল করতে লাগল একটা প্রশ্ন, সারা দেশ রাজবাড়ির যে কলঙ্কজনক ঘটনার কথা জানে—সেটা কি মধ্যম রাজপুত্রের কর্ণগোচর হয় নি?

অ্যাবাসালোম মন্ত্রগৃহে গিয়ে সম্রাটকে বলল, বাবা আপনার আশীর্বাদে আমার মেষের সংখ্যা স্ফীত হয়ে উঠেছে। আগামী পক্ষকাল পরে মেষের রোম-কর্তন বা শিপশিয়ারিং *এর বার্ষিক উৎসব করবো সিদ্ধান্ত করেছি, ক্ষণকাল থেমে আবার কাতর অনুনয় করে বলল, আমি আপনাদের সবাইকেই সেই উৎসবে নিয়ে যেতে চাই বাবা—

কোন কথা বলল না ডেভিড।

তীক্ষ্ণ চোখে মধ্যম পুত্রের হাসি হাসি মুখখানার দিকে তাকিয়ে যেন ওর

---

* শিপশিয়ারিং—প্যালেস্তাইন এবং যে সব দেশে গবাদি পশুর ভেতরে মেষ বেশি সেসব দেশে তাদের লোম কাটার দিন বার্ষিক উৎসবের আয়োজন করেন মেষপালকরা। আর এই লোম থেকে প্রচুর আয় হয় বলে তারা মহাসমারোহে ঈশ্বরের পুজো করে। এই উপলক্ষে একটানা তিনদিন ধরে চলে উৎসবের উল্লাস। **House of David Landy** (পৃঃ ১৫০)

মনের ভেতরটাকে জরীপ করতে চেষ্টা করল। বলল আমি তো যেতে পারবো না—ফিলিস্তাইন থেকে আবার বিদ্রোহের খবর এসেছে, তুমি তোমার মাদের এবং ভাইবোনদের নিয়ে যাও—

দাদা কোথায়—দাদাকে দেখছি না, একটু থেমে আবার বলল, আপনি যদি না যান, তাহলে প্রতিনিধি হিসেবে তো দাদাকে যেতেই হবে—

ডেভিডের মুখে অনাবিল হাসি ছড়িয়ে পড়ল। তার মনে হল, না ছেলেটার স্বভাবটা সত্যিই বদলে গিয়েছে। বেশ সহজভাবে যেন ছোট ছেলের দুষ্টামীর খবর বলছে এমন করে বলল, আরে জানিস না—ওই অপদার্থটা নেশার ঘোরেই বোধ হয় ট্যামারের সঙ্গে অশোভন আচরণ করেছিল বলে—

হো হো করে হেসে উঠল অ্যাবাস্যালোম। হেসে হেসে ডেভিডের মনের আবিল সন্দেহটাকে উড়িয়ে দিয়ে বলল, ওসব কিছু নয় বাবা—পিঠোপিঠি ভাইবোনদের ওরকম একটু আধটু হয়েই থাকে—

ঠিক বলেছিস বাবা, অ্যাবাস্যালোমের পিঠ চাপড়ে বলল ডেভিড, তুই এই কথাটাই তোর পাগলী বোনটাকে একটু বুঝিয়ে দে.তো—

ট্যামারটা ছোটবেলা থেকেই খুব ভাবপ্রবণ, বলল অ্যাবাস্যালোম, ওকে বোঝানোর দায়িত্ব আমার বাবা—

আমি—আমি জীহোভার কাছে প্রার্থনা করবো, ছেলেকে বুকের ভেতরে জড়িয়ে ধরে আবেগ অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলল ডেভিড, তোমার আরও অনেক অনেক উন্নতি হোক বাবা—

রাশি রাশি আলোর মালা পরে রূপসী হয়ে উঠেছে সেই নগণ্য জনপদ বেলহাজোর।

উচ্ছ্বসিত আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছে অ্যাবাস্যালোমের প্রাসাদ। রাজপুরীর আহিমন অ্যাবিগোলি ইত্যাদি মহিষীদের থেকে শুরু করে সমস্ত রমণীরা নিদারুণ অভিশাপের মত সেই দুর্ঘটনার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে উৎসবে মত্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু—

একজন সকলের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে আছে অত্যন্ত গম্ভীর আর কঠোর মুখে। সে ট্যামার! কেন—কে জানে। হয়তো সেই দুর্ঘটনার জের এখনো কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

প্রাসাদের প্রাঙ্গণে রাশি রাশি মেষের লোম কেটে কেটে স্তূপ করছে ক্রীতদাসরা। অ্যাবাস্যালোম অ্যামননকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে তাঁদের দেখাশোনা

করছে। আর অদূরে বিশাল এক বর্ণাঢ্য চন্দ্রাতপের নীচে নিমন্ত্রিত অভ্যাগতরা সারি সারি কেদারায় বসে রয়েছে। দূর থেকে ক্রীতদাসরা পিচকারী দিয়ে গোলাপ জলের বৃষ্টি ঝরিয়ে দিচ্ছে। আর টেবিলে টেবিলে সুগন্ধী সিরাজীর স্রোত বয়ে চলেছে।

পার্বত্যজনপদে রাত্রি নামল। উৎসবের উল্লাস আরও তীব্র হয়ে উঠল! চারিদিকের সেই উচ্ছ্বসিত কলরোলের ভেতরেই ট্যামারের কানে এল, দাদা— বড়দা অ্যামননকে নিয়ে চলে গিয়েছে অদূরে একটা বাংলোতে। সেখানে না কি দুজনে হুল্লোড় করে মদ্যপান করছে। থমকে দাঁড়ালো ট্যামার।

মনের ভেতরে সেই সন্দেহটা দুলে উঠল। ছুটে সেই বাংলোর দিকে যেতেই তার মনে পড়ল, ভয়ঙ্কর সেই ষড়যন্ত্রের কথাগুলো! সঙ্গে সঙ্গে সে ঝড়ের বেগে ছুটল বাংলোর দিকে। কিন্তু—

আকাশে জমেছে মেঘ।

টিপ টিপ বৃষ্টি পড়তে লাগল। জোরে বাতাস বইছে। সেই বাতাস ঠেলে ঝড়ের বেগে ছুটে চলল ট্যামার। পৌঁছে দেখল, নেশায় বেহুশ হয়ে পড়ে আছে অ্যামনন।

শোন—শুনছ—শীগগীর চলো—আমরা পালাই, জোরে ধাক্কা দিয়ে বলল ট্যামার, চারজন আততায়ীকে নিযুক্ত করেছে দাদা তোমাকে হত্যা করবে তারা এক্ষুনি-এক্ষুনি-এসে পড়বে—

তুমি বলছো কি? ধড়মড় করে উঠে বসল অ্যামনন। জড়িত কণ্ঠে বলল অ্যাবাস্যালোম যে বলে গেল, আমার জন্য মোয়ারের সেরা মদ নিয়ে আসছে—

তুমি—চলো—চলো—শীগগীরই চলো, উদভ্রান্তের মত চীৎকার করে উঠল ট্যামার, মদ নয়—তার ভাড়াটে ঘাতক পাঠিয়ে—তোমাকে খুন করবে— বলতে—বলতে-ই এক রকম জোর করেই অ্যামননকে নিয়ে রাস্তায় নামল।

অ্যামননের হাতদুটো জড়িয়ে নিয়ে দ্রুত পায়ে ছুটছে ট্যামার। বিড বিড় করে বলল অ্যামনন, তুমি আমাকে ভীষণ ভালবাসো ট্যামার—

তাই বুঝি! খিলখিল করে হেসে ট্যামার বলল, এতদিনে তাহলে বুঝতে পেরেছো! জোর পায়ে হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু—

খট-খট-খট—দ্রুত অশ্বখুরের ধ্বনি বেজে উঠল।

সর্বনাশ—নিশ্চয়ই ওরা আসছে। ভয়ে উত্তেজনায় ভেঙ্গে পড়ল ট্যামার। দেখতে দেখতে তাদের ঘিরে ফেলল অ্যাবাস্যালোমের সহস্র অনুচররা। আর একটিও কথা বলল না তারা।

এল অ্যাবাস্থালোম। কঠোর কণ্ঠে বলল, তুমি প্রস্তুত হও অ্যামনন—তুমি আমার বোনের সতীত্বনাশ করে ভেবেছো—বেশ নিরাপদে বাবার স্নেহচ্ছায়ায় থাকবে—সিংহাসনেও বসবে—বলতে বলতেই অন্ধকারে তার হাতে ঝিলিক দিয়ে উঠল তীক্ষ্ণধার খড়্গ! আর দূরে ছিটকে পড়ল অ্যামননের মুণ্ডুটা।

তুমি কি করলে দাদা—দুহাতে বুক চেপে ধরে আর্তনাদ করে উঠল ট্যামার। আর লুটিয়ে পড়ল অ্যামননের দেহের ওপরে।

তোর অত দরদ কিসের? যে তোর জীবনটাকে নষ্ট করে দিল—বলেই তার চুলের মুঠি ধরে ক্ষিপ্ত আক্রোশে চীৎকার করে বলল অ্যাবাস্থালোম—যা—দূর হয়ে যা—আমার চোখের সামনে থেকে—কুলটা মাগী কোথাকার! তারপরে—

ট্যামারের কি হয়েছিল—সে কথা বাইবেলের কোথাও নেই।

তবে অ্যামননকে হত্যা করেছিল অ্যাবাস্থালোম বেলহাজোর ছাড়িয়ে কিছু দূরে মরুসাগরের পাড়ে। ওল্ড টেস্টামেণ্টে আছে—আজও অনেক রাতে সব পাখি যখন ঘুমিয়ে পড়ে, আকাশের চাঁদ একা একা হাসে, তখন অপরূপ রূপসী এক দীর্ঘতনু তরুণীর অশরীরী ছায়া নাকি হাওয়ার ওপর পা ফেলে মরুসাগরের তীরে এসে দাঁড়ায়।

শলোমন ও সেবা

শেষরাতের শেষ তারকা নিভে গিয়ে যখন ভোরের আকাশ রঙিন হয়ে ওঠে, তখন জেরুজ্যালেমের রাজপথে দেখা যায় এক অশ্বারোহীকে। তার প্রশস্ত কপালে, উজ্জ্বল চোখের মণিতে জ্ঞানতপস্বীর মত প্রদীপ্ত জ্যোতি ঝকমক করছে। দেবদারুর মত দীর্ঘ সেই তরুণের শান্ত আর কমনীয় মূর্তির চারিদিকে ভোরের আলো একটা জ্যোতিশিখার মত ফুটে থাকে।

ব্রাহ্মমুহূর্তের সেই শান্ত আর নিস্তব্ধ জনহীন রাজপথ। পথের দুপাশে সারি সারি জলপাই আর ওকগাছের ডালে ডালে অন্ধকার ঝুলছে বাঁদুড়ের মত। নগরবাসীরা কেউ কেউ প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছে, কেউ বা ধীর পায়ে চলেছে দূরে পবিত্র জর্ডন নদীর জলধারার দিকে। আবার অনেকেরই সুখনিদ্রা তখনো ভাঙেনি।

খট—খট—খট—তেজস্বী ও বলশালী অশ্বের খুরে খুরে শব্দ তুলে মৃদুগতিতে চলেছে সেই তরুণ অশ্বারোহী। দুপাশে রুদ্ধদ্বার গৃহগুলির সুখী আর সম্পন্ন চেহারা দেখতে দেখতে পরম এক পরিতৃপ্তিতে তার মন ভরে ওঠে। ভোরের শিশিরস্নাত শীতল বাতাস তার মাথায় যেন পরম আদরে হাত বুলিয়ে দেয় আর স্বপ্ন নেমে আসে তার চোখে! সুপ্রাচীন এই শহরের কারো মনের কোন কোণেও এতটুকু দুঃখ নেই; মুখে নেই বিষাদের কোন ছায়া। সবাই সুখী, সবাই পরিতৃপ্ত?

আসলে দেশ তো শুধু মাটি দিয়ে গড়া নয়—দেশ হল মানুষ নিয়ে। সেই মানুষের মনে যদি থাকে অতৃপ্তি আর হতাশা, তাহলে দেশের কোন উন্নতি হতে পারে না।

ধীর গতিতে যেতে যেতে এক একটা গৃহের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে চেষ্টা করে, কোথাও কোন কান্নার শব্দ কি কোন আক্ষেপের উক্তি শোনা যায় কিনা—

না। ভোরের সেই প্রগাঢ় নিস্তব্ধতার ভেতরে বিক্ষোভের কোন অস্ফুট গুঞ্জন পর্যন্ত শোনা যায় না। গর্বে আর আনন্দে ভরে ওঠে তার মন।

বেলা বাড়ে। সকালের রোদ পুণ্যের আলোর মত ঝরে ঝরে পড়ে তার

প্রশান্ত মুখে। তার পরনে বকের পালকের মত শ্বেতশুভ্র পোশাক। হঠাৎ দেখলে মনে হয় স্বর্গ থেকে বুঝি নেমে এসেছে দেবদূত।

ঠিক এই সময়—রাজধানীর অভিজাত অঞ্চলের এক সুদৃশ্য প্রাসাদের শীর্ষে দেখা যায় তন্বী এক রমণীমূর্তি। তার সুর্মাটানা দুটো আয়ত চোখে উৎসুক দৃষ্টি ফুটিয়ে সে দেখে সেই অশ্বারূঢ় তরুণীকে। আর কেমন একটা মুগ্ধ তন্ময়তা নেমে আসে তার চোখে। ভাবে, বয়সে নবীন এই নৃপতি। সারা ইস্রায়েলের দণ্ডমুণ্ডের মালিক।

কিন্তু আশ্চর্য তার চোখে নেই চাঞ্চল্য, নেই কোন গর্বের দৃষ্টি। কেমন শান্ত আর স্নিগ্ধ তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখাবয়ব। স্পষ্টই বোঝা যায়, নিশ্চয়ই কোন গভীর প্রশান্তিতে আবিষ্ট হয়ে আছে তার মন।

প্রতিদিন প্রত্যূষে রাজধানী পরিক্রমা করে প্রজানুরঞ্জন মহাজ্ঞানী নৃপতি শলোমন। কিন্তু কখনো কোন অসতর্ক মুহূর্তেও কোন গৃহের প্রাসাদশীর্ষে কখনো দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। কখনো যৌবনসুলভ চাঞ্চল্যেও তার চোখদুটো চাতক পাখির মত তৃষ্ণার্ত হয়ে তাকায় না গবাক্ষের গায়ে আঁকা কোন উৎসুক রূপসীর মুখের দিকে। যুবক এই সম্রাটের চোখদুটোর নির্বিকার দৃষ্টি শুধু নিবদ্ধ থাকে দূর সর্পিল রাজপথের দিকে।

পুণ্যনগরী এবং রাজধানী জেরুজ্যালেমের স্থায়ী অধিবাসী রমণীরা তাকে মর্মে মর্মে জানে। তারা কখনো ভুলেও মহারাজের ব্রাহ্মমুহূর্তের সেই একক পরিভ্রমণে কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করে না। কী লাভ? তারা জানে, অসাধারণ রূপবাণ ওই যুবাপুরুষ আকাশের নক্ষত্রের মতই সুদূর! ভোরের নরম আর স্নিগ্ধ আলোয় অশ্বারূঢ় সেই কমনীয় মূর্তি একটা স্বপ্নের মত। এখুনি—এখুনি রাজপথের বাঁকে সোনালী আলোয় শিশির বিন্দুর মত গলে গলে জল হয়ে মিশে যাবে ওই বর্ণাঢ্য দৃশ্য।

কিন্তু রাজধানীর অভিজাত অঞ্চলের সেই রূপসী মেয়েটির মনে জেদ চেপে যায়। তার মনের ভেতরটা চিন চিন করে জ্বলতে থাকে। আর অস্ফুটস্বরে বলে আমি দেখে নেব, তুমি কত বড় জ্ঞানী পুরুষ। তোমার যৌবনের রক্তে কি কখনো নারী দোলা জাগাতে পারে নি, জাগতে পারে নি কোন উল্লাসের কলধ্বনি!

ধীর পায়ে প্রাসাদশীর্ষ থেকে নেমে আসে। তার মনের ভেতরে চিন্তার প্রবাহ ওঠা নামা করে, শুনেছে ইস্রায়েলের এই তরুণ সম্রাট শুধু মহাজ্ঞানী নন, মহাকবি এবং দার্শনিকও। আর যেমন সুদক্ষ রাজ্য শাসনে, তেমনি নাকি

অসাধারণ নৈপুণ্য তার যুদ্ধবিদ্যায়। তার হারেমেও দেশদেশান্তরের খর যৌবনবতী রূপসী রমণীর অভাব নেই। তবে কি—

সে নির্মমভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর প্রত্যাখানের সেই মর্মান্তিক অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে স্বদেশে ফিরে যেতে হবে? কখনই কি তাব সান্নিধ্য পাবে না। আর নারীদেহের সমস্ত সৌন্দর্যসম্ভার অবারিত করে দিলেও কি তিনি নির্বিকার থাকতে পারবেন? তাই যদি হতো, তাহলে তো সমস্ত সৃষ্টি—প্রজন্মের পর প্রজন্মের এই অবিচ্ছিন্ন স্রোত রুদ্ধ হয়ে যেত।

দিন কাটে। মাস যায়। প্রতিদিনই অভ্রান্ত নিয়মে পূবের আকাশে যেই ভোবের রেখা জেগে ওঠে তখুনি আবছায়া অন্ধকাবে আচ্ছন্ন সেই রাজ-পথের প্রান্তে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে সেই অনুপম রূপ আর যৌবনে ভূষিত সেই অশ্বারূঢ় পৌরুষদৃপ্ত মূর্তি।

সেই সুদৃশ্য প্রাসাদেব শীর্ষে স্থিব আর অকম্পিত একটি দীপশিখার মত দাঁড়িয়ে থাকে সেই বিদেশিনী। কখনো রক্তিম রেশমের মত এক রাশ চুল ছড়িয়ে দেয় পিঠে। সেই কেশরাশিব কোন গুচ্ছে দোলে রক্তপ্রবাল, কোনটায় সবুজ-বর্ণ পোখরাজ। রূপ না হোক—সম্পদ, তার অপরিমেয় ঐশ্বর্য দেখেও যদি কৌতূহলী হয়ে তরুণ সম্রাট একবাব—একটি মুহূর্তেব জন্যও তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কবেন।

আবাব কোনদিন ছাদ থেকে নেমে এসে রাজপথ সংলগ্ন দ্বিতলের কোন প্রকোষ্ঠেব গবাক্ষের গবাদে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। থাকে একটি রঙীন মরীচিকার মূর্তিব মত। সেই মরীচিকার অধোভূবনে স্বর্ণখচিত মহার্ঘ রেশম বস্ত্রের ঘাঘরার আড়ালে তার সুপুষ্ট নিতম্বের ছায়াভাস। প্রায় স্বচ্ছ আর শিশি-রের মত নরম শবনম মসলিনের কুর্তার নীচে সবুজ আংগিয়ার আবরণে আবদ্ধ উত্তুঙ্গ সেই দুইটি রঙীন বিভ্রমে সাদর আমন্ত্রণের হাতছানি। আবার একদিন নীচে নেমে এসে দাঁড়ায় প্রাসাদের প্রধান তোরণদ্বারে। তার পরনে বিশুদ্ধ দেশীয় পোশাক। গায়ে ঘন বেগুনী রঙের জামা। চুড়িদার আস্তিন কব্জি পর্যন্ত। পরনে খাটো লাল ঘাঘরা। মাথায় কপাল চেপে নীল চুমকিদার রুমালের ফেট তার নীচে রক্তপদ্মের মত একটি হাসি হাসি মুখ। টিকালো নাক তার দুইপাশে বড় বড ডাগর দুটো চোখ যেন আরব সমুদ্রের নীলিমায় টলমল করছে। কিন্তু—

বৃথা—বৃথা—সব বৃথা! অনেক—অনেক দূরে জর্ডনের বিস্তীর্ণ উপত্যকা ছাড়িয়ে জনমানবহীন ধু ধু মরুভূমির বুকে কত নাম না জানা রঙবেরঙের ফুল

তাদের সব সৌন্দর্য উজাড করে মেলে ধরে। কেউ কখনও তাকায় না তাদের দিকে। তেমনি রাজধানীর সেই সুরম্য প্রাসাদের শীর্ষে অপরিসীম রূপ আর উত্তাল যৌবনের সম্ভার নিয়ে তারই প্রতীক্ষায় আকুল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার দিকে শলোমনের দৃষ্টি কখনও নিবদ্ধ হয় না।

সেই বিদেশিনীর মনে হয়—মনে হয় প্রেম প্রণয় আর অনুরাগের এই পৃথিবীর মাঝখানেই আছেন ইস্রায়েলের এই তরুণ নৃপতি অথচ তাঁর হারেমের বাইরের এই জগতের আর কোন রমণীর কামনা যেন তার হৃদয় স্পর্শ করতে না পারে এমনি এক দুর্ভেদ্য বর্মে তিনি তার হৃদয়বৃত্তিকে আচ্ছাদিত করে রেখেছেন। তীব্র যন্ত্রণায় জ্বলে যায় তার মাথার ভেতরটা। আর কেমন একটা দীনতা আর হীনমন্যতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় তার মন। তাহলে—

তাহলে কি তার সৌন্দর্যে রমণীসুলভ কোন আকর্ষণই নেই? দ্রুত, অস্থির পদক্ষেপে সিঁড়ি ভেঙ্গে চলে আসে তার সুরম্য শয়নকক্ষে। তার রোমকূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কে যেন আগুনের ফুলকি ছিটিয়ে দিয়েছে। তার চেতনার ভেতরে যেন রাশি রাশি সূঁচ বিঁধছে। বেলজিয়াম কাঁচের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিরুদ্ধ আক্রোশে ফুলতে থাকে। মরালার মত সুঠাম গ্রীবা, দীর্ঘ দেহে অটুট স্বাস্থ্যের তরঙ্গ, অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী—এ সবের কোন মূল্য নেই ওই গম্ভীর আর বিষণ্ণ মানুষটার কাছে!

প্রকোষ্ঠের চারিদিকে থরে থরে সাজানো বিলাসের অজস্র সামগ্রী। মেহগিনি কাঠের অপূর্ব কারুকার্য করা পালঙ্ক, গজদন্ত এবং কচ্ছপের খোল দিয়ে নির্মিত শুভ্র দেওয়ালের ওপরে হাল্কা নীলাভ রঙের নিপুণ হাতে রঙীন লতাপাতা আঁকা, আবার কোথাও বা ছায়াচ্ছন্ন কুঞ্জবনের আভাস। দরজার দু পাশে স্বর্ণনির্মিত ধূপাধার থেকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠছে সুগন্ধী আরবিয় গুগুলের ধোঁয়া। পলাশরাঙা বহুমূল্য গালিচায় আবৃত মেঝে। তাতে পা দিলে পা ডুবে যায়। শুধু কি তাই?

তার এই শয়নকক্ষের সারি সারি ওই তোরঙ্গগুলিতে আছে একটা সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের অগাধ ঐশ্বর্য। আছে রাশি রাশি সোনার মোহর, বহুমূল্য প্রস্তর ও মণি-মুক্তা। যে-কোন একটার পাল্লা খুললে ঝলসে যাবে চোখ। তার বিপুল ঐশ্বর্যের কথা ভাবে আর অস্থির পায়ে আহত বাঘিনীর মত পায়চারী করতে থাকে ঘরের চারিদিকে।

তার বিক্ষুব্ধ মনের ভেতরে ভেসে ওঠে, কয়েক মাস আগের একটা দৃশ্য। দিগন্তবিসারী মরুভূমির ভেতরে দীর্ঘ পথ ধরে চলেছে একটি কাফিলা। তাদের

পিঠে বাঁধা ঘণ্টা বাজছে—ডিং-ডং ডিং-ডং ডিং-ডং! মাথার ওপরে দুপুরের সাবালক সূর্য প্রচণ্ড তাপ চড়াচ্ছে। উত্তপ্ত বালুর ঝাপটা নিয়ে গরম বাতাস আছড়ে পড়ছে তাদের চোখ-মুখে। সেই কাফিলার দীর্ঘ শোভাযাত্রার পুরোভাগে বর্ণাঢ্য হাওদায় সুসজ্জিত একটি বলিষ্ঠ উটের পিঠে আসছিল সে নিজে।

সাবা থেকে জেরুজ্যালেম অনেক দূরের পথ। দক্ষিণ আরবের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য, সাবা। সাবার সুলতানের একমাত্র কন্যা সে। অতুলনীয় তার রূপরাশি। মিশর থেকে, সিডন থেকে, আরও আশপাশের কত রাজ্য থেকে, তরুণ আর রূপবান রাজারা এসেছে তার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব নিয়ে। তাদের সে ফিরিয়ে দিয়েছে। বিস্মিত হয়ে তার বাবা বলেছেন, তুই কি চাস মা?—কি করলে তুই খুশি হবি?—

'তুই চিরকুমারী হয়ে থাকবি নাকি! মা-র কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ফুটে উঠেছিল। সে তখন মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে বলেছিল কতগুলো কথা। শুনে চমকে উঠেছিল তারা। ব্যথার ছায়া ফুটে উঠেছিল তাদের চোখে।

সে যে অসম্ভব ব্যাপার! শুধু বলেছিল, তিনি যে শুধু অগাধ জ্ঞানী তা নন, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ বরপুত্র—একটু থেমে আরও বলেছিল, শুনেছি তিনি অনেক অলৌকিক ক্ষমতার—

আমি এসব জানি বাবা, তার চোখে দৃঢ় একটা সঙ্কল্পের ছায়া ফুটে উঠেছিল।

চুপ করে গিয়েছিল তার বাবা। একমাত্র কন্যা। তাই তার কোন সাধ অপূর্ণ রাখেনি। মণিমুক্তা হীরাজহরৎ আর রাশি রাশি মোহর এবং আরও বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়ে রওনা করিয়ে দিয়েছিল তাকে।

অগাধ ঐশ্বর্য ও নিজের অতুলনীয় রূপ নিয়ে মন জয় করতে এসে নির্মমভাবে ব্যর্থ হয়েছে সে। পরাজয়ের গ্লানিতে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে তার মন। সেই মূল্যবান আসবাব পত্র সুসজ্জিত নির্জন ঘরে দাঁড়িয়ে চোখ ফেটে জল এসে পড়ল তার। আর ঘরের বাতাসে মিশে গেল তার বুক উজাড় করা দীর্ঘশ্বাস!

কিন্তু কোন মুখ নিয়ে সে ফিরে যাবে বাবার কাছে! কি বলবে? কি বলতে পারে সে? সে কি বলবে তরুণ, রূপবান নৃপতি পার্থিব সম্পদ ও রমণীর রূপ সম্বন্ধে নিষ্ঠুরভাবে উদাসীন।

তার বিক্ষুব্ধ মনের উত্তাপ ধীরে ধীরে কমে আসতেই মনে পড়ে গেল তার পিতার কথাগুলো—

ইস্রায়েলের অধীশ্বর শুনেছি, বিদেশী মেয়েদের পাণিগ্রহণ করে তাদের

রূপযৌবনে মুগ্ধ হয়ে নয়; সেই মেয়েটির দেশের সঙ্গে ইস্রায়েলের মৈত্রী আর সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যেই বিবাহ করে থাকেন। আর তাঁর হারেমে না-কি আছে মোয়াবীয়, আম্মোনীয় থেকে শুরু করে এডমীয়, হিটিটি এমন কি মিশরীয় মহিষী পর্যন্ত আছে—

আরও বলেছিলেন তার বাবা এই তো কিছুদিন আগেই মিশরের মহামান্য ফারাও সিয়ামন নাকি ইস্রায়েলে রণঅভিযান করে নির্মমভাবে পরাজিত হন। শেষ পর্যন্ত রাজকীয় অনুশাসন (নীলনদের দেশের রাজপরিবারের কন্যার কখনো মিশরের বাইরে বিবাহ হবে না) অগ্রাহ্য করে শলোমনের সঙ্গে তাঁর এক কন্যার বিবাহ দিয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হন—বলতে বলতে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন বাবা। আবার খুব জরুরী কিছু একটা মনে পড়েছে এমন করে বলল, তবে দেখ—ইস্রায়েল এখন অত্যন্ত ধনজনে সমৃদ্ধ শক্তিশালী দেশ। শলোমন ডেভিডের সুযোগ্য পুত্র। তিনি যদি স্বেচ্ছায় আমার সোনার দেশ সাবার সঙ্গে সৌহার্দ্যের সম্বন্ধ স্থাপন করার আকাঙ্খা প্রকাশ করেন, তাহলে হয়তো তাকে—

না বাবা—মেয়েকে রাজনীতির কূটনৈতিক খেলার উপকরণ করো না, বলিষ্ঠ কণ্ঠে সে প্রতিবাদ করেছিল।

আশ্চর্য রমণীর রূপ যৌবন, তার প্রেম প্রণয়, কিছুরই কোন মূল্য নেই। সেই রমণীর জন্মভূমির আর্থিক সম্পদ-ই তার কাছে বড়। এখানে এসেও সে তার প্রাসাদের ইস্রায়েলী খিদমতগার এবং পরিচারকদের বলতে শুনেছে—রাজার হারেম নিয়মিত যেমন নারীমাংস সরবরাহ করে তেমনি দেশদেশান্তরের সঙ্গে দৃঢ় করে মৈত্রীবন্ধন।

একরকম পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সব—সব জেনেশুনেই সে চলে এসেছে। এখন অসম্ভব ফিরে যাওয়া। না—সে ফিরে যেতে পারবে না। ফিরে যেতে সে আসে নি।

সে আর তার প্রাসাদের ছাদে কি তার প্রকোষ্ঠের গবাক্ষে, কি অলিন্দে সেই চাতক পাখির মত পিপাসাতুর দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল না।

সুদৃশ্য সেই বিশাল সৌধের প্রধান তোরণদ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেল প্রতিটি গবাক্ষ। সেই আলোকোজ্জ্বল আর থরে থরে মহার্ঘ আসবাবে সুসজ্জিত এবং বহু দাসদাসীর কলকণ্ঠে মুখরিত প্রাসাদ জনমানবহীন শ্মশানের মত খাঁ খাঁ করতে লাগল।

রাতের অন্ধকার অপসারিত হয়ে যেই পূবের আকাশ আবির ছিটিয়ে সূর্য

ওঠে। অমনি শুরু হয়ে যায় শলোমনের দৈনন্দিন বহুবিধ কর্মসূচীর প্রথম কাজ—নগর পরিক্রমা।

তার এখন অনেক—অনেক কাজ। প্রতিদিন রাত্রির মধ্যযাম অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত মেষচর্মে লিখছে একটি গ্রন্থ—সং অফ সংগস—অর্থাৎ সঙ্গীতের সঙ্গীত! সে মুখে মুখে সুরেলাকণ্ঠে আবৃত্তি করে যায় স্বরচিত গানের কথাগুলো। আর লিপিকর দ্রুত লিখে যায় মেষচর্মে। তারও আছে পিতার মতই সহজাত কাব্যপ্রতিভা।

এই বই লেখা ছাড়াও জেরুজ্যালেমের উপকণ্ঠে জীহোভার উদ্দেশ্যে একটি অতিকায় মন্দির নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছে। এমন সুদৃশ্য আর বিশাল দেবায়তন সে তৈরি করবে যা অনেক রাষ্ট্রবিপ্লবে, অনাগত বহু বহু বৎসরের বর্ষার জলে, মহাপ্লাবনে কি প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাকে এতটুকু ক্ষয় করতে পারবে না, পারবে না বিনষ্ট করতে। তার মনের ভেতরে চিন্তার প্রবাহ ওঠা-নামা করে। মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনায় ফিনিসীয়ার স্থপতিদের সক্রিয় সাহায্য নিয়েছে সে। কিন্তু সেই দেবায়তনটির গঠনসৌষ্ঠবে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে সিরিয়া এবং ক্যানাইট অর্থাৎ সুপ্রাচীনকালের ফিনিসীয়া এবং প্যালেস্তাইনের মন্দিরের বৈশিষ্ট্য!

শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত একটি বিস্তীর্ণ বেদীর ওপরে আয়তাকার সেই ৪৫ ফিট উঁচু এবং ৯০ ফিট দীর্ঘ ও ৩০ ফিট চওড়া অতিকায় দেবমন্দির। আর তার সম্মুখে থাকবে সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। সেই দেবায়তনের সম্মুখ ভাগ ব্যাবিলন অ্যাসিরিয়ার মত থাকবে নবোদিত সূর্যের দিকে। আর উত্তরে, পশ্চিমে, দক্ষিণে সেই মন্দিরকে বেষ্টন করে থাকবে বহু প্রকোষ্ঠ সমন্বিত ত্রিতল একটি সৌধ। এই প্রকোষ্ঠগুলির কোনটায় থাকবে তৈজসপত্র, কোনটায় পুরোহিত-দের মহার্ঘ পোশাক আবার কোনটায় বিশুদ্ধ জলপাইতেল যা দিয়ে অনির্বাণ জ্বলবে পবিত্র মৃৎপ্রদীপ।

সবই তো হবে কিন্তু কোথায় থেকে, কেমন করে পাওয়া যাবে গন্ধধূপ। ফিনিসীয়া, ব্যাবিলন, অ্যাসিরিয়া প্রভৃতি যেসব দেশের সঙ্গে তার সৌহার্দ্যের সম্পর্ক আছে। সেইসব দেশে সেই পবিত্র দেবতরু (ধূপগাছ) জন্মায় না। কিন্তু গন্ধধূপ ব্যতীত কেমন করে—কেমন করে হবে দেবতার আরাধনা। বুকের পাঁজর বিদীর্ণ করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে!

রক্তপ্রস্তরনির্মিত রাজপথে খট খট শব্দ তুলে তার তেজস্বী অশ্ব চলতে থাকে—

এ কে! হঠাৎ তাকে থমকে দাঁড়াতে হল। রাজপথের পাশে ঝাঁকড়া জলপাইগাছের নীচে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে আছে এক তরুণী। প্রতিমার মত সুন্দর মুখখানায় চিন্তার ছাপ! তার দীর্ঘ তন্বী দেহ যেন কঠোর তপস্যায় শীর্ণ। পরনে শুধু সন্ন্যাসীনিদের মত পা পর্যন্ত ঢাকা সাদা পোশাক! কালো আর ডাগর দুটো চোখের দৃষ্টি কেমন সুদূর।

আপনি কি কিছু বলবেন?

সে কিছু বলে না। শুধু নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকায়। আর চোখদুটো ছড়িয়ে দেয় দূরে আকাশের গায়ে আঁকা পাহাড়ের নীলিম রেখার দিকে।

শলোমন আর দাঁড়ায় না।

পরদিন আবার ঠিক সেই জায়গায় ঠিক সেই গাছের নীচে শলোমন দেখতে পায় তাকে। একটু অবাক হয়। নিঃশব্দে কেন পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে! কোন মঠের কোন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিনী,—অমন আগুনের মত রূপ আর এই উথালপাথাল বয়স! এই নিষ্করুণ ব্রাহ্মচর্যের পথে এল কেন?

প্রতিদিন দেখা হয়। দৃষ্টি বিনিময়ও হয়। কিন্তু কথা বলে না। শলোমনের মনের কোণে কোণে কাঁটার মত একটা অস্বস্তি বিঁধতে থাকে!

কৌতূহলে জ্বলে যেতে যেতে একদিন অনুচরদের বিচিত্র এই তরুণীটির খোঁজখবর নিতে বলে। তারা ফিরে আসে হতাশ হয়ে। বলে, কিছুই জানা গেল না।

মানে?

তোমরা নগরকোটালের কাছে গিয়েছিলে? শুনেছ কোন শহরের কোন অঞ্চলের গৃহে বাস করে, তার সঙ্গে আর কে থাকে—বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল শলোমন।

যে বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন নৃপতি এবং যার হারেমে দেশদেশান্তরের শত শত মহিষী মহর্ষি—তার পক্ষে সামান্য এক নারীর জন্য এতটা উতলা হওয়া শোভা পায় না—ভেবেই হয়তো আর একটিও প্রশ্ন করল না।

কিন্তু মনের ভেতরটা যেন দগ্ধ হয়ে যেতে লাগল। আর চেতনার ভেতরে বারে বারে একটা মুখের ছবি ভেসে উঠতে লাগল।

সে মুখ ম্লান বিষণ্ণ। কালো ডাগর চোখদুটো চিন্তাচ্ছন্ন। কিন্তু ব্যথা-ভারাক্রান্ত, গম্ভীর সেই মুখে, নাকে, চোখে আশ্চর্য ধারালো একটা রূপ ছাইচাপা আগুনের মত ঝিকমিক করে।

থেকে থেকে তার মনে হয় স্বর্গের কোন অপ্সরী যেন মানবীর ছদ্মবেশ ধরে

নেমে এসেছে মাটির পৃথিবীতে। যেমন করে হোক জানতে হবে, কেন সে তার প্রত্যুষের রাজধানী পরিক্রমার সময় তপস্বীনির বেশে দাঁড়িয়ে থাকে, কেন তার চোখে আষাঢ়ের মেঘের মত কি যেন টলমল করে, অথচ পাথুরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে—কেন একটা কথা বলে না! চিন্তার জ্বরে জ্বরে পুড়ে যায়। কানের পাশে রগ দুটো অসহ্য ব্যথায় ছিঁড়ে পড়ে।

সেদিন ঘটে গেল আর এক কাণ্ড। পশ্চিমের আকাশে আবির ছড়িয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। চারিদিকে বিকেলের বিষন্ন আর কোমল ছায়া নেমেছিল। ঠিক এই সময় শলোমন জর্ডন নদীর ধারে সেই মন্দিরের সামনে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। একি! ওরা কারা কাজ করছে? দেবদারুর শীষের মত দীর্ঘ করেছে চুড়োটাকে আর মন্দিরগাত্রে নিপুণ হাতে হাতুড়ি আর ছেনি দিয়ে উৎকীর্ণ করা হচ্ছে লতা পাতা আর ফুল। কোথাও আবার সুদক্ষ শিল্পীরা ছেনি হাতুড়ি দিয়ে উৎকীর্ণ করছে অনিন্দ্যসুন্দর অপ্সরী কোথাও বা ডানা মেলে উড়ন্ত ফুলের মত সজীব ও সুন্দর দেবশিশুরা।

নির্মীয়মান সেই বিশাল দেবায়তনের সামনেই তার ফিনিসীয় স্থপতি এবং সহযোগীরা নিষ্কর্মা হয়ে বসে আছে।

কি ব্যাপার আপনারা এখানে বসে আছেন, শলোমন বিস্মিত হয়ে বলল, মন্দিরে কাজ করছে কারা?

মহারাজ, প্রচুর পারিশ্রমিক দিয়ে আমাদের কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে—

সে কী! কে কে নিষেধ করেছে তীব্র উত্তেজনায় অবরুদ্ধ হয়ে এল শলোমনের কণ্ঠস্বর।

ফিনিসীয় স্থপতিদের চোখে ভয়ের ছায়া পড়ে। কেমন অসহায় মনে হয় তাদের। অস্ফুট ক্ষীণস্বরে তারা বলে যিনি হুকুম দিয়েছেন, তিনি ওই প্রাসাদে বাস করেন বলে মনে হয়, বলেই দূরে রাজপথের পাশে একটি বিশাল সুরম্য প্রাসাদের দিকে ইঙ্গিত করল।

ক্ষণকাল পরে তাদের একজন বলল, যারা কাজ করছে ওই শিল্পীরা শুনেছি অধিকাংশ-ই স্থানীয়—

তারা কে কি বলছে যেন শুনতেই পেল না শলোমন। সে একটা ঝড়ো বাতাসের মত ছুটে গেল সেই প্রাসাদের দিকে।

আশ্চর্য এত বড় রাজকীয় প্রাসাদ, কিন্তু প্রধান তোরণদ্বারে কোন সশস্ত্র প্রহরী নেই। কয়েকমুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে রইল শলোমন। সম্পূর্ণ অট্টালিকা

কি জনশূন্য? তার মনে হল—মনে হল সে যেন গভীর এক রহস্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন আর অজানা জগতের ভেতরে এসে পড়েছে।

উন্মুক্ত তোরণদ্বার দিয়ে ধীর পদক্ষেপে ভেতরে এল। ইস্রায়েলের জনপ্রিয় প্রবল প্রতাপান্বিত নৃপতি! প্রবেশ করতেই বিস্তীর্ণ একটি উদ্যানে নানা বর্ণের ফুলের সমারোহ। সেই উদ্যানের কিন্তু কোথাও নেই কোন জনপ্রাণী!

উদ্যানের পরেই শ্বেতপ্রস্তরে বাঁধানো একটি প্রাঙ্গণ। তার চারিদিকে থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে নানারঙের মহার্ঘ পাথরে তৈরি সুঠামতনু রমণীমূর্তি। একতলার সারি সারি প্রকোষ্ঠে মূল্যবান আসবাব পত্রে সুসজ্জিত।

তার মনে হল, কোন অসামান্য ধনাঢ্য ব্যক্তির বাসগৃহে এসেছে। কিন্তু অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করাটা অশোভন হয়েছে না? কি করবে—চীৎকার করে কাউকে ডাকবে? সেটাও তো দৃষ্টিকটু তবুও—

তবুও দ্বিধাগ্রস্থ পদক্ষেপে সিড়ির পর সিড়ি অতিক্রম করে সে এল দ্বিতলে আর তার চোখদুটোর দৃষ্টি মুগ্ধ হয়ে গেল। প্রথম প্রকোষ্ঠে চার দেওয়ালে মেহগিনি কাষ্ঠ নির্মিত থাকে থাকে শোভা পাচ্ছে রাশি রাশি তীক্ষ্ণধার তরবারি। দ্বিতীয় কক্ষে নানাবর্ণের বস্ত্রসম্ভার, তার কোনটা ভারতীয় মসলিন আবার কোনটি ইস্পাহানী রেশম। তারপরের প্রকোষ্ঠটিতে শুধু বহু-বর্ণের বৈচিত্রময় চীনা রেশমের বস্ত্রের বিপুলসম্ভার।

ব্যাপার কি? কার এই বিচিত্র বাসগৃহ যার প্রতিটি কক্ষে প্রাচ্য দেশীয় যাবতীয় মহার্ঘ পণ্যসম্ভারে বিপুল সমাবেশের বিচিত্র প্রদর্শনী? হঠাৎ তার মনে হল—মনে হল হয়তো এই প্রাসাদেরই কোন নিভৃত কক্ষাভ্যন্তর থেকে তাকেও কেউ লক্ষ্য করছে। তীব্র অস্বস্তিতে জ্বলে যাচ্ছে তার মাথার ভেতরটা।

যাবো না, যাওয়া উচিত নয়, ভাবতে ভাবতেই শলোমন এল ত্রিতলে। এইবারে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যেতে হল তাকে। তার মনে হল, তার হৃদপিণ্ড যেন থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

প্রথম প্রকোষ্ঠে মহার্ঘ গজদন্তের বিপুলসম্ভার। দ্বিতীয়টিতে রাশি রাশি অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণের নিরেট কঠিন এক একটি গোলক—শলোমনের মনে হল লোহিতসাগর সন্নিহিত পূর্ব আফ্রিকায়. সোমালিল্যাণ্ডের উৎকৃষ্ট স্বর্ণের বিপুল সম্ভার এই বিশাল স্বর্ণভাণ্ডার। স্বর্ণের সুতীব্র উজ্জ্বল দীপ্তিতে তার চোখদুটো যেন অন্ধ হয়ে এল।

ধীর পায়ে সে এল তৃতীয় প্রকোষ্ঠে আর কেমন বিমূঢ় হয়ে গেল। অভিভূত একটা আচ্ছন্নতায় অবশ হয়ে গেল তার চেতনা। সেই ঘরের যেদিকে তাকাও শুধু ঝকমক করছে মুক্তা—পারস্যোপসাগরের মুক্তা! তার মনে হল সে যেন একটা মিষ্টি সুখস্বপ্নের ঘোরে বিপুল ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ কোন ইন্দ্রপুরীতে এসেছে। তার মাথার ভেতরটা কেমন ঝিম ঝিম করতে লাগল।

লক্ষ্য করল, আরও একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। তোর মেহগিনি কাষ্ঠ নির্মিত দ্বারদুটি স্বর্ণ ধনমণ্ডিত। কিন্তু কেন যেন এই কক্ষটির দ্বার রুদ্ধ! কে জানে হয়তো আরও মহার্ঘ কোন সামগ্রী আছে এই ঘরে।

আশ্চর্য তার রাজধানীর ওপরে এই পুণ্যনগরীতে এমন একটি প্রাসাদ আছে—এমন সম্পদশালী অধিবাসী আছে—তা সে জানে না। গুপ্তচর বিভাগের অধিনায়ক তার কার্যে অবহেলা করছে—এসব চিন্তা করতে করতেই সে এল ত্রিতলের শেষ প্রান্তের চতুর্থ কক্ষে। সেখানে থরে থরে সাজানো আছে নানা বর্ণ বৈচিত্রে সমুজ্জ্বল উট পাখির মহার্ঘ পালক। আর এই। বস্তুটি দেখেই শলোমন নিশ্চিত হয়ে গেল এই প্রাসাদের অধীশ্বর লোহিতসাগর সন্নিহিত হয় পূর্ব আফ্রিকা, না হয় পশ্চিম আরবের কোন দেশের অধিবাসী। কিন্তু কোথায়—কোথায় তিনি?

কে আপনি? হঠাৎ প্রাসাদশীর্ষের একটি কক্ষ থেকে নেমে এল এক সুশ্রী পরিচারিকা।

আমি—আমি রাজা শলোমন, দৃপ্তকণ্ঠে বলল মহাজ্ঞানী নৃপতি, আমি অনধিকার প্রবেশ করেছি বলে দুঃখিত এবং লজ্জিত। একটু থেমে আবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, আমি—শুধু সবিনয়ে জানতে চাই কে আমার মন্দিরের স্থপতিদের কাজ করতে নিষেধ করেছে আর আমার পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে অনভিজ্ঞ অপটু কারিগর দিয়ে—

আমি—আমি মহারাজ, ত্রিতলেরই একটি সুরম্য কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল সেই বিচিত্র রমণী। সঙ্গে সঙ্গে শলোমনের অপলক দুটো চোখে নেমে এল মুগ্ধ দৃষ্টি।

সেই রূপসী তরুণী সন্ন্যাসিনী। তার সুডোল বাহুযুগলে, কণ্ঠে, কোথাও নেই কোন অলঙ্কার। সম্পূর্ণ নিরাভরণ সেই দীর্ঘতন্বী দেহ রিক্ত হলেও কিন্তু শলোমনের মনে হল, তার ভেতরে বিপুল ঐশ্বর্যশালী কোন রাজেন্দ্রাণীর আভাস যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

মহারাজ, দেবায়তন তো যে কোন দেশের যে কোন জাতিরই হোক, সেই

রমণী থেমে থেমে স্পষ্ট কণ্ঠে বলল, তা সর্বকালের শাশ্বত সম্পদ আর দেবতার আরাধনায় প্রত্যেকের আছে অধিকার, ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে আবার বলল, মহারাজ, আমার সামর্থ্য অনুযায়ী সেই দেবায়তনটিকে যদি আরও মনোরম করে তুললে কি ক্ষতি আছে—

কথা নয়। শলোমনের মনে হল, যেন গান শুনছে। তীব্র উত্তেজনায় তার বুকের ভেতরটা কম্পিত হচ্ছে। এই তো সেই রমণী যে তপশ্চারিণীর বেশে রাজপথের পাশে জলপাইবৃক্ষের নীচে কে জানে কার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতো। এখন আবার জীহোভার মন্দির নির্মাণে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সাহায্য করছে—কিন্তু কেন—কেন ? কে এই রহস্যময়ী নারী ?

এই প্রাসাদের প্রতিটি প্রকোষ্ঠে যত স্বর্ণের সঞ্চয় এবং বিবিধ যে মহার্ঘ সামগ্রী দেখলেন—সেসব দিয়ে আপনার সেই স্বপ্নের মন্দির কারুমণ্ডিত করে তুলবো মহারাজ, যেন পবিত্র কোন শপথ গ্রহণ করছে এমন করে মৃদু গম্ভীর কণ্ঠে বলল সেই রমণী, আর দেবমন্দিরের শীর্ষদেশটি ভাবছি সোমালিল্যাণ্ডের উৎকৃষ্ট সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব—

আপনি কে ?—কেন আপনার অনুগ্রহ নেব আর কেনই বা এত করছেন ? কৌতূহলে জলজল করছে শলোমনের চোখদুটো।

একটি কথা বলল না সেই রমণী। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। অগাধ ঐশ্বর্য আর রূপযৌবন দিয়ে শলোমনকে মুগ্ধ করতে সুদূর দক্ষিণ পশ্চিম আরবের ক্ষুদ্র রাজ্য সাবা থেকে দিগবিস্তীর্ণ মরুভূমি আর উত্তুঙ্গ পর্বত অতিক্রম করে এই পুণ্যনগরীতে আসা, প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে রঙীন একটি ছবির মত গবাক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা, তারপর ব্যর্থ হয়ে বহুমূল্য বেশবাস ছেড়ে শুচিস্নিগ্ধ তপশ্চারিণীর মত বস্ত্র পরিধান করে রাজপথে এই মানুষটির জন্যই প্রতীক্ষা করা—বিগতদিনের টুকরো টুকরো ঘটনাগুলি তার মনের ভেতরে রামধনুর মত ঝিকমিক করতে লাগল।

কথা বলছেন না কেন ? আপনাকে মনে হচ্ছে রাজপথেও কারও প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি—শলোমনের কণ্ঠস্বরে আকুতি ফুটে উঠল।

নিস্তব্ধ কয়েকটি মুহূর্ত কালসমুদ্রে বিলীন হয়ে গেল। কোন কথাই বলল না সাবার সেই রাজকন্যা সেবা। শুধু তীব্র যন্ত্রণায় তার মুখখানা এঁকে বেঁকে দুমড়ে কান্নার আভাসে কুৎসিত হয়ে উঠল। আর তার বুকের ভেতর থেকে একটা ব্যথা পাক খেয়ে খেয়ে উঠে আসতে লাগল তার গলার কাছে। আর বাতাসে আন্দোলিত বেতস পত্রের মত থর থর করে কম্পিত হতে লাগল তার

দীর্ঘ ক্ষীণদেহ। কে জানে উদ্গত অশ্রু গোপন করতেই অত্যন্ত দ্রুত কক্ষান্তরে চলে গেল।

হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল শলোমন।

মহাজ্ঞানী তরুণ নৃপতির জীবনে এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা! কে এই অদ্ভুত রমণী? কেন—কেন তার বহু বিনিদ্র রাত্রির স্বপ্নের জীহোভার দেবায়তনের শীর্ষদেশ স্বর্ণমণ্ডিত করে দিতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কেন কার জন্য প্রায় প্রতিদিন রাজপথের পাশে সন্ন্যাসিনীর মত বেশে দাঁড়িয়ে থাকতো, তার জন্যই কি প্রতীক্ষা করতো।

তাহলে কী কোন বিপুল সমৃদ্ধিশালী শ্রেষ্ঠীব কন্যা তার প্রতি আসক্ত হয়েছে! রুদ্ধ কক্ষের দিকে নিষ্ফল দৃষ্টিতে তাকিয়ে ধীর পদক্ষেপে প্রাসাদ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল মহারাজ শলোমন।

পরদিন সকালে দেখল, জীহোভার সেই সুদৃশ্য দেবায়তনের স্বর্ণমণ্ডিত রোদে ঝিকমিক করছে। শুধু তাই নয়, রাতারাতি সেই মন্দিরের হর্ম্যতল পর্যন্ত সোনার পাত দিয়ে আবৃত করে দেওয়া হয়েছে। দেওয়ালের বহুমূল্য প্রস্তর গাত্রে নানা বর্ণের ছোট ছোট পাথরের ভেতরে ভেতরে জলজল করছ মুক্তো কি হীরা। শলোমনের মনের ভেতরটা ছটফট করে উঠল। কোন সর্বনাশা খেয়ালে মেয়েটা তার পিতৃদেবের ধনভাণ্ডার উজাড় করে দিচ্ছে! ছিঃ ছিঃ—বাধা দিতে হয়। গভীর লজ্জায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় তার মন।

পরদিন আবার শলোমন গেল সেই বাড়িতে। পরিচারিকা বলল, মালিকান এখন বাড়িতে নেই, জীহোভার মন্দিরে গিয়েছে—

শলোমন আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল না। ঘোড়া ছুটিয়ে দিল জেরুজ্যালেমের উপকণ্ঠে সেই দেবভূমির দিকে।

মেঘে ঢাকা আকাশ। সন্ধ্যার মত চারিদিক অন্ধকার। উত্তেজনার ঝড় ভেঙে পড়েছে শলোমনের মাথার ভেতরে—আজ জানতেই হবে ওর পরিচয়! একটা বোঝাপড়া করতে হবে।

দূর থেকে দেখতে পেল, ঝড়ো হাওয়ায় উড়ছে তার সোনার চুমকি বসানো রক্তবর্ণ মসলিনের ঘাঘরা। উড়ছে তার রক্তিম চুলের রাশ। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ আর নদীর নীলিম রেখার পটভূমিতে আঁকা সেই তন্বী স্বর্ণলতার মত দেহবল্লরী।

আমি জানতাম তুমি আসবে—সুখস্বপ্নের ঘোরে বিড় বিড় করে বলার মত করে বলল সেবা।

সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে তীক্ষ্ণ গলায় বলল শলোমন, আর অনুগ্রহ করে আমাকে কষ্ট দেবেন না—বলুন কে আপনি ?

আমি ! ম্লান হাসি ফুটে উঠল তার রক্তপ্রবালের মত ঠোঁটে। আস্তে আস্তে তার কাছে এল। গভীর অনুরাগের দৃষ্টি ফুটে উঠল চোখে। যেন অনেক অনেক দূর থেকে বলল, আমি দক্ষিণ-পশ্চিম আরবের একটি প্রদেশ সাবা রাজ্যের রাজকন্যা সেবা। তোমার রূপ-গুণের খ্যাতি শুনে পর্যাপ্ত ঐশ্বর্য নিয়ে তোমাকে মুগ্ধ করতে এসেছিলাম। তীব্র আবেগে থর থর করে কাঁপতে লাগল।

মহাশয়া আপনি—আপনি কেন পূর্বাহ্নেই আপনার পরিচয় জ্ঞাপন করেননি উত্তেজিত কণ্ঠে বলল শলোমন, সাবা রাজ্যের সঙ্গে মৈত্রীর সম্বন্ধ স্থাপনের প্রচেষ্টা আমি করছি কতকাল আগে থেকে—ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে আবার বলল লোহিত সাগর আর ভারত মহাসাগরের সংযোগস্থলে সেই প্রচুর বৃষ্টিপাতে উর্বরা সমৃদ্ধিশালী দেশ—প্রচুর পরিমাণে সোনা, আর গন্ধধূপের জন্য বিখ্যাত। সেই আন্তর্জাতিক ব্যবসাকেন্দ্র—যেখানকার বাজারে ভারত, চীন, সোমালিল্যাণ্ড, ইথিওপিয়ার মহার্ঘ বিবিধ পণ্যসম্ভার আসে—

আমার জন্মভূমি সম্বন্ধে যা বলছেন, তার প্রত্যেকটি কথাই ঠিক—কেমন নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল সেবা, আপনি মহাজ্ঞানী—আপনার অজানা কিছু নেই—

কিন্তু পরিচয় গোপন করে আপনার অপরিমেয় ঐশ্বর্য দিয়ে আমাকে মুগ্ধ করতে আসা, আর আমার জন্যই সন্ন্যাসীনির পোশাকে পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা—এসবের অভিপ্রায় কি ? যেন গোলকধাঁধায় ভেতরে প্রবেশ করে আর বের হতে না পেরে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে এমন করে বলল শলোমন।

কোন কথা বলল না সেবা।

শুধু তার রক্তপ্রবালের মত অধরে পরিস্ফুট হয়ে উঠল ম্লান একটা হাসির আভাস।

কেন চুপ করে আছেন ?

আপনি একদিন বুঝতে পারবেন মহারাজ, ক্ষীণ অস্ফুটকণ্ঠে এই কথাটা বলেই প্রস্থানোদ্যত হল সেবা।

রূপেশ্বরী ভদ্রে, আপনি বোধ করি, বিস্মৃত হয়ে গিয়েছেন, তার পথরোধ করে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলল শলোমন, আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন।

হ্যাঁ বিলক্ষণ জানি—আপনি মহাজ্ঞানী প্রজানুরঞ্জন নৃপতি শলোমন নির্বিকার কণ্ঠে বলল সেবা, আপনি ভুবনবিখ্যাত বিচারক। আপনার—

অনেক কিছুই জ্ঞাত আছেন সুভদ্রে, আপনি কেন উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছেন না। কী আপনার অভিসন্ধি কেন অযাচিত ভাবে আপনি আমার মন্দির মহার্ঘ স্বর্ণমণ্ডিত করলেন এসব না জানলে আমি আপনার দান গ্রহণ করতে পারি না—

কেন—মহারাজ, আপনার বিবিধ গুণে মুগ্ধ কোন ভক্ত যদি তার শ্রদ্ধার অর্ঘ দিয়ে আপনার মন্দিরকে সুদৃশ্য করে—হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল সে। আবার কাতর কণ্ঠে বলল, মহারাজ আপনি অনুগ্রহ করে একবার আমার সঙ্গে আসুন—বলেই সেবা ধীর পায়ে দেবায়তনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। শলোমন সম্মোহিতের মত তাকে অনুসরণ করে মন্দিরের ভেতরে এল।

মহারাজ দেখুন, বিনম্র কণ্ঠে বলল সেবা, আপনার মন্দিরের প্রতিটি প্রকোষ্ঠ ভাণ্ডার আমি কি রকম সাজিয়ে দিয়েছি বলেই প্রথম কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করল সেবা।

এ কী! এই পারশ্যোপসাগরের মুক্তাই তো আপনার গৃহে—

হ্যাঁ যথার্থই অনুমান করেছেন মহারাজ, আমার গৃহের সমস্ত মুক্তাই দিয়েছি দেবতার আভরণ হবে—

এবার আসুন দ্বিতীয় কক্ষে, বলল সেবা। আর দ্বার উন্মুক্ত করতেই শলোমনের চোখদুটো ধাঁধিয়ে গেল। সেই অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণের নিরেট গোলক যা দেখেছিল সব—সব এই দেবগৃহের ভাণ্ডার উজ্জ্বল করেছে। কোন প্রকোষ্ঠে গজদন্ত, কোনখানে রাশি রাশি বহুমূল্য বস্ত্রাভরণ—কোথাও বা সারি সারি স্বর্ণ নির্মিত পাত্রে সুগন্ধী নির্যাস মিশ্রিত জলপাই তৈল—

এ আপনি কী—কী করেছেন সুভদ্রে, তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল শলোমন, আপনার প্রাসাদের সমস্ত ঐশ্বর্য—

আপনার দেবমন্দিরে দান করেছি মহারাজ—

আপনার পিতার অনুমতি নিয়ে এসব করেছেন?

হ্যাঁ মহারাজ, আমি পিতার একমাত্র কন্যা এবং সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। ক্ষণকাল থেমে আবার বলল, আমার পিতা সানন্দেই এই ঐশ্বর্য আমাকে দিয়েছেন, বলল আপনার চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই—

কিন্তু আমার দেবগৃহে আপনার ঐশ্বর্য উজাড় করে দেওয়ার উদ্দেশ্য কি? ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল শলোমন। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে আস্তে আস্তে বলল আপনি হয়তো জানেন না, নৃপতি শলোমনের স্বর্ণগৃহে

আপনার চেয়ে বিশগুণ বেশি স্বর্ণের সঞ্চয় আছে! আপনি সম্পদের লোভ দেখিয়ে আমাকে—

ছিঃ এ আপনি কী বলছেন মহারাজ—আপনি না জ্ঞানী! তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল সেবা। শান্ত কঠিন কণ্ঠে বলল, দেবমন্দিরে দান করার অধিকার মানুষের জন্মগত মহারাজ—বলেই যেন লেলিহান আগুনের জ্বালায় ছটফট করতে করতে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। চলে গেল সেই দেবায়তনের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের সীমানা ছাড়িয়ে প্রধান তোরণদ্বার পেরিয়ে শলোমনের দৃষ্টির পরিধির বাইরে।

বজ্রাহত বনস্পতির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শলোমন।

পরদিনই শলোমন স্বয়ং গিয়ে দেখল, প্রাসাদের দ্বার রুদ্ধ। প্রধান তোরণ-দ্বারের দ্বারপালকে প্রশ্ন করে জানতে পারল, এই অট্টালিকা এক স্বর্ণ শ্রেষ্ঠীকে বিক্রি করে চলে গিয়েছে সেই আরবিয় তরুণী!

আশ্চর্য! তার রূপ গুণে মুগ্ধ হয়ে অপরিমেয় ঐশ্বর্য নিয়ে এসেছিল এই বিদেশীনী! তার প্রতি প্রণয়াশক্তই যদি হবে—তাহলে তো তাকে পরিচয় জ্ঞাপন করতো। আর তা করলেই রাজকীয় সমারোহে রমণীকে অভ্যর্থণা করে অতিথিভবনে পরম সমাদরে তার বাসের ব্যবস্থা হতো। আর যেমন ভিন্নদেশী কুমারীরা তেমনি এই সাবা নন্দীনীরও তার মহিষী হতে বিলম্ব হতো না মোটেই। আহা সাবার সঙ্গে তাহলে ইস্রায়েলের ব্যবসায়িক এবং আর্থিক বন্ধন বেশ দৃঢ় হতো—

দিন কাটে। সেই বিশাল দেবায়তনের নির্মাণ শেষ হয়ে আসে। দেখতে দেখতে এগিয়ে আসে সেই দেবগৃহের দ্বারোদ্ঘাটনের পুণ্যদিন।

এডম থেকে, অ্যাম্মোন থেকে, অ্যাফ্রেম থেকে, ইস্রায়েলের প্রতিটি প্রদেশ থেকে ইহুদী ফ্যারিসী পুরোহিতবর্গ আসতে থাকে রাজধানীতে। আসে বিভিন্ন প্রদেশের ভিজির এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা।

মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটনের পুণ্যদিনে রাত্রিশেষের স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে শিঙা বেজে উঠল। প্রধান তোরণদ্বারে নহবতের বাঁশী আর মৃদঙ্গের সমধুর ধ্বনি পুণ্যনগরীর বাতাসকে কেমন আচ্ছন্ন আর বিবশ করে দিল।

সর্বাগ্রে জোব্বা পরিহিত পুরোহিতের দল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। আর কয়েকমুহূর্ত পরেই উচ্চকিত গম্ভীর কণ্ঠের বচসা আর তর্কাতর্কিতে বিপদের আভাস ঘনিয়ে এল।

এ আপনি কী করছেন, প্রধান পুরোহিত কঠিন আর কর্কশ কণ্ঠে

বললেন, আপনি না মহাজ্ঞানী নৃপতি। গন্ধধূপ ব্যতীত কোন পুণ্য-অনুষ্ঠান হয়?

আপনি এত অগুরুর নির্যাস সংগ্রহ করেছেন, জলপাই তৈল স্বর্ণমিশ্রিত পাত্রে সযত্নে রেখেছেন আর আরবিয় গুগগুল সংগ্রহ করতে পারলেন না, আর এক পুরোহিতের মুখখানা তাচ্ছিল্যে বিকৃত হয়ে ওঠে।

শলোমন অপরাধীর মত অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে। কোন কথা বলল না সে। তার মনে হল সেই সাবার রাজকন্যার প্রাসাদের ত্রিতলের একটি রুদ্ধ কক্ষ দেখেছিল! তাহলে সেই ঘরেই কি—

অদ্য রজনীর মধ্যযামের ভেতরে গন্ধধূপ সংগ্রহ করতে হবে প্রধান পুরোহিত বিধান দিলেন। এমন সময়—

মহারাজ, মন্দিররক্ষীদের অধিনায়ক এসে বলল, দেবায়তনের প্রধান তোরণ-দ্বারের সম্মুখে একটি গোশকট থেকে এই চারটি স্বর্ণনির্মিত ভাণ্ড নামিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে এক অপরিচিত আগন্তুক!

প্রতিটি পাত্রের মুখ নীলাভ মসলিন বস্ত্রে আচ্ছাদিত। খুলতেই আরবীয় গুগগুলের তীব্র সুগন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

এই তো গন্ধধূপ আনন্দের আতিশায্যে চীৎকার করে উঠল শলোমন। বলল গোশকট কোনদিকে গিয়েছে—আগন্তুক দেখতে কেমন? ইত্যাদি প্রশ্নে ব্যতি-ব্যস্ত করে তুলল রক্ষীদের অধিনায়ককে।

আহা—মহারাজ জীহোভার অনুগ্রহে পেয়েছেন, দেবতার পূজোর উপাচারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, এখন কে দিল—কেন দিল এসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না—প্রধান পুরোহিত রায় দিলেন।

মহাসমারোহে দেবায়তনের দ্বার উন্মুক্ত হল।

পূজা হল নিয়মসিদ্ধক (জীহোভরাথান) ষোড়শোপচারে!

আর সেই উৎসবমুখর আলোকোজ্জ্বল দেবগৃহ থেকে পুরোহিতবর্গ এবং আমন্ত্রিত অভ্যাগতদের অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে এল শলোমন। দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করে ঝড়ের গতিতে ছুটল।

জনহীন নির্জন রাজপথ।

অশ্বখুরের তীব্র শব্দে চারিদিক প্রকম্পিত হয়ে উঠছে। শলোমনের মনে হল ওই শব্দগুলো তার মাথার ভেতরে বেজে চলেছে। সেই মদগর্বিতা সাবা নন্দিনী এখনও-এখনও আছে এই পুণ্যনগরীতে। এখনও এই শহর পরি-ত্যাগ করেনি।

কিন্তু সেই রাত্রে সারা শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজতে খুঁজতে সেই জীয়ন পাহাড়ের নীচে দরিদ্র চর্মকার ও ধীবরপল্লীতে এক জীর্ণ কুটিরে পাওয়া গেল রাজনন্দিনীকে! পরনে শতচ্ছিন্ন মলিন পোশাক—

এ কী আপনি এখানে?

কী করবো মহারাজ আমি তো সর্বস্ব আপনার দেবগৃহে অর্ঘ দিয়েছি, শান্ত বিনম্র কণ্ঠে বলল সেবা, এখন আমার নিজস্ব বলতে কিছু নেই—

কেন আপনি দেবমন্দিরে দান করলেন—আর কেন—কেন আপনি সেচ্ছা-দারিদ্র্য বরণ করলেন। উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগল বিস্মিত শলোমন; কেন আপনি—

তাহলে শ্রবণ করুন মহারাজ, সেবা উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলতে লাগল, আপনার নবারুনোপম সুন্দরপ্রচণ্ড মুখমণ্ডল আর আপনার অসামান্য বিদ্যাবত্তার খ্যাতি শুনে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যদি বরমাল্য দিতে হয় তাহলে আপনার মত জ্ঞানীগুণী আর খ্যাতিমান পুরুষের কণ্ঠেই তা দেব।

কিন্তু—ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে আবার বলল, পিতা বললেন, এ অসম্ভব দুরাশা! তবুও সেই অসম্ভব স্বপ্নকেই রূপায়িত করবো বলে অপরিমেয় ঐশ্বর্য আর লোকলস্কর নিয়ে আপনার রাজধানীতে এলাম। ভেবেছিলাম আমার রূপ-যৌবন আর ঐশ্বর্য দিয়েই আপনাকে মুগ্ধ করবো।

কিন্তু মহারাজ রূপধন্যা যৌবনবতী রমণী আর বিপুল সম্পদের অভাব নেই আপনার। তাই আমার সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল। তখন আপনারই বহু বিনিদ্র রাত্রির স্বপ্ন—সেই দেবায়তনেই আমার সমস্ত সম্পদের অর্ঘ দিয়ে আমি একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলাম। আর তো দেশে ফিরে যেতে পারব না মহারাজ! কান্নাজড়িত অস্পষ্ট কণ্ঠে বলল, আমি এই শহরেই থেকে যাবো—আর দূর থেকে দেখবো—আমার স্বপ্নের সেই যৌবনাঢ্য মূর্তি—তার মনের তীব্র যন্ত্রণাই মুক্তার মত অশ্রুবিন্দু হয়ে চিক চিক করতে লাগল তার গণ্ডদেশে।

আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না শলোমন। উদ্দাম একটা বন্যার ঢেউয়ের মত ছুটে এসে সেবাকে তার প্রশস্ত বুকের ভেতরে জড়িয়ে ধরে চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করে দিল তার মুখাবয়ব। গভীর এক প্রশান্তিতে আবিষ্ট হয়ে এল সেবার চেতনা।

যাবে না?

কোথায়?

আমার প্রাসাদে—

না—বিদ্যুতস্পৃষ্টের মত তীরবেগে সরে দাঁড়াল সেবা। কঠোর কণ্ঠে বলল, আপনার হারেম শুধু নারীমাংস সরবরাহ করে আর দৃঢ় করে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আপনার দেশের মৈত্রীবন্ধন, তীব্র ঘৃনায় মুখ বিকৃত করে আবার বলল, নারীরা আপনার কাছে রাজনীতির একটা—

আর বলো না—বলো না—দুই হাতে মুখ ঢেকে আর্তনাদ করে উঠল শলোমন আমি বুঝতে পেরেছি—কেন তুমি পরিচয় গোপন করেছিলে, আবার সেবার হাত দুটো ধরে কাতর অনুনয় করে বলল, এই অপরাধে তুমি আমাকে পরিত্যাগ করে চলে যাবে সেবা?

তোমার প্রাসাদে নয়—হারেমে নয়—এই দরিদ্র পল্লীর ভেতরে, আবেগে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলল সেবা, যেখানে তোমাকে একান্ত পেলাম, সেইখানে যদি একটা গৃহ নির্মাণ করে দাও তাহলে আমি থাকতে পারি—

বেশ তাই হবে—

হাসিতে ঝলমল করে উঠল সেবার মুখখানা।

সাফল্যের হাসি।

পুরাতন নিয়মের বাইবেলে আছে, প্রাচীন পৃথিবীর মহার্ঘ সম্পদ গন্ধধূপ স্বর্ণ ও বহুবিধ সামগ্রীতে সমৃদ্ধ সেই সাবার রাজকন্যা সেবাই গভীর দুঃখবরণ করে শলোমনের রমণীদের সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে বদলে দেয়েছিল। তাই হয়তো বাইবেলের একটি চিত্রে দেখা যায় শলোমন তার সাতশত বিদেশিনী পত্নীকে ধর্ম এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছে। এই প্রার্থন্যা-সভা বসতো জেরুজ্যালেমের প্রাসাদে নিয়মিত!

সেই দুর্লভ চিত্রটিতেই পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে রমণীকুলের চোখে বুদ্ধির দীপ্তিতে, মুখে ব্যক্তিত্বের আভাসে যেন সাবা নন্দিনীর সাফল্যই প্রতিফলিত হয়েছে।

———